প্রজ্ঞা-বাণী

মহাতাপস নগেন্দ্রনাথের পত্রাবলী

সংকলয়িত্রী

শ্রীসরযূবালা দেবী

নগেন্দ্র প্রজ্ঞামন্দির

শ্রীপ্রতিভা দেবী -
(সুসংকৃতা)

সংকলয়িত্রীর কথা

সশস্ত্র বিপ্লবের পথে, না নীরব সাধনার পথে দেশসেবা করব, যৌবনের এই মানসিক দ্বন্দ্বে নগেন্দ্রনাথ শেষেরটিই বেছে নিয়েছিলেন। জীবনের প্রান্তসীমায় এসে তিনি বলতেন, 'মনে হয়, সকলের ব্যথা-বেদনা নিজে নিয়ে সবাইকে মুক্ত করে দিই।' আরম্ভ ও শেষের এই মনোভাব পত্রগুলিতে অল্পবিস্তর বিধৃত হয়ে আছে। তাই এর মধ্যে নিছক নীতিকথা নেই ; আছে শক্তিসাধকের পদধ্বনি, জ্ঞানীর বিচারধারা, ভক্তের প্রীতি, কর্মীর নিষ্কামতা ও সর্বোপরি দরদ মাখানো সুরে জীবনের প্রধান তন্ত্রীটিকে সদা সক্রিয় রাখবার ইংগিত।

অনুসন্ধিৎসুরা এর মধ্যে পাবেন, একজন জীবনশিল্পীর সার্থক রূপায়ণ। তাঁর প্রকাশ্যমান জীবনীতে সেটি আরও পরিস্ফুট হবে। এই গ্রন্থে প্রকাশিত তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী তাঁকে জানবার পথে কিছুটা সাহায্য করবে।

বাল্যকাল থেকেই তিনি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সাধনা ও চিন্তাধারার সংগে যুক্ত ছিলেন। তাঁর সাধক জীবনের পর্বে পর্বে নতুন নতুন ভাবধারা জীবন্ত হয়ে দেখা দিত। তিনি বলতেন, একটা ভাবে তন্ময় হয়ে তাকে অতিক্রম ক'রে যাওয়াই সাধনার মূল সূত্র। একটা নির্দিষ্ট ভাবচক্রে চিরকাল আবদ্ধ হয়ে থাকা সাধনপথের অন্তরায়। প্রথম জীবনে প্রায় দশ বৎসরকাল তিনি স্বামী বিবেকানন্দের ভাবে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিলেন। তারপর শ্রীরামকৃষ্ণ, ও সর্বশেষে শ্রীশ্রীসারদা দেবীর ভাবে তন্ময় হয়ে থাকতেন। তাঁর জীবনের উপরোক্ত তিনটি মহাপর্বের ফাঁকে ফাঁকে তিনি জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষদের জীবনী ও বাণী অনুধ্যান ক'রে তাঁর চিন্তাভাণ্ডার পূর্ণ করেছিলেন। তাঁর সুদূরপ্রসারী ভাবরাজ্যে শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, শংকর, যীশু, চৈতন্য, মহম্মদ, জরথুস্ত্র, লাউট্জে প্রভৃতি সর্বদেশীয় সকল মহাপুরুষেরই স্থান ছিল। কিন্তু তাঁর কাছে

এই মহাপুরুষগণ ছিলেন শিক্ষা ও তত্ত্বের জীবন্ত বিগ্রহ। তাই ব্যক্তিত্বের উপাসনা ও মহাপুরুষসংশ্রয়ের মধ্য দিয়ে তত্ত্বজ্ঞান ও আত্মস্বরূপের উপলব্ধিই ছিল তাঁর জীবনের লক্ষ্য। "অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছা তাই কর।" শ্রীরামকৃষ্ণের এই বাণী তাঁর জীবনে পূর্ণ রূপ লাভ করেছিল।

কাব্য সাহিত্য, দর্শন বিজ্ঞান, ইতিহাস ভূবিজ্ঞান প্রভৃতি জাগতিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক কোন জ্ঞানই তাঁর কাছে অপাংক্তেয় ছিল না। কোন বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করাকে তিনি জ্ঞান আখ্যা দিতে কুণ্ঠিত হতেন। তিনি বলতেন, জ্ঞান মানেই পারদর্শী হওয়া, অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত না একটা বিষয়ের শেষ পর্যন্ত দেখা হয় ততক্ষণ সে বিষয়ের প্রকৃত জ্ঞান হয় না। আর পারদর্শী হলেই সব জ্ঞান এক জ্ঞানে মিশে যায়। সেটা হচ্ছে আধ্যাত্মিক জ্ঞান। যদিও আধ্যাত্মিক জ্ঞানই ছিল তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের লক্ষ্য, তবু তিনি কখনো কাউকে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের দিকে জোর ক'রে টেনে নিতে চেষ্টা করেন নি। তিনি জীবনের গান গেয়ে গেছেন। সে সংগীতের সম্মোহন সুর বিভিন্ন জীবন-তন্ত্রীতে বিভিন্ন মূর্চ্ছনা সৃষ্টি ক'রে প্রত্যেককে স্ব স্ব প্রকৃতি অনুযায়ী গড়ে উঠতে সাহায্য করেছে মাত্র।

তাঁর দেশাত্মবোধ ছিল অনন্যসাধারণ। দেশকে ভালবেসে তিনি দেশের সংস্কৃতিকে ভালবেসেছিলেন। আর দেশের সংস্কৃতিকে ভালবেসে ভালবাসতে পেরেছিলেন বিশ্বের সংস্কৃতিকে। তাঁর বিশ্বাত্মবোধ স্থাপিত হয়েছিল দেশাত্মবোধের সুদৃঢ় ভিত্তিভূমিতে।

নারী মাত্রকেই তিনি বিশ্বমাতৃকার অংশসম্ভূতা বলে মনে করতেন। তিনি মনে করতেন, স্বয়ং জগন্মাতাই বিভিন্ন নারীমূর্তিতে বিশ্বময় বিচরণ করছেন।

নারীজাতির প্রতি সশ্রদ্ধ মনোভাব, অপরিসীম দেশাত্মবোধ এবং কর্ম, জ্ঞান ও প্রেমের ত্রিধারা এই চিঠিগুলিকে অভিসিঞ্চিত ক'রে রেখেছে।

এই মহামূল্য পত্রগুলি যাঁর রচনা সেই পরম শ্রদ্ধাস্পদ নগেন্দ্রনাথ ছিলেন আমাদের সকলের দাদা। তাঁর দেহান্তরপ্রাপ্তির পর দু'তিন বছর মনের অবস্থা যে কিরূপ ছিল, এতগুলি দিন যে কি ভাবে কেটে গেল, তার হুঁস ছিল না। একটা মানসিক মূর্চ্ছা যেন সমস্ত মনটাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। তারপর

আবার যখন পৃথিবীর চেতনায় ফিরে এলাম, তখন বেদনাতুর বিহ্বল মনে স্বতঃই উদিত হল, এতবড় একটি নীরব তপস্বীর তপোদীপ্তি কি গুহার আঁধারেই লুকিয়ে থাকবে? এই দৃশ্যমান জগতের কোন কাজেই লাগবে না? আমার স্নেহের কন্যা চৈতন্যময়ীর ব্যথিত অন্তরেও ঠিক একই বাণী ধ্বনিত হয়ে উঠল। বেদনাতুর হৃদয়ে আমরা ভাবতে লাগলাম, এই অমূল্য জ্ঞান, গভীর চিন্তা ও অভিজ্ঞতা শুধু কি আমাদের কয়েকজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে লুপ্ত হয়ে যাবে? তাঁর এই ভাব ও চিন্তারাশিকে লুকিয়ে রাখবার অধিকার আমাদের আছে কি? যদি অপর কোন যাত্রীও ইহার দ্বারা উপকৃত ও আলোক প্রাপ্ত হয়, তবে তার ব্যবস্থা করাই কি আমাদের কর্তব্য নয়?

হৃদয়ের গভীরে যে বেদনা বাসা বাঁধে তা সম্ভবতঃ অলক্ষ্যে অন্য হৃদয়েও সাড়া জাগায়। তাই আমাদের অন্তর্বেদনা দাদার আরো কয়েকজন অন্তরংগের মনে জাগিয়ে তুলল অনুরূপ আকুতি। তাঁরা একত্র সমবেত হয়ে স্থির করলেন যে, দাদার অন্তর্জ্যোতির বিকীরণে যাতে অন্যান্য বহুজনের যাত্রাপথও আলোকিত হতে পারে, সেজন্য তাঁদের 'পথের সাথী' একান্ত আপনার 'নগেনদা'র' ভাবধারাকে সঞ্জীবিত ও সক্রিয় রাখবার উদ্দেশ্যে একটি স্থায়ী সংস্থা গঠন করা হোক। এই সংস্থার নাম হল—'নগেন্দ্র প্রজ্ঞামন্দির'।

নগেন্দ্র প্রজ্ঞামন্দিরের সদস্যগণের সমবেত ইচ্ছায়, আমার কন্যার আগ্রহাতিশয্যে এবং পূজনীয় নগেনদা'র কয়েকটি অনুরাগী ভ্রাতার উৎসাহে ও সহযোগিতায় সংগৃহীত হল তাঁর অমূল্য পত্রগুলি এবং সেই পত্রগুচ্ছ থেকে বেছে নিয়ে সাজানো হল এই প্রথম অর্ঘ্য।

এই সংকলনে কয়েকখানি মাত্র পত্রই অর্ঘ্যরূপে উপস্থিত করা হল; কেন না যতগুলি পত্র সংগৃহীত হয়েছে তার সবগুলি মুদ্রণের ব্যয়ভার বহনে আমরা অক্ষম।

দাদা চিঠি লিখতেন একটা ভাবের মুখে। তাছাড়া তাঁর জ্ঞানের ও অধ্যয়নের পরিধি এত বিস্তৃত ছিল এবং তাঁর উদ্ধৃতিগুলি এত বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে আহৃত হয়েছিল যে, সেগুলিকে মুলের সংগে মিলিয়ে দেখা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

এই কাজে আমরা নবাগত, আমাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাও নিতান্তই সীমাবদ্ধ; তাই যথেষ্ট ক্রটি বিচ্যুতি নিশ্চয়ই রয়ে গেল। পাঠকবর্গ আমাদের এই অযোগ্যতা-জনিত ক্রটি মার্জনা করবেন।

এই কাজে অনেকেই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে আমাদের সাহায্য করেছেন। এঁরা সবাই আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। বিশেষকরে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি তাঁদের, যাঁরা আমাদের শুভ ইচ্ছা উপলব্ধি ক'রে আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন এবং দাদার লেখা ব্যক্তিগত চিঠিগুলি আমাদের কাছে পাঠাতে দ্বিধাবোধ করেন নি। তাঁদের এই সহযোগিতা না পেলে এই কাজ সম্পন্ন করা কখনই সম্ভব হত না।

পরিশেষে ধন্যবাদ জানাচ্ছি প্রখ্যাত মাসিকপত্র 'প্রবর্তকের' সম্পাদক মহাশয়কে। কেননা তিনি ইতিপূর্বেই তদীয় পত্রে "পথনির্দেশ" শিরোনামায় দাদার কয়েকখানি পত্র মুদ্রিত ক'রে আমাদিগকে উৎসাহিত করেছেন।

মহাতাপসের জীবনকথা *

বিরল হলেও এমন মানুষ আসেন এই সংসারের পান্থশালায় যাঁরা সতত আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন আমাদের গন্তব্যধাম, ছিন্ন করে দেন আমাদের পথের বস্তুর প্রতি আসক্তি ও মোহ, প্রমাণ করেন মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্ব। মানুষের সবলতা দুর্বলতা বহন করেও তাঁরা এমন এক অপার্থিব আলো জ্বেলে রাখেন তাঁদের প্রাণে, যা অপরকেও আকৃষ্ট করে টেনে আনে অসীমের যাত্রাপথে—বিরামহীন সংগ্রামের বিমুক্ত অংগনে। এমনি একটি মানুষ ছিলেন আমাদের প্রিয়তম 'নগেনদা'—শ্রীনগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী—বহুজনের স্নেহময়ভ্রাতা, প্রকৃত বন্ধু ও জীবনপথের দিশারি। জন্ম পাবনার ভারাংগা গ্রামে—মাতুলালয়ে, ১৩০০ সনের আষাঢ়ের শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে। বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের বিকাশ পাবনা ও রংপুর সহরে। নিরবচ্ছিন্ন অধ্যাত্ম সাধনা ভুবনেশ্বরে সারদাধামে। মহাপ্রয়াণ—গঙ্গাতীরে কলিকাতায়।

তাঁর বাল্যবন্ধুরা আজও তাঁর ব্যল্যকালের অদ্ভুত সাহস, দৃঢ়সংকল্প ও বন্ধুপ্রীতির কথা বলতে বলতে আত্মহারা হয়ে পড়েন। স্বদেশী যুগের সমিতির শিক্ষায় গড়ে উঠেছিল তাঁর অদম্য মনোবল ও সুদৃঢ় দেহবল। প্রথম যৌবনেই দুর্বৃত্ত পুলিস অথবা অন্য কোনও দুষ্টলোককে শাসন করতে বন্ধুদের অনুরোধে তিনি হতেন অগ্রণী। আবার শবদাহ, রোগীর পরিচর্যা প্রভৃতি কার্যে তাঁর ছিল অক্লান্ত উদ্যম। যে সকল বীভৎস বা কঠিন রোগীর কাছে তাদের নিকট-আত্মীয়গণও থাকতে কুণ্ঠিত হতেন, নগেন্দ্রনাথকে অম্লানবদনে অকুণ্ঠিতচিত্তে দীর্ঘকাল তাদের সেবায় ব্যাপৃত থাকতে দেখা যেত। কিন্তু এসব ছিল তাঁর চরিত্রের বাইরের দিক। অন্তঃসলিলা স্রোতস্বিনীর মত কৈশোর থেকেই ছিল তাঁর তীব্র আধ্যাত্মিক আস্পৃহা, যা ক্রমশঃ নানা

---

* এই জীবনকথা কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে "শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের একটি মানুষ" শিরোনামায় 'উদ্বোধন', ১৩৬০, আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

ধারায় পরিপুষ্ট হয়ে জীবনের অপর সকল দিককে পরিপ্লাবিত ক'রে মিলিত হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা-বিবেকানন্দের ভাবধারার ত্রিবেণীসংগমে।

"ছোটবেলা থেকেই মনে হত, ঋষি মহাপুরুষরা যা করে গেছেন, যা বলে গেছেন, সব জানতে হবে; তাঁদের জীবন অনুসরণ করতে হবে।" সত্য ও ধর্ম জানবার তীব্র আকাংক্ষায় প্রথম যৌবনেই তিনি মূল অথবা অনুবাদের সাহায্যে বহু শাস্ত্র ও জ্ঞানের গ্রন্থ অধ্যয়ন করেছিলেন। প্রথম যৌবনে যখন স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও ভাবধারার সহিত পরিচিত হলেন তখন থেকেই তাঁর নানামুখী চিন্তা ও আকাংক্ষা একটা সুনির্দিষ্ট ধারা প্রাপ্ত হয়ে সেই ধারায় পরিপুষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। স্বামীজীর দেশপ্রেম, মানবপ্রীতি, ভারত-সংস্কৃতিপ্রীতি ও আধ্যাত্মিকতা নগেন্দ্রনাথকে পাগল ক'রে তুলল। এক নির্দিষ্ট স্থানে সমভাবের বন্ধুদের নিয়ে দিনরাত্রি স্বামীজীর কথা ও আলোচনায় ব্যাপৃত হলেন। খেলাধুলা, ব্যায়াম, আর্ত ও রোগীর সেবা, জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠান গঠন, আবার নীরবে বন্ধুদের নিয়ে পাঠ-আলোচনা, ধ্যান-ধারণা, এইরূপ সকল ব্যাপারেই তাঁর অসাধারণ সংগঠনশক্তি ও নেতৃত্বক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যেত। স্বার্থশূন্য উদার ভালবাসা ছিল তাঁর সহজাত স্বভাব। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে স্ব-স্থান পাবনার জেলাস্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নানা কারণে তাঁকে ভাগলপুর, কুচবিহার প্রভৃতি নানাস্থানের কলেজে অধ্যয়ন করতে হয়। পরিশেষে রংপুর কলেজ থেকে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি ঐ কলেজেরই গ্রন্থাগারিক ও হোষ্টেল-সুপারিন্টেণ্ডেন্ট্ নিযুক্ত হন। ছাত্রজীবনে ফুটবল খেলোয়াড়রূপেও তিনি বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিলেন। বন্ধুরা বলেন, তাঁকে মেরে অজ্ঞান না করলে 'গোল' দেওয়া অসম্ভব ছিল। কিন্তু এই খেলোয়াড়-খ্যাতি যখন চরম উৎকর্ষ লাভ করল, ঠিক সেই সময় একদিনের সংকল্পে তিনি সারাজীবনের জন্য 'ফুটবল' খেলা ত্যাগ করলেন। "কলেজের ছেলেদের মধ্যে ঠাকুর-স্বামীজীর ভাব দিতে পারলে দেশের অনেক কাজ হবে, এই জন্যই কলেজে কাজ নিয়েছিলাম, নইলে চাকুরী করবার কোন স্পৃহা বা

প্রয়োজন আমার ছিল না।" কলেজের ও হোষ্টেলের ছাত্রদের কাছে দিনরাত উচ্চপ্রসংগ করা, আত্মত্যাগ ও ভালবাসা দিয়ে তাদের গড়ে তোলা, এই ছিল তাঁর প্রধান কাজ। বীরত্বপূর্ণ ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার ভিত্তিতে দেশপ্রেম—এই ছিল তাঁর প্রধান শিক্ষার বিষয়। স্বামী বিবেকানন্দের জীবন থেকেই এই দীক্ষা তিনি পেয়েছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দের ত্যাগ, বীর্য ও পৌরুষপূর্ণ ভাবসমূহের অনুশীলনের ফলে তাঁর ভিতর পরিপুষ্ট হয়ে উঠছিল একটি কঠোর পুরুষোচিত মনোভাব এবং নারীজাতির প্রতি এক প্রকার অবহেলাপূর্ণ ব্যবধানের দৃষ্টি। তাই এক বন্ধুর সনির্বন্ধ অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি যেতে স্বীকৃত হন নি শ্রীশ্রীসারদাদেবীকে দর্শন করতে। "ভাবতাম মেয়েমানুষ আর বেশী কি উন্নত হতে পারে? শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী বলেই লোকে এত বড় করছে।" তবুও পরে একদিন সেই বন্ধুর আগ্রহাতিশয্যে যেন বাধ্য হয়েই তাঁর সংগে শ্রীশ্রীমায়ের দর্শনে বাগবাজারে মায়ের বাড়ীতে উপস্থিত হলেন। এক ব্রহ্মচারী তাঁদের জানিয়ে দিলেন যে, সেদিন আর মায়ের দেখা পাবেন না। কিন্তু বাধা পেয়েই নগেন্দ্রনাথের আগ্রহ ও সংকল্প উদ্দীপ্ত ও দৃঢ়তর হয়ে উঠল। তিনি সংকল্প ক'রে বসলেন,—'এসেছি যখন, মাকে না দেখে যাবই না'। ব্রহ্মচারীর নিষেধ সত্ত্বেও তাঁরা প্রতীক্ষা করতে লাগলেন শ্রীশ্রীমায়ের দর্শনের আশায়। এমন সময় উপর থেকে পূজনীয় স্বামী সারদানন্দজী নেমে এলেন সিঁড়ি দিয়ে। প্রতীক্ষমান দু'জনকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি চাও তোমরা?"

"মার কাছে যেতে চাই মাকে দর্শন করতে।"

"বেশ, উপরে চলে যাও মার কাছে।"

শরৎ মহারাজের আদেশ হয়েছে, আর বাধা দেয় কে? দুজনে মায়ের সন্নিধানে উপস্থিত! একে একে সমবেত পাঁচ ছয়জন প্রণাম করার পর সকলের শেষে গিয়ে প্রণাম করলেন নগেন্দ্রনাথ। কিন্তু সেই এক প্রণামেই লুটিয়ে পড়ল তাঁর জীবন শ্রীশ্রীমায়ের চরণে। শুধু মায়ের চরণে নয়, শ্রীশ্রীমায়ের প্রতিমূর্তি সমগ্র নারীজাতির চরণে। প্রণাম করার সংগে সংগেই তাঁর বাইরের

সংজ্ঞা লোপ পেল। চোখে অবিরল অশ্রু, মুখে অস্ফুট মা মা ধ্বনি! সংগী বন্ধু আনন্দে ও বিস্ময়ে বিহ্বল! অপার করুণাময়ী শ্রীমা সন্তানকে ক্রোড়ে শায়িত ক'রে ব্যজনে ব্যস্ত! কিছুকাল পরে সংজ্ঞা ফিরে এল। শ্রীশ্রীমা নিজের হাতে সন্তানকে খাইয়ে দিলেন মিষ্টান্নপ্রসাদ। পরের জীবনে নগেন্দ্রনাথ হেসে বলতেন, "মা সন্দেশ খাইয়েছিলেন বটে, কিন্তু অনেকখানি কাঁদিয়ে; তাই সারাজীবন অনেক সন্দেশ খাচ্ছি, কিন্তু কেঁদে কেঁদে।" ······সেই একস্পর্শে সমগ্র নারীজাতির প্রতি তাঁর মনোভাব পরিবর্তিত হয়ে শ্রদ্ধা ও সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ হল। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত নারীর প্রতি এই শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি তাঁর চরিত্রের একটা বিশেষ দিক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। শুধু তাই নয়, এই "একস্পর্শে সকল সংশয় দূর হয়ে গেল জীবনের গন্তব্যপথ ও লক্ষ্যসম্পর্কে। টাকা পয়সা, মান যশের দিকে আর কখনই মন যায় নি।" শ্রীশ্রীমায়ের নিকট দীক্ষা লওয়ার প্রয়োজন আছে কিনা জিজ্ঞাসা করাতে মা বলেছিলেন, "এখন থাক্, সে পরে হবে।" *

এই সময়ে প্রিন্সিপাল ওয়াট্কিন্সের আগ্রহে তিনি দর্শন ও ইতিহাস এই দুই বিষয়ে এম. এ. পরীক্ষা দেবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। ওয়াট্কিন্স-এর ইচ্ছা ছিল, এম. এ. পাশ করিয়েই তাঁকে কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত করবেন; কারণ তিনি নগেন্দ্রনাথের প্রতিভার পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে মহাত্মা গান্ধীর পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনের তরঙ্গ এসে সব ওলট পালট করে দিল। এম. এ. পরীক্ষা তো দেওয়া হলই না, যাদের জন্য তিনি কলেজের কাজ নিয়েছিলেন সেই সব ভাল ভাল ছেলেরা আন্দোলনে যোগদান ক'রে ছত্রছন্ন হয়ে পড়ল। "যাদের জন্য কলেজে ছিলাম তারাই যখন ছত্রছন্ন হয়ে গেল, তখন আর থাকব কিসের জন্য?" তাই একদিন স্নান করতে যাবার সময় কলেজের আপিসে গিয়ে পদত্যাগ-পত্র দিয়ে এলেন। "ভেবেছিলাম কলেজটাকে অবলম্বন করেই একটা প্রকৃত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে। সেটা

* শ্রীশ্রীমায়ের স্থূলশরীরের অদর্শনের পর পূজ্যপাদ সারদানন্দ মহারাজ তাঁকে মন্ত্রদীক্ষা দান করেছিলেন। বলেছিলেন, "মা তোমার জন্য মন্ত্র রেখে গেছেন আমার কাছে।"

যখন এইভাবে ভেঙে গেল, তখন বুঝলাম যে, মা'র ইচ্ছা নয় এ জীবনে কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলি।"

বন্ধুদের আগ্রহে তাদের সাথে কিছুকাল গ্রামে গ্রামে চরকা ও তাঁতের কাজে ঘুরলেন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম সন্ন্যাসী শিষ্য পূজ্যপাদ স্বামী অভেদানন্দজী আমেরিকা থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় বেদান্ত সমিতি স্থাপন করলেন। নগেন্দ্রনাথ বেদান্ত সমিতির গ্রন্থাগারিকরূপে স্বামী অভেদানন্দের সাহচর্যে দুই বৎসর অবস্থান করলেন। এর পরে নগেন্দ্রনাথ কলকাতায় শ্যামবাজারে এক বন্ধুগৃহে প্রায় পাঁচ বৎসর রইলেন। এ সময়েও পাঠ-আলোচনা-ধ্যান-ধারণায়, পূজা-উৎসব-সেবায় তাঁর দিন কেটেছিল বন্ধুবর্গের সাথে। দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ধর্ম্ম, দেশ—এই সব ছিল তাঁর নিত্য প্রসংগের বিষয়। আবার কলা, সুর, সংগীত নিয়েও গভীর আলোচনা করতেন। নিজে যদিও পারতেন না গাইতে, তথাপি সংগীত ও সুর তাঁকে পরম আনন্দ দিত। সুযোগ মত প্রায় প্রত্যহই গান শুনতেন বন্ধুদের মুখে। কত উৎসাহ দিতেন তাদের। যদিও তিনি নিজেকে রাখতে চাইতেন সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ও গোপন, তবুও তাঁর সংগে কারও কয়েক দিনের আলাপ কোন প্রকারে হলেই সে আকৃষ্ট হয়ে পড়ত তাঁর অসাধারণ চিন্তাশক্তি, ব্যক্তিত্ব ও ভালবাসার আকর্ষণে।

কুম্ভমেলা উপলক্ষে হরিদ্বারে (১৯২৮) ব্রহ্মকুণ্ডে স্নানের জন্য উপস্থিত হলেন নগেন্দ্রনাথ। দরিদ্র যাত্রীরা পোঁটলা-পুঁটলি হাতে করেই এসেছে স্নানে। অবগাহনের উদ্দেশ্যে এক বৃদ্ধা তার পোঁটলাটি দিল জলে অবস্থিত নগেন্দ্রনাথের হাতে। দেখাদেখি একের পর আর যাত্রীরা দিয়ে চলল তাদের পোঁটলা, মুক্তহস্তে নিশ্চিন্তে ডুবটি দিতে। হৃদয়বান্ নগেন্দ্রনাথ কি করে নিরাশ করবেন দরিদ্রগণের নির্ভরতাপূর্ণ এই সামান্য আকূতিকে? দশ ঘণ্টা কোমর জলে দাঁড়িয়ে এই দ্রব্যরক্ষার কাজ করে চললেন নগেন্দ্রনাথ নির্বিকারচিত্তে অসহায় দরিদ্র যাত্রীদের সেবায়! এর ফলে তাঁকে দীর্ঘদিন কঠিন অসুস্থতায় ভুগতে হয়েছিল।

কলকাতায় ফিরে তাঁর অনুগত কয়েকজন সংগী ও বন্ধুর সংগে তিনি ভুবনেশ্বরে উপস্থিত হন। অতি নির্জন তীর্থস্থান, শিবের স্থান, বিশেষতঃ স্বামী ব্রহ্মানন্দের নির্বাচিত তপস্যার স্থান ভুবনেশ্বর; বড়ই পছন্দ হল তাঁর। রাত্রিদিন অধিকাংশ সময় ধ্যান-ধারণা, পাঠ-আলোচনা ও উচ্চপ্রসংগে অতিবাহিত করে ৩।৪ ঘণ্টা মাত্র তাঁর অবশিষ্ট থাকত নিদ্রার জন্য। প্রত্যেক মহাপুরুষের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে সেদিন থেকে আরম্ভ ক'রে মাসাবধি চলত তাঁর জীবনী ও বাণীর আলোচনা। শ্রীকৃষ্ণ, শংকরাচার্য্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ—এই তিনজনই ছিলেন তাঁর নিকট সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ মহাপুরুষ—পূর্ণযোগে সিদ্ধ। আবার বুদ্ধ ও শ্রীচৈতন্যের অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব, করুণা ও প্রেমের উৎকর্ষও তাঁর হৃদয়কে জুড়ে বসেছিল চিরতরে।...

সংস্পর্শে যারা আসত তাদের চিন্তাধারা ও ভাবধারা গড়ে তোলার জন্য তাঁর ছিল অক্লান্ত উদ্যম, অফুরন্ত ভালবাসা। কোন নিরাশ বা ব্যথিত হৃদয়ে একটু আশা ও আনন্দ সঞ্চার করতে পারলে তিনি পরম আনন্দ অনুভব করতেন। কারও দোষের বিচার না ক'রে শুধু তাকে ভালবেসে যাওয়া, তার গুণটাকে খুব বড় করে দেখে সেই দিক দিয়ে তার সাথে মেশা, ভালবেসে তাকে উন্নীত করা—এই ছিল তাঁর পদ্ধতি। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী সন্তান পূজ্যপাদ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী তাঁরই আগ্রহে নিমন্ত্রিত হয়ে যখন 'সারদাধামে' এসেছিলেন তখন নগেন্দ্রনাথ সকলকে বললেন, "সাক্ষাৎ ঠাকুরই আসছেন জানবে। তোমাদের যার যা আকাংক্ষা হয় সব আয়োজন কর।" ছোট বড় সকল সন্ন্যাসীর গৈরিকের প্রতি ছিল তাঁর অকুণ্ঠ সম্মানবোধ। কোন সন্ন্যাসী এলে নিজের হাতেই পা ধোয়ার জল এনে দিতেন।

এমনি করে কাটছিল তাঁর দিন সারদাধামে—জ্ঞানে, ধ্যানে শ্রীশ্রীমা ও শ্রীরামকৃষ্ণের সেবায়। শ্রীশ্রীগোপালও আছেন প্রতিষ্ঠিত; তাঁরই নামে দেবোত্তর হল 'সারদাধাম'। সেবায়েত হল অপর কয়েকজন, নিজে কিছুই নয়। কোন অর্থ, কোন সম্পত্তি কেউ তাঁকে দিতে পারে নি তাঁর নিজের জন্য কোন দিন। সবই ঠাকুরের, সবই গোপালের। "না খেটে খেতে নেই"—তাই তীব্র জ্বর নিয়েও ঠাকুর-সেবার পরিশ্রম, না হয় দু'ঘণ্টা

পাঠ আলোচনা করা চাইই। উচ্চচিন্তার অগ্নিশিখা, গভীর ভাব সমুহের তীব্রতা ক্রমে বেড়েই চলল। শরীরের নিয়ম মেনে চলা তাঁর অসম্ভব হয়ে পড়ল। কিন্তু শরীরের ধর্ম না মানলে প্রকৃতি তার পরিশোধ নিতে ছাড়ে না। ক্রমশ ভেঙে পড়ল তাঁর লোহার শরীর। কিন্তু তা সত্ত্বেও আবাল্যের স্বপ্ন হিমালয়ের আহ্বানে ঘুরে এলেন কেদার বদরী। তারপর প্রায় দুই বৎসর বৈদ্যনাথ ধামে। অত্যন্ত আনন্দ পেলেন বৈদান্তিক স্বামী জগদানন্দ ও গুপ্ত সন্ন্যাসী শ্রীপ্রাণগোপাল মুখার্জির সংগ ক'রে। নিয়মিতভাবে শাংকর বেদান্ত অধ্যয়ন করলেন স্বামী জগদানন্দের কাছে। বৈদ্যনাথধাম থেকে জগন্নাথধাম পুরীতে এলেন ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে। সমুদ্রের তীরে ছিলেন আনন্দেই—মাঝে মাঝে জগন্নাথ দর্শন, পাঠ-আলোচনা ও অসীমের ধ্যান। ১৯৪৩ এর দুর্ভিক্ষ বড়ই ব্যথিত করেছিল তাঁর হৃদয়কে। এই সময়ে তিনি পূর্ববংগে ছিলেন। মানুষের দুঃখে তাঁর করুণ হৃদয় অসহায় ভাবে যে যন্ত্রণা অনুভব করত, চোখে মুখে ফুটে উঠত সেই ব্যথার ছায়া। সামনে যারা এসে পড়ত আর্ত, তাদের সেবা যতখানি সম্ভব সাগ্রহে সর্বদাই করতেন। এক বৎসর পরে আবার ফিরে এলেন নিজের প্রিয় সাধনার স্থান ভুবনেশ্বরে। এই সময়ে তাঁর অধ্যয়ন ও আলোচনা ক্রমে আরো অধ্যাত্মমুখী হয়ে উঠল। বলতেন, "ধ্যানে ডুবে যেতে হলে বিদ্যা ও স্মৃতি—এগুলিও অন্তরায় হয়ে ওঠে, তাই এখন প্রার্থনা ক'রে স্মৃতি ভোলবার চেষ্টা করছি।" অদ্ভুত ছিল তাঁর স্মৃতিশক্তি! যাকে একবার দেখেছেন, যা কিছু একবার পড়েছেন তা যেন আর ভুলতেনই না। সকলেরই ছিলেন তিনি 'দাদা'। পূর্ণত্যাগ ছিল তাঁর সাধনার ভিত্তি। কাম-কাঞ্চন-প্রতিষ্ঠা ত্যাগ, দেহারাম ত্যাগ। নিজেকে মুছে ফেলা, অপরের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া; ভালবাসার ভিত্তিতে পূর্ণ আত্মত্যাগ। বলতেন,—"শরীরের দিকে তাকালে কি আর জীবন (অধ্যাত্মজীবন) হয়? শরীর তো যাবেই। The flesh must be crucified so that the spirit may resurrect." "My part is only to love and serve"—(অন্তরকে জাগ্রত করতে হলে শরীরকে ক্রুশবিদ্ধ করতেই হবে।......আমার কাজ শুধু ভালবাসা ও সেবা করে যাওয়া।) এই

ছিল তাঁর কথা। শরীর ক্রমশঃ ভেঙে আসতে লাগল। আহার কমে গেল অস্বাভাবিকরূপে। তবু এত পরিশ্রম, এত পাঠ-আলোচনা, এত ধ্যান-ধারণা! কেউ বুঝতেই পারত না কতটা তাঁর অসুস্থতা। ডাক্তারও এসে তাঁর অধ্যাত্মপ্রসংগের প্রভাবে ভুলে যেতেন রোগীর শরীরের কথা।

ধ্যানের আসন ছেড়ে নড়তে চাইতেন না সহজে। তবুও ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে পূজার পূর্বে এক বন্ধুর বিশেষ আগ্রহে রওনা হলেন দাক্ষিণাত্যের তীর্থভ্রমণে। কি এক ভাবাবেগের আলোড়ন হয়ে গেল কন্যাকুমারীর দর্শনে। ফিরে এসে অন্যান্য বারের মতই উৎসাহ দুর্গা পূজার! বন্ধুরা অনেকেই আসে পূজার সময়ে। সুদীর্ঘ পূজা ও মন্ত্রপাঠ-অনুষ্ঠানে অতিবাহিত করলেন পূজার দিনগুলি। পূজার পরে সবাই ধরল, কলকাতায় যেতে হবে চিকিৎসার জন্য। শরীরের ভাঙন দেখে সবাই শংকিত। "কন্যাকুমারীর পায়ে দিয়ে এসেছি এই দেহ ও জীবন," বললেন তিনি, "আর কোন কামনা নেই আমার, আমি যাবার (মৃত্যুর) জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত।" কিন্তু একথা শুনেও বন্ধুরা ও সংগীরা কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি যে, তাঁর চিরযাত্রার দিন এত সন্নিকট। শরীরটা কতকটা ভেঙে গেলেও এমন কিছু কঠিন ব্যাধি তো হয়নি। বয়স তো মাত্র ঊনষাট। এখনো সিংহের মত শক্তি। সবার অনুরোধে শেষে বল্লেন, "একটা সংকল্প নিয়ে আসনে বসছি। যদি যাই তো শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি উৎসবের পরে যেতে পারি।" মধ্যরাত্রি হতে সারারাত ধ্যান আরম্ভ হল এই সময়ে। কলকাতার এক বন্ধুকে লিখেছিলেন—"শরীর যখন ভেঙে অন্য কাজের অযোগ্য হয়, ধ্যানই তখন একমাত্র অবলম্বন।" প্রত্যহ রাতে পাঠের সময় গভীর আধ্যাত্মিক জীবন ও তত্ত্বের আলোচনার পর বলতেন, "জীবনের প্রতি তৃষ্ণাই জ্ঞানের প্রধান অন্তরায়।" এমনি করেই কাটছিল দিন। সহসা শরীরে প্রকাশ হল রক্তহীনতার উপসর্গ। চিকিৎসকের আদেশে এবং বন্ধুদের আগ্রহের চাপে আসতে বাধ্য হলেন কলকাতায়। সকলের আশা চিকিৎসা হলেই সুস্থ হবেন। বাহিরের কর্মশক্তি, সকলের সংগে সানন্দে প্রসংগ প্রভৃতি দেখে বোঝবার উপায় ছিল না, কতখানি ভেঙে গেছে তাঁর শরীর। দেহত্যাগের ৬।৭ দিন পূর্বেও লেখকের সাথে আলোচনা করলেন শংকর ও

ব্র্যাড্‌লের দর্শন নিয়ে। কিন্তু ডাক্তার দেখে বললেন, ভিতরের সকল যন্ত্রই প্রায় শেষ হয়ে গেছে—'too late' (বড় দেরী হয়ে গেছে), তবুও চেষ্টা করলেন তাঁরা প্রাণপণ। আট দশ দিন ধরে হল চিকিৎসার অভিনয়। কলকাতায় সব বন্ধুদের কাছে সেই একই কথা—"দেহ গেলেও আমার দুঃখ নেই, কন্যাকুমারীর পায়ে জীবন দিয়ে এসেছি।" আর করুণভাবে বলেছিলেন, "বড় কষ্ট! সারা জীবন সকলের সেবা করে এসেছি, এখন সেবা নিতে হচ্ছে।" একটুও আর্তনাদ করেন নি নিজের জন্য, রোগের যন্ত্রণা সত্ত্বেও। ১লা পৌষ (১৩৫৯) অমাবস্যা। কতকটা অজ্ঞানাচ্ছন্ন অবস্থা সত্ত্বেও 'হরি ওঁ রামকৃষ্ণ, হরি ওঁ রামকৃষ্ণ' উচ্চারণ করতে লাগলেন নিজেই। অনিমেষ নয়নে দেখতে লাগলেন শ্রীশ্রীঠাকুর ও মায়ের মূর্তি। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের সাথে সাথে অদ্ভুত স্পন্দন দেখা দিল ভ্রূদ্বয়ে ও ভ্রূমধ্যে। অবিশ্রাম নামধ্বনি চলেছে—সকলের মুখে 'হরি ওঁ রামকৃষ্ণ।' খেলায় ক্লান্ত সন্তান চললেন দিব্যধামে—মায়ের কোলে। স্মরণ হল গীতার বাণী—

"প্রয়াণকালে মনসাঽচলেন
ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্
স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥"

শ্রীদীনেশচন্দ্র শাস্ত্রী

(১) সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা
সম্যগ্‌জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্যেণ নিত্যম্ ॥—মুণ্ডকোপনিষৎ।

—এই আত্মাকে সতত সত্য, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য ও সম্যক্‌জ্ঞানের দ্বারা লাভ করিতে হয়।

(২) তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ ॥—গীতা।

—যাহারা সর্বভূতের হিতে রত তাহারা আমাকেই প্রাপ্ত হয়।

(৩) আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জুন!
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥—গীতা।

—যে যোগী সকলের মধ্যে সুখ ও দুঃখকে নিজের সুখদুঃখের সহিত সমান করিয়া দেখেন তিনি শ্রেষ্ঠ যোগী।

(৪) Be at peace, first in yourself and then you will be able to bring others into peace.—Imitation of Christ.

—আগে নিজের মধ্যে শান্তি স্থাপন কর, তবেই তুমি অপরের মধ্যেও শান্তি স্থাপন করিতে পারিবে।

(৫) সচ্চিদানন্দই বস্তু, আর সব অবস্তু।...আসল কথা হচ্ছে সব ছেড়ে তাঁকে ধরতে হবে।—শ্রীরামকৃষ্ণ।

(৬) সাহসে যে দুঃখদৈন্য চায় মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে।
কালনৃত্য করে উপভোগ মৃত্যুরূপা তারি কাছে আসে ॥—বিবেকানন্দ।

প্রজ্ঞা-বাণী

১

পাবনা,
১৯৪২

স্নেহের—

তোমার পত্র পেলাম। তোমাকে পত্র লিখি-লিখি করি, কিন্তু লিখ্‌তে সাহস হয় না। তোমার পত্রের অপেক্ষায় বসে ছিলাম। আমার বলে কাউকে ধরতে সাহস হয় না। যেটাকে ধরি 'আমার' বলে সেটাই হয় মরে যায়, না হয় পালায়। 'আমার' বলে কিছুই আর রাখ্‌বে না, মা আমাকে সম্পূর্ণ একা করবে। একা এসেছি যেতেও হবে একা; তাই বোধ হয় মা সব সময় ঘা দিয়ে মনে করিয়ে দিচ্ছে—"তুই একা—তুই কেন 'প্রেম হেতু উন্মাদের মত প্রাণহীন' ছায়াকে ধরছিস্।" কতবার ভুলি, কিন্তু অপার করুণাময়ী কৃপা করে স্মরণ করিয়ে দেয়—"Thou art a wanderer among the strangers" (তুমি অপরিচিতের মধ্যে একটি পথিক মাত্র)। সংসার বিদেশ, এখানে তোমার কেউ নেই। অহং সহজে যায় না, সহজে আত্মসমর্পণ হয় না; তাই মা এক হাতে খাঁড়া নিয়ে আসক্তি কেটে দিচ্ছে, আর এক হাত বার করে বলছে, তোর যা কিছু আছে আমাকে দে; আমি তোর সমস্ত ভার বহন করব, তুই ভয় পাস্ না।

সমস্ত সন্দেহ, সমস্ত অবিশ্বাস ছেড়ে দিয়ে আমার ইচ্ছাস্রোতে ভেসে যা। কোথায় নিয়ে যাচ্ছি, তা তোর জানবার অধিকার নেই, তোর পিছনেও আমি, সামনেও আমি। তুই কেবল বর্তমানটা নিয়ে থাক, অতীত ও ভবিষ্যৎ ভুলে যা। আমিও তাই ভেসে চলেছি। যে মুহূর্তে মাথা তুলতে যাই অমনি ঘা খাই, আর মাথা নত হয়ে যায়। মনে মনে বলি,

"আমার মাথা নত করে দাও হে
তোমার চরণ ধূলার তলে,
সকল অহংকার হে আমার
ভাসাও চোখের জলে।"

মা সে-কথা শুনেছে, আঘাতের পর আঘাত দিয়ে আমার সমস্ত অহংকার ভেঙ্গে দিচ্ছে। তোমরা সকলে আশীর্বাদ কর, যেন সত্য সত্যই বিনয়ী, নিরহংকার, নিরভিমান হই। নিজকে যেন সত্যই দীনের দীন, হীনের হীন মনে করি। আমি যেন অসহায় শিশুর মত কেবল মা, মা, মা বলে কাঁদি। উঠতে, বসতে, খেতে, শুতে যেন মাকে ডাকি। নিজের ইচ্ছা বিন্দুমাত্র না রেখে, সমস্ত ইচ্ছা মায়ের ইচ্ছায় ডুবিয়ে নিজে যেন শূন্য হয়ে বসে থাকি—তিনি যদি পূর্ণ করে দেন এই আশায়।

"আমি শুধু তব ধনে করি আশ
পরিয়াছি দীনবাস
মম সঞ্চিত পাপ পুণ্য, সব করেছি শূন্য,
তুমি পূর্ণ করিয়া দিবে গো
তাই রিক্ত হৃদয়ে রহি গো।"

এখন মন চায় একা চুপ করে থাকতে। কেউ কোন কথা জিজ্ঞাসা করলে মনের শান্তি ভঙ্গ হয়। ইচ্ছা করে কোন কথা বলতে পারা যায় না—কারও হুকুম অনুসারে চলাও খুব মুস্কিল—প্রাণে বড় লাগে ; আর দাসখত লিখে দিয়ে এখানে আবদ্ধ থাকা আরও অসম্ভব।

শরীরটা ভাল, মনটা আরও ভাল, প্রতি মুহূর্তে যেন মনে হয়, "মায়ের কথা নয়নের জলে," "আমার মরম কথা কব লো কারে, আছি মরমে মরে।" নিজের জ্বালা ব্যথা কাউকে বলি এমন কেউ নেই। ভিতরটা ভেঙ্গে গেল, এক এক সময় অসহ্য হয়ে ওঠে। আর মনে হয়, চীৎকার করে কাঁদি আর বলি—মা কেন ঘুরাচ্ছ, পথ দেখিয়ে দাও, আর যে পারি না, আর কতকাল এ ভাবে ফেলে রাখবে? সকলের ছুটি আছে, সকলের অবসর আছে, কিন্তু আমার যে অবসর এখনও হল না। পাঁচ ছয় বৎসর ক্রমাগত মনে হচ্ছে, এক দৌড়ে পালাই ; কিন্তু ভুলে যাই—"পক্ষহীন শুন বিহঙ্গম, এ যে নহে পথ পালাবার। বারংবার পাইছ আঘাত কেন কর বৃথায় উদ্যম।" যতদিন বাঁচিয়ে রাখবে নীরবে সমস্ত সহ্য করতেই হবে। মিউ মিউ করা ছাড়া বিড়ালের বাচ্চা আর কিছু করতে পারে না ; তাই মিউ মিউ করি। শরীরের অসুখের জন্য আমার মোটেই দুঃখ হয় না, বরং খুবই সুখ। যখন শরীরটা ভেঙ্গে যায়, যখন চারদিকে অন্ধকার দেখি তখনই মনটা স্বাধীন ভাবে ঘুরে বেড়াতে পারে, তখনই সমস্ত বাঁধন যায় খুলে। তখনই মনের মুক্তি—

"বাঁধন তাহার গেল খুলে,
তারে হাওয়ায় হাওয়ায় নিয়ে গেল
কোন অচেনার ধারে।"

সেদিন আসাম থেকে আসার সময় ট্রেণ থেকে দেখেছি, কতকগুলি লোক রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আছে ; কেউবা লাথি দেখাচ্ছে, কেউ গালাগালি দিচ্ছে ; আর কেউবা হাত ইসারা করছে যাবার জন্য। নানা লোকে নানারকম কাণ্ড করছে, কিন্তু কারও কোন কথা গায়ে লাগল না, কেউ সঙ্গেও যেতে পারল না, কারণ ট্রেণ তখন চলছে। তাই মনে হয়, চলবার পথে দুনিয়ার গাল, নিন্দা, অভিশাপ বা আদর অভ্যর্থনা কিছুই গায়ে লাগে না। যে যাত্রী সে নিরপেক্ষ, উদাসীন। তার পক্ষে "ভালবাসা ঘৃণা, ভাল মন্দ দ্বন্দ্ব উভয়েই মন্দ।" সে কেবল spectatorএর (দ্রষ্টা) মত দেখে যায় দুনিয়ার কাণ্ড, আর হাসে। তোমরা যদি চাও আমাকে, তবে আমি তোমাদের আছিই,—আমাকে দিয়ে যা খুসী করিয়ে নাও। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্যন্ত আমি তোমাদের দাস, কিন্তু আমি যে কাউকে ধরতে পারব না। আমি যেটা ধরতে যাব সেইটাই ভেঙ্গে যাবে—সেইটাই পালাবে। নীরবে কাঁদলেও অভাব অভিযোগ কাউকে বলবার উপায় নেই। সব দুঃখ নীরবেই সহ্য করতে হবে। আমি চার পাঁচ বছর ক্রমাগত কাঁদছি, তা মা শুনছেই না। এখন মনে হয়, আমার আবেদন পৌঁছেছে ; তিনি ডাকছেন, যেতে হবে। কত দেরি জানি না, তবে মনে হয়, খুব বেশী দেরি নেই। আর কি লিখব, এখন বিদায়। আজ এখান থেকে রওনা হয়ে একবার —র সংগে দেখা করব। সেখান থেকে কলকাতায় যাব এই ইচ্ছা। এখন মার ইচ্ছা হলেই হয়। তোমরা আমার ভালবাসা নিও। ইতি—

তোমার দাদা

নগেন।

২

বাগনাপাড়া,
৮. ১. ২৫

স্নেহের—

অনেক দিন পর তোমাদের নিকট পত্র লিখবার সুযোগ পেয়েছি। তাই আজ দু'কথা লিখতে বসেছি। প্রত্যেকের নিকট পৃথক পত্র লিখবার অবসর নেই, সেজন্য একখানা পত্রে সকলের নিকট মনের কথা জানাচ্ছি।

এখানে বেশ আছি। বহুকাল এমন শান্তি পাই নি। এমন আনন্দ অনেক দিন পরে পেলাম। সকাল থেকে বারটা, একটা পর্যন্ত পড়াশুনা ইত্যাদিতে কেটে যায়। বিকালে খোলা মাঠে একা বেড়াই। তাতে যে কি আনন্দ পাই তা আর প্রকাশ করবার ভাষা নেই। মার কাছে নির্জনতার জন্যে ব্যাকুল হয়ে কেঁদেছিলাম; তাই মা আনন্দময়ী আমার আশা পূর্ণ করেছেন। Charms of solitude" (নির্জনতার আনন্দ) খুব ভোগ করছি। আমার জন্য তোমরা ভেবো না। আমার বিশ্রামের দরকার ছিল, তাই বিশ্রাম ভোগ করছি। মনে হচ্ছে আমার আয়ু বেশী হয়েছে। মার কাছে প্রার্থনা করেছি কতদিন, কতবার মনে হয়েছে, মা আমাকে রেহাই দাও; কিন্তু মুক্তি পাই নি। যেদিনের প্রতীক্ষায় এতদিন বসেছিলাম, সেদিন এসে আমার বন্ধন খুলে দিয়ে গত হল। আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল।

যারা আমার মুক্তির উপলক্ষ্য তারা অবশ্য ইচ্ছা করে এ কাজ করে নাই; আর তারা কেউ লোক খারাপ নয়। তারাও যথেষ্ট

খাটে। তাদের ভিতরেও যথেষ্ট সদ্‌গুণ আছে। তারা খাটে বলেই একটু মান, যশ ও প্রতিপত্তিও চায়। যদি তা পাবার সুবিধে না পায়, তবে তাদের রাগ বা দুঃখ হয়। এটা স্বাভাবিক। আমি সমস্ত জেনেও কিছু বলি নি, কারণ অভিযোগ করা আমার নীতির বিরোধী। তাছাড়া আমি নিজেকে সমর্থন করাও আত্মসম্মানের প্রতিকূল মনে করি।

ছেলেমানুষ! মান যশ প্রভুত্বের স্পৃহা জাগা খুবই স্বাভাবিক। দুনিয়ায় যত বড় বড় লোক, এমন কি সর্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ পর্যন্ত, যাঁদের অবতার বলে পূজা করা হয়, তাঁরাও দুঃখভোগ করেন তাঁদের অনুচরদের কাছ থেকে। তাঁরাও এমন অন্যায় করেন যা সাধারণের চক্ষে অমার্জনীয় অপরাধ। তাই মনে হয়, Man is but a man. I had the fortune or misfortune of coming in contact with many great men—politicians, educationists, scholars, social reformers and spiritual teachers—none is above human faults. (মানুষ মানুষ বৈ তো নয়! সৌভাগ্যবশতই হোক, আর দুর্ভাগ্যবশতই হোক আমাকে অনেক বড় বড় লোকের সংস্পর্শে আসতে হয়েছে। তাঁদের মধ্যে কেউ রাজনীতিজ্ঞ, কেউ শিক্ষাতত্ত্ববিদ্‌, কেউ পণ্ডিত, কেউ সমাজসংস্কারক, কেউ বা ধর্মগুরু; কিন্তু কেউই মানবীয় দুর্বলতার ঊর্ধ্বে নন)। তখন এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে মস্ত একটা শিক্ষা পেয়েছি। আর সেই থেকে কারও দোষ দেখতে চাই না।

প্রতি মুহূর্তেই মানুষকে রিপুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে হচ্ছে; চারদিক থেকে আক্রমণ, কত দিক রক্ষা করবে। মানুষ কামকে

দমন করে তো ক্রোধ এসে উপস্থিত। ক্রোধ যদি গেল তো অমনি লোভ এলো। এমনি করে মান, যশ, অহংকার, প্রভুত্ব, ঐশ্বর্য এসে উপস্থিত হয়। বেচারা কতই লড়াই করবে? একবারও কি হারবে না? "পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার"। Struggle is life (সংগ্রামই জীবন) এবং এ সংগ্রামের শেষ নেই।

নিজেরাও তো দেখতে পাচ্ছ, রিপুর সঙ্গে যুদ্ধ করা কত শক্ত। কামের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়েই সমস্ত শক্তি ফুরিয়ে যায়, তবুও কামকে পরাস্ত করা যায় না। তারপর আর অন্যের সঙ্গে লড়াই করবার ক্ষমতা থাকে না—ঢেউয়ের পর ঢেউ এসে উপস্থিত হয়। একটু অসাবধান হয়েছ কি শেষ। যারা কাম দমনের চেষ্টা করে তাদের রাগ বেড়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। তাই পুরাণাদিতে তপস্বীদের এত ক্রোধ দেখা যায়।

আমরা এসেছি শিখতে। সমস্ত দেখে শুনে এই জ্ঞান হয়েছে যে, যখন 'আমরা বড়', এইরূপ অভিমান-অহংকার বশতঃ ধরাকে সরা জ্ঞান হয়, তখন দেখতে হয়, weakness of great mind (মহামানবদের দুর্বলতা)। তাহলে লজ্জায় মাথা নীচু হয়ে পড়বে, অভিমান পালাবে। মনে হবে, এঁদেরই এই অবস্থা! আমাদের যে কি হবে তা তো ভাবতেই পারি না। যখন নিজেদের দুর্বলতা ভেবে হতাশ হই, তখন দেখতে হয়, greatness of a weak mind (দুর্বল মানুষের মহত্ত্ব)। যখন আশ্চর্য হয়ে ভাবি, এই অধঃপতিত ঘৃণিত ব্যক্তির ভিতরেও এত মহত্ত্ব আছে তখন প্রাণে আশার সঞ্চার হয়; আবার নূতন উদ্যমে পথে চলতে আরম্ভ করি। Judge not that ye be not judged (নিজের বিচার যদি না চাও, তবে

অন্যকে বিচার করতে যেয়ো না)। যদি নিজের দুর্বলতা থাকে, তবে সেগুলিকে সংশোধন করার চেষ্টা কর। পরের ভ্রান্তি দেখে নিজে সাবধান হও। আর যদি জ্ঞানী হও তবে দুঃখ কর, প্রার্থনা কর—"মা, এদের অজ্ঞান দূর কর, এদের ভুল ভেঙ্গে দাও।" সমালোচনা করবার কিছু নেই। তাতে নিজের কোন লাভ নেই—কেবল ক্ষতি। একটি কথা ভুলে যেও না যে, great man is great inspite of his faults (যিনি মহাপুরুষ দোষ ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও তিনি মহাপুরুষই)। তাঁকে ভগবান বড় করেছেন, তাই তিনি বড়।

একটি লোকের মাথায় বোঝা, অতি কষ্টে চলেছে রাস্তায়, পথটি বড় পিচ্ছিল, প্রত্যেক পায়ে পা ফস্‌কে যাচ্ছে, টাল সামলে কোন প্রকারে বেঁচে যাচ্ছে, একবার আর সামলাতে পারলে না, চিৎপাৎ হয়ে পড়ে গেল। রাস্তায় আরও লোক চলছিল—কেউ হো হো করে হেসে উঠল, কেউ আহা বলে সহানুভূতি দেখাল, আবার কেউ বা এসে তাকে ধরে তুলে তার মাথায় বোঝা তুলে দিল, আর বলল, বাবা, এত বোঝা নিয়ে চলেছ, সাবধান, পথ বড় খারাপ, আবার পড়ে যাবে। এখন জিজ্ঞাসা করি, তোমরা হাসবে, না আহা বলে সহানুভূতি দেখাবে, না মাথায় বোঝা তুলে দেবে। যে যত বড় লোক তার মাথায় তত বেশী বোঝা। তাই তার আছাড়ও খেতে হয় বেশী। যখন নেপোলিয়ন সেন্ট হেলেনাতে বন্দি, একদিন পাহাড়ের রাস্তায় তাঁর এক বন্ধু ও তার স্ত্রী বেড়াচ্ছেন। একটি নিগ্রো মাথায় খুব একটি বড় বোঝা নিয়ে উপরে উঠছে, এমন সময় সেই মহিলাটির গায়ের সঙ্গে নিগ্রোটির ধাক্কা লেগে গেল। মেয়েটি চটে লাল হয়ে গাল দিয়ে উঠলেন। তখন

নেপোলিয়ন বললেন, "Have respect for the burden, madam, (ভদ্রে, অন্তত বোঝাটিকেও একটু সম্মান দিন)।" প্রত্যেকেই বোঝাকে সম্মান দিতে চেষ্টা কর। বোঝা না থাকলে অনেকেই সামলে চলতে পারে, কিন্তু চলে না, এই যা দুঃখ।

যদি তোমরা আমাকে বিন্দুমাত্র ভালবাস, তবে বোঝার সম্মান দিতে শিক্ষা কর। নিজের ভিতরে এত গলদ! সে কথা ভুলে গিয়ে আমরা অন্যের দোষের সমালোচনা করি—আমাদের লজ্জিত হওয়া উচিত।

"Keep your eyes always upon yourself in the first place and specially admonish yourself in preference to admonishing others. (প্রধানত নিজের দিকেই দৃষ্টি রাখ; অপরকে তিরস্কার করার পরিবর্তে নিজেকেই তিরস্কার কর)।

তোমার সুখ দুঃখ অন্যের উপর নির্ভর করে না। "Thou art thy greatest friend, and thou art thy greatest enemy." "If you have not the favour of men, do not on that account be disheartened." (তুমিই তোমার সবচেয়ে বড় বন্ধু এবং তুমিই তোমার সবচেয়ে বড় শত্রু। মানুষের অনুগ্রহ লাভে বঞ্চিত হলে বলে হতাশ হ'য়ো না)।

"আপন জনে ছাড়বে তোরে
তা বলে ভাবনা করা চলবে না।"

যখন পথে চলতে হবে তোমাকেই, তোমার হয়ে কেউ চলবে না, তখন কেন অন্যের উপর নির্ভর করছ, অন্যের নিয়ে ব্যস্ত হচ্ছ? sufferfng is the poetry of life. (দুঃখ হচ্ছে জীবনের কাব্য-

রস)। যার জীবনে দুঃখ কষ্ট নেই, সংগ্রাম নেই, তার জীবনে মাধুর্য কোথায়? দুঃখই পরীক্ষা। পরীক্ষা না দিয়ে কেউ বড় হতে পারে নাই। জন্মের সঙ্গেই পরীক্ষার আরম্ভ। যেই শিশু ভূমিষ্ঠ হয়ে কাঁদে, অমনি চারদিক হতে জিজ্ঞাসা করে, ছেলে হল না মেয়ে হল? মা তখন অজ্ঞান। যে জন্মিল সে তখন চীৎকার করে কাঁদছে; কিন্তু সংসার সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে জিজ্ঞাসা করছে, "ছেলে না মেয়ে।" এই দুনিয়া! প্রতি পদে সংগ্রাম, প্রতি পদে দুঃখ। বিপদ দূর করতে যতই চেষ্টা কর, ঘা খেতেই হবে। "এ যে নহে পথ পালাবার, বারংবার পাইছ আঘাত কেন কর বৃথায় উদ্যম।"

জীবনে ঘা কম খাই নি, সময় সময় ক্ষত বিক্ষত হয়েছি আঘাতে, হতাশায়। কত দুঃখ যে পেয়েছি তা আর কাকে বলি? তখন মানুষের উপর খুব বেশী নির্ভর করতাম, তাই এই দুঃখ। কিন্তু পরে সে ভুল ভেঙ্গে গেল। তখন শিখলাম মৃত্যুকে উপাসনা করতে, দুঃখকে আলিঙ্গন করতে। তাই ভয় পালাল, দুঃখ গিয়ে আনন্দ এল। আমার মত দুঃখ খুব কম লোকই পেয়েছে, আবার খুব কম লোকই আমার মত মনের শান্তি ও আনন্দ লাভ করবার সুযোগ পেয়েছে। যে দিন থেকে মায়ের ভয়ংকরী মূর্তির সাধনার শক্তি লাভ করেছি, সেই দিন থেকে পেয়েছি আনন্দ—পেয়েছি শান্তি। সে দিন থেকে দুনিয়া বদলে গেছে। দেখতে পাচ্ছি, প্রত্যেক দুঃখের আড়ালে আছে আনন্দের উৎস। সেদিন থেকে টের পাচ্ছি,

"বারে বারে যে দুঃখ দিয়েছ দিতেছ তারা,
দুঃখ নয়, সে দয়া তব, জেনেছি মা দুঃখ হরা।"

সেদিন থেকে মনে প্রাণে জানি, "তুমি মঙ্গলময়, সুখে রাখ, দুঃখে রাখ যাহা ভাল হয়।" তোমার প্রিয়তমের জন্যই দুঃখ যদি সহ্য করতে না পারলে, তবে আর ভালবাসা কোথায়? He who is not prepared to suffer all things and to give himself up to the will of the beloved is not worthy of the name of a lover. (যে প্রিয়তমের জন্য সকল দুঃখ বরণ করতে প্রস্তুত নয়, যে প্রিয়তমের ইচ্ছার উপর নিঃশেষে নির্ভর করতে অসমর্থ, সে কখনো প্রেমিক নামের যোগ্য নয়।)

নিজের মনকে বাইরে দিয়েই যত দুঃখ পাচ্ছ। ভিতরে টেনে নিয়ে এস, তবে শান্তি পাবে। শান্তি ভিতরে, বাইরে নয়। তুমি মনকে ভিতরে রাখতে চাওনা বটে, কিন্তু মা জানেন ছেলের কি দরকার। দুঃখ দিয়ে, আঘাত দিয়ে তিনি মনটাকে ভিতরে ফিরিয়ে নিতে বলেন। "Turn your eyes npon yourself and avoid passing judgment upon other men's doing." (নিজের দিকে চোখ ফেরাও এবং অন্যে কি করলো না করলো, তার সমালোচনা থেকে বিরত হও।)

দুঃখ না পেলে চৈতন্য হয় না। আমরা ভুলে যাই মাকে; তাই দুঃখ পেলে মনে পড়ে "মায়ের কথা নয়নের জলে।" এমনি আমাদের স্বভাব যে, আমরা তাঁকে চাই না। তিনি যে আনন্দের ঘনীভূত মূর্তি, সে কথা মনে থাকে না। মনে করি, বাইরেই সমস্ত আনন্দ। কিন্তু তাঁকে না চাইলেও তিনি অভাগারে চেয়েছেন। চিরকাল তাই কত রকম করে টেনে নেবার চেষ্টা করছেন। দুঃখের প্রয়োজন হচ্ছে মনকে ভিতরে আনা—to seek there the

kingdom of heaven where peace and bliss for ever reign. (এবং সেখানে সেই স্বর্গরাজ্যের অনুসন্ধান করা, যেখানে বিরাজ করে চিরশান্তি ও পরম আনন্দ।) "It is good for us sometimes to have grievances and crosses ; for they often make a man enter into himself and remember that here he is in a state of banishment and therefore must not set his hopes on things of earth." (দুঃখকষ্ট অনেক সময় মংগলই আনয়ন করে, কারণ এরা মাঝে মাঝে সাহায্য করে মানুষকে অন্তর্মুখী হতে এবং স্মরণ করিয়ে দেয় যে, এখানে সে নির্বাসিত—এখানকার কোন জিনিষই নির্ভরযোগ্য নয়)।

নিজের চিন্তা দূর কর। নিজে কোথায় আছ ভেবে দেখ। পথের সম্বল কি জোগার হ'ল, সেটাও ভাববার বিষয়। Try to withdraw yourself from vain and useless talks. It will do you immence good, if you try to look within and examine your states of mind." (বাজে কথা থেকে বিরত থাকতে চেষ্টা করবে। তোমার অসীম কল্যাণ হবে, যদি তুমি অন্তর্মুখী হতে এবং নিজের মনকে খতিয়ে দেখতে চেষ্টা কর)।

অন্যের উপর দোষ চাপিয়ে কোন লাভ নেই। তার দোষ তারই থাক, সেজন্য সেই কষ্ট পাবে। আমার তাতে কোন অসুবিধা নেই। স্বার্থ, যশ, মান ও প্রতিপত্তি যারা চায় তারাই অন্যের উপর নির্ভর করে। আর যারা তা গ্রাহ্য করে না তাদের কি দরকার অন্যের মতামতের খবর নেওয়া ? যার যা খুসী বলে যাক, আমি আমার পথে

চল্‌ব। আমার সুখ শান্তি আমি খুঁজে নেব। সুখ আমার ভিতরে, বাইরে নেই। যিনি আনন্দস্বরূপ তিনি যে হৃদয়ের রাজা। তাঁকে বাইরে খুঁজে পাওয়া যাবে না। যুগ-যুগান্তেও তাঁকে বাইরে খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাঁকে 'খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।'

"Then we love to turn to God as the inward witness, when we are defamed by the world and not thought well of." (আমরা তখনই ভগবানের দিকে চোখ ফেরাই যখন সংসার আমাদের নিন্দাবাদ করে এবং কেউ আমাদের ভালবাসে না)।

আমার আনন্দ আমাকেই অর্জন করতে হবে। তা অন্যে দিতে পারে না। ঐশ্বর্য দিয়ে তাকে কেনা যায় না। বিদ্যা বুদ্ধি, অভিমান অহংকার দ্বারা তাকে পাওয়া যায় না। তাই "রাজা" 'নন্দিনীকে' ধরতে পারেনি। "কিশোর" তার খোঁজ পেত, কিন্তু সে আনন্দে বিভোর, আর "রঞ্জন" তার বাহন। সে ভয় কি তা জানে না। যেখানে ভয় নেই সেখানে দুঃখও নেই। সেখানে "নন্দিনী" সব সময় আছে। তাই আমাদের শাস্ত্রে বলেছেন—"অভীঃ" ; বলেছেন, "মা ভৈ—মা ভৈ।" ভয় তখন, যখন মনে করি, আমার সুখ অন্যের উপর নির্ভর করে, নইলে ভয় কিসের ? "Let eyes grow dim, and heart grow faint, and friendship fail, and love betray. Let Fate its hundred horrors send, and clotted darkness block the way. (Let) all nature wear angry frown to crush you out—still know, my soul, you are divine. March on and on, nor right, nor left,

but to the goal." (দৃষ্টিশক্তি ম্লান হোক, হৃদয় অবসন্ন হয়ে পড়ুক, বন্ধুরা পরিত্যাগ করুক, ভালবাসা কৃতঘ্নতায় পরিণত হোক, অদৃষ্ট পাঠাক তার শত সহস্র বিভীষিকা, পুঞ্জীভূত অন্ধকার পথ রোধ করে দাঁড়াক, ক্রুদ্ধ প্রকৃতি তোমাকে ধূলিসাৎ করবার জন্য কঠোর ভ্রুভঙ্গী করুক, তবু হে আমার হৃদয়, তুমি জেনো, তোমার মধ্যেই আছে ভগবৎ সত্তা। এগিয়ে চল, এগিয়ে চল, তাকিও না ডাইনে কি বামে ; সোজা এগিয়ে চল গন্তব্যস্থলের দিকে)।

"আপন জনে ছাড়বে তোরে,
তা বলে ভাবনা করা চলবে না।
শুনে তোমার মুখের বাণী
আসবে ঘিরে বনের প্রাণী।
হয়তো তোমার আপন ঘরের
পাষাণ হিয়া গলবে না।"

Love to hold intercourse with God alone and his angels, and avoid the acquaintance of men. (ভালবাস শুধু ভগবান ও তাঁর দূতদের সংগে সংযোগ স্থাপন করতে, এড়িয়ে চল মানুষের সংগে পরিচয়)।

তাঁকে ধর, তোমার যা দরকার তিনিই জুটিয়ে দেবেন। তাঁর দিকে যখন নজর থাকবে তখন বন্ধু বান্ধব সব জুটবে। একজন ছাড়লেও আর একজনকে পাবে নিশ্চয়। কেঁদে কেঁদে অন্তরকে নির্মল কর— আগুনে না পুড়লে কি খাদ যায়? যীশুখৃষ্টের কথা স্মরণ কর— "Blessed are those who mourn, for they shall be

comforted. (যারা অনুশোচনা করে তারাই ধন্য, কারণ তারা নিশ্চয়ই সান্ত্বনা লাভ করবে)।

নিজের দোষে অন্যকে দোষী কোরো না। "আমি স্বখাদ সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।"

যদি আমাকে ভালবাস, তবে পরনিন্দা, পরচর্চা ছেড়ে দিয়ে নিজের চর্চা আরম্ভ কর, নইলে আমাকে ছেড়ে দাও। আমি চাই না যে, আমার জন্যে তোমরা নীচ হও। আমার মধ্যে যদি কিছু ভাল থাকে, সেইটাকে আঁকড়ে ধর। যদি সত্যই ভালবাস, তবে তোমার জীবন এমন কর, যাতে লোকে তোমাদের দেখে বুঝতে পারে যে, এদের উপর একজন ভাল লোকের প্রভাব আছে। আমার জীবনের নীতি হচ্ছে—If any one blame, let your life be so that none can believe him. (তোমার জীবন এমন হোক যে, কেউ নিন্দা করলেও অন্যে তা বিশ্বাস না করে।)

আর অন্যে তোমার আমার কথা কি ভাবে না ভাবে, সে বিষয় চিন্তা করবার দরকার কি?—Few, alas, few feel for others. (দুঃখের বিষয় এই যে, খুব কম লোকই অন্যের দরদ বোঝে)।

কে কার জন্য ভাবছে? তোমার খবর যদি অন্যে না রাখে, তোমার সুখে দুঃখে যদি অন্যে সঙ্গী না হয়, তবে সেজন্য তোমার ভাববার কি প্রয়োজন? নিজের সুখ পরের হাতে দিয়ে নিজে কষ্ট পাও কেন? যে কয়জনকে বন্ধু বলে জান, তাদের মধ্যে যাতে ভালবাসা দৃঢ় ও স্থায়ী হয়, তারই চেষ্টা কর। নিজের ভিতর সৎ-প্রবৃত্তির বিকাশ হোক্, শত শত লোক মাথা নত করবে। নিন্দা অপযশ না থাকলে লোকের চরিত্র গঠন হয় না। মনে রেখো, যত বড়

গাছ, তার উপর তত বড় ঝড় বয়ে যায়। আমি খুব সৌভাগ্যশালী যে, আমাকে বাধাবিঘ্ন দুঃখ দুর্দশার ভিতর দিয়ে চল্‌তে হচ্ছে। প্রত্যেক বিপদই আমাকে শক্তিশালী করছে। আমি লোকের শত্রুতা, নিন্দা, ঘৃণা, বিদ্রূপ গ্রাহ্য করি না। যতদিন নিঃস্বার্থতা ও পবিত্রতা আছে, ততদিন দুনিয়ার কাউকে গ্রাহ্য করি না। Are you pure? You are then irresistable. Are you unselfish? Then the whole world is at your feet. (তুমি কি পবিত্র? তবে তোমাকে বাধা দিতে পারে এমন সাধ্য কারো নেই। তুমি কি স্বার্থহীন? তবে সমস্ত পৃথিবী তোমার পদতলে)। প্রত্যেকেই মনে কর, "দুনিয়ার এক একটি ঘটনা আমার সামনে উপস্থিত হচ্ছে, আমাকে শিক্ষা দিবার জন্য।" ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় পড়লে মানুষ কেমন হয় তা শিখবার জন্য এক এক রকম দুর্বলতা তোমার সামনে উপস্থিত হয়; এই সকল দৃষ্টান্ত থেকে তোমাকে লাভবান হতে হবে। তুমি বিচারক নও, তুমি শিক্ষক নও, তুমি শিক্ষার্থী; দুনিয়ার প্রত্যেকেই তোমার শিক্ষক; সুতরাং প্রত্যেকের কাছে শ্রদ্ধাসহকারে মস্তক অবনত কর। চোর জেলে যাচ্ছে, নিজে কষ্ট ভোগ করছে—তোমাকে শিখাবার জন্য; মাতাল উচ্ছন্ন যাচ্ছে তোমাকে সাবধান করবার জন্য; বেশ্যা ঘৃণিত জীবন যাপন করছে সতীর গৌরব বৃদ্ধি করবার জন্য; বিশ্বাসঘাতক নিজের উপর সমস্ত কলংক নিয়েছে বিশ্বাসীর মর্য্যাদা দিবার জন্য। জগতের কাকে বাদ দেবে? কাকে নিন্দা করবে? Every one is thy teacher, and pay respect to each one of them. Close your mouth, be silent. (প্রত্যেকেই

তোমার শিক্ষক। এদের প্রত্যেককে সম্মান দেবে। মুখ বন্ধ করে রাখ—নীরব থাক)। বৃথা অভিমান অহংকার ছেড়ে দাও; বুকে হাত দিয়ে জিজ্ঞাসা কর, কে কত সাধু। Be silent concerning others and keep a special watch upon yourself. (অন্যের সম্বন্ধে নীরবতা অবলম্বন কর, এবং বিশেষ দৃষ্টি দাও নিজের প্রতি।) যদি মানুষ হতে চাও, তবে প্রার্থনা কর—"Grant me prudently to avoid the one who flatters me, and patiently to bear with one who contradicts me." (ভগবান, যারা আমার চাটুবাদ করে তাদিগকে যেন বিচক্ষণতার সহিত এড়িয়ে চলতে পারি, যারা আমার বিরুদ্ধাচরণ করে তাদিগকে যেন ধৈর্যের সহিত সহ্য করতে পারি।)

সব ছেড়ে দাও সব পাবে; তাঁর জন্য যা ছাড়বে তাই পাবে। Leave all and you shall find all. তিনি নিজে যে ঘাড়ে করে বয়ে নিয়ে আসেন, তাঁকে সমস্ত অর্পণ করে সুখী হও। দিন রাত প্রার্থনা কর, মা আমার দুর্বলতা দূর কর, আমার অভিমান, অহংকার, লজ্জা, ঘৃণা, ভয় দূর কর, আমাকে বল দাও, আমাকে মানুষ কর। আর যারা তোমার নিন্দা করে, তোমার অনিষ্ট করে, তাদের জন্য প্রার্থনা কর। তাদের হয়ে তুমি মার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা কর। তোমারও মনে শান্তি হবে, তাদেরও মঙ্গল হবে। তোমরা সকলে আমার ভালবাসা ও প্রণাম গ্রহণ কর। ইতি—

তোমাদের দাস
নগেন।

৩

২৯. ১. ১৯২২

শ্রীশ্রীচরণেষু,

দাদা, এইমাত্র আপনার পত্র পেলাম। আমি আপনার সংবাদ না পেয়ে চিন্তিত ছিলাম। মনে করেছিলাম, হয়তো অসুখ হয়েছে, নইলে উত্তর দেবেন না কেন? আপনার পত্র না পেয়ে এখান থেকে অন্যত্র যেতে মন রাজী হচ্ছিল না। আজ নিশ্চিন্ত হলাম। এখানে সকলে খুশী হয়েছে স্বামী অভেদানন্দের বক্তৃতাতে। তিনি কেন যে অভিনন্দনের পক্ষপাতী নন তা জানি না, তবে যাঁরা তাঁকে নিয়ে যাচ্ছেন তাঁদের তরফ থেকে অভিনন্দন দেওয়া যে উচিত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে আমাদের দেশের লোক এখনও এত উদার হয় নি যে, স্বামী অভেদানন্দের কাছে ভারত যে কত ঋণী তা একবার বুঝতে চেস্টা করবে। এরা চায় একটু স্ফূর্ত্তি করতে। কাজেই যেখানে "প্যালা" দিতে হয় না এরা সেখানেই আনাগোনা করে। অভেদানন্দ ভারতের জন্য যা করেছেন, যদি কোন দিন দেশের ঠিক ঠিক ইতিহাস লেখা হয়, তবে সেইদিন তা সোনার অক্ষরে লেখা হবে।

Reception (অভিনন্দন) দিলে অন্তত তিনি বুঝবেন যে, দেশের লোক তাঁর কাজের যথার্থ আদর করতে শিখেছে, আর সংগে সংগে বিদেশেও জানবে যে, বাজে লোক এসে এদেশে বেদান্তের প্রচার করেন নাই। আমাদের দেশের লোকের যদি এত বুদ্ধিই থাকবে, তবে কি আমাদের এত দুর্দশা হয়? আজ যদি দশজন ভদ্রলোক তাঁকে সত্য সত্যই মান্য করে, তা হ'লে তাঁর একটা

প্রভাব হবে দেশের উপর। আর তখন তিনি ইচ্ছামত কাজ করতে পারবেন। জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সময় তিনি বিদেশে কাটিয়েছিলেন ভারতের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে। আজ লোকে তাঁকে চেনে না, তিনি দেশী হয়েও বিদেশী। কাজেই তাঁকে নিয়ে একটু হৈ চৈ করতেই হবে। স্বামীজীর সময়ও তাই হয়েছিল। একবার যদি তাঁকে ভারতের লোকে মেনে নেয়, তবে তিনি কাজে লাগবেন। দেশের ভাল লোক যারা তারা politics (রাজনীতি) নিয়ে ব্যস্ত; আর যারা অন্যান্য ক্ষেত্রে কাজ কচ্ছেন তারা হয় আত্মাভিমানী, না হয় খয়ের খাঁ। বিদেশে তিনি আর থাকতে পারলেন না দেশের কথা ভেবে ভেবে। এখানে এসেও কি ভাবে কাজ করতে হবে তা টের পাচ্ছেন না। অথচ কাজ করবার জন্য প্রাণটা ছটফট করছে।

তাঁর লেখা ছোট ছোট যে সমস্ত বই আছে, সেইগুলি ভাল করে পড়ে দেখবেন। দেখতে পাবেন, প্রতি পুস্তকেই ভারত সম্বন্ধে ও হিন্দু সম্বন্ধে কথা আছে। অভেদানন্দ সেই সুদূর বিদেশে ভারতের জন্য প্রাণপণ যুদ্ধ করেছেন। চারিদিকেই শত্রু, কেউ আপনার ছিল না, তার মধ্যে নিজের পথ ক'রে নিতে হয়েছে। মহাত্মা গান্ধী যখন আফ্রিকায় থাকতেন, তখন মাঝে মাঝে আসতেন ভারতে তাঁর কাজের জন্য। তখন কত লোককেই না তিনি খোসামুদি করেছিলেন। তারপর ১৯১৪ হ'তে ১৯১৮ পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করে দেশের সেবা ক'রে তবে না দেশের লোকের শ্রদ্ধা ও সেবা পেয়েছেন। আর ইনি আজ বিদেশী। যদি একটু আগ্রহ দেখেন, তবে তিনি মনে কত শান্তি পান, কত জোর পান। সমস্ত ভারতে

স্বামীজীকে ওভাবে reception না দিলে আজ যে কাজ হচ্ছে তার অর্ধেক কাজও হ'ত না, অনেক বিলম্ব হ'ত। এই দোকানদারীর দিনে তাঁকে পরিচিত ক'রে দেবার কোন লোক নেই। আমরা বাংগালী সবটাতেই কেবল দোষ দেখি। আমরা ভুলে যাই যে, ভগবান যখন নরদেহে আসেন, তখন তাঁকেও নিজের স্বরূপ নিজে গেয়ে বেড়াতে হয়; না হ'লে মহম্মদকে লোকেরা চিনতে পারে না। এখানে সাহেবরা ও অন্যান্য উচ্চকর্মচারীরা খুব আগ্রহের সংগে তাঁর কথা শুনেছে। মেয়েরাও তাঁকে আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে তাঁর বক্তৃতা শুনেছে। স্বামী অভেদানন্দকে হয় মুখে বলবেন, না হয় চিঠিতে সমস্ত জানাবেন। আমি আপনাকে কোনও উপদেশ দিতে পারি, এমন ধৃষ্টতা আমার নেই। আমি যা ভাল মনে করেছি তাই লিখেছি, তাতে অপরাধ নেবেন না। আপনার নিকট আমি সম্পূর্ণ নির্ভয়, কাজেই স্বাধীনভাবে আমার প্রাণে যা ভাল লেগেছে, তাই লিখলাম। রাগ করবেন না। রাগ যে মানুষের আছে আর থাকবেই, তা আমি জানি। আর আপনার রাগ যে "পোড়া দড়ি", ফুঁ দিলেই উড়ে যায়, তাও জানি। তবুও আপনি যে রাগের বশীভূত থাকবেন, তা আমার সহ্য হয় না। সংস্কারকে সংস্কারদ্বারাই নষ্ট করা যায়, আর এই হচ্ছে হিন্দুর বিশেষত্ব। আগে দুর্বাসা হন, তারপর রাগ করবেন, আর যদি ইচ্ছা হয় অভিশাপও দেবেন। এখন আপাতত রাগের ওপরই রাগ করুন। আর এ সম্বন্ধে লেখবার নেই।

আপনি যে মাকে বই পড়বার সুবিধা দিচ্ছেন, তাতে আমি খুব সুখী। আমি ঐ কাজটি ক'রে আসতে পারি নি, তজ্জন্য খুব

চিন্তিত ছিলাম। বাজে বই পড়ার পক্ষপাতী আমিও নই, তবে নানা বিষয়ে কিছু কিছু জ্ঞান থাকা ভাল, তাতে খারাপ হয় না। যাদের জীবনে একটা আদর্শ আছে, তাদের পক্ষে বই পড়া কোনও ক্ষতির কারণ হয় না; তারা সমস্ত বই থেকে ভালটুকু নিয়ে অন্যগুলি ফেলে দিয়ে থাকেন। আমি দু-তিন বৎসরের মধ্যে নাটক, ইতিহাস ও সাহিত্য পড়ে নিয়েছি। পূর্বে কখনও কোনও বাজে বই Philosophy ও Religion (ধর্ম ও দর্শন) ছাড়া পড়ি নি। আর দ্বিতীয়তঃ মানুষের প্রকৃতিগত ভেদ থাকবেই। সকলের পক্ষেই যে একই নিয়ম খাটাতে হবে তারও কোন অর্থ নাই; বরং ওটা করতে গিয়ে যত অনর্থ। আমাদের বর্তমান দুর্দশার কারণ এই যে, আমরা সকলেই অন্যের কৃত কতকগুলি আইনের দাস। আমরা একবারও জিজ্ঞাসা করবার অবসর পাই না, কেন এই আইন হয়েছে। আমরা ভুলে যাই যে, সকলের জন্য এক ব্যবস্থা হতে পারে না। সন্দেহ না আসলে সত্য জানবার ইচ্ছা হয় না। মা এতদিন একভাবে চালিত হয়েছেন; ধর্ম, ঈশ্বর ও নিজের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছেন। এখন কিছু অন্য কথা শুনলে ঘাত প্রতিঘাতে পূর্ব ভাবই দৃঢ়তর হবে, কারণ জীবনের গোড়াতেই ধর্মচর্চা যথেষ্ট হয়েছে। দুই দিক না দেখলে মানুষের মনের উন্নতি হয় না। স্বামীজী অত বড় নাস্তিক না হলে কি অত বড় বিশ্বাসী হতে পারতেন? আর নাস্তিক হওয়া এমন কিছু দোষের নয়; কারণ যদি ভগবান বলে কেউ থাকেন, তাঁকে না জানা পর্যন্ত সবাই নাস্তিক; বরং নাস্তিক খুব বেশী সাহসী ও সত্যবাদী। তৃতীয়তঃ মেয়েমানুষের যে কি দরকার, তা মেয়েরাই বোঝে। আমরা (পুরুষরা) চিরদিনই আমাদের

সুবিধার জন্য মাতৃজাতিকে দাসী করে রেখেছি। তারা যে মানুষ, তাদের যে চিন্তাশক্তি আছে, তারাও যে পুরুষের গুরু হতে পারে, তা আমরা ভুলে গিয়েছিলাম, অথবা মোটে স্বীকার করি নি। ব্রাহ্মরা কিছু কিছু স্বাধীনতা দিল, কিন্তু সে বিদেশী ধরনে। বেদে উপনিষদে অবশ্য রোমশা, অদিতি, গার্গী, মৈত্রেয়ী, শাশ্বতী ইত্যাদি মন্ত্রদ্রষ্টা নারীর উল্লেখ আছে দেখে আমরা সগৌরবে বলি যে, আমাদের মেয়েদের মত শিক্ষিতা মেয়ে কোন দেশে জন্মে নি। পণ্ডিত মহাশয়েরা সে কথা খুব জোরের সহিত বলেন; কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্যবশত তদনুসারে কাজ করেন না। আমাদের দেশের সৌভাগ্য যে, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব জন্মেছিলেন। তাই হিন্দুরা দেখতে পেল, হিন্দুর চক্ষে মেয়েরা কি? আরও বুঝল যে, মাতৃজাতিই ভবিষ্যৎ ভারতের গুরু। আর মেয়েরা যে পুরুষের নাগপাশ থেকে মুক্ত হবে, ঠাকুর তার ইঙ্গিত করেছেন মেয়েদের সকল কাজের অধিকার দিয়ে। গোঁড়া হিন্দুরাও ক্রমে বুঝতে পারল, মাতৃজাতির উন্নতি না হলে সত্যিকার উন্নতি কিছুই হবে না। তখন মেয়েদের জন্য মহাকালী পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হল ব্রহ্মচর্যের আদর্শে।

মেয়েদের স্বাধীনতা বহু প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত ছিল। এমন কি শংকর সম্প্রদায়েও মেয়ে সন্ন্যাসী দেখেছি। যত দিন যাচ্ছে ততই বুঝতে পারছি, আমরা কেন অধঃপতিত, কেন আমাদের এই দুঃখ দুর্দশা? চণ্ডীতে যে দেবতারা আদ্যাশক্তির স্মরণাপন্ন হলেন, সেটা কবির কল্পনা নয়। আজ আবার ভারতের সেই দিন উপস্থিত। দৈত্যের উপদ্রবে দেবতা ব্যতিব্যস্ত। আজ যদি শক্তিরূপা মা নিজে অস্ত্র না ধরেন, তবে আর কোন আশা নেই।

বিদ্যা বুদ্ধি, জ্ঞান গরিমা আবার যেদিন হতে মাতৃমুখে ধ্বনিত হবে, সেইদিন থেকে ভারত আবার ভারত হবে। এরূপ না হলে কোন উপায় নেই। যেদিন প্রতি গৃহে "মা" গুরু হবে, যেদিন ইতিহাস, পুরাণ, কাব্য ও ধর্ম মার মুখ থেকে ছেলেরা শিখতে আরম্ভ করবে, যেদিন বিদ্যায়, বুদ্ধিতে মাতৃজাতির কাছে পুরুষ পরাজিত হবে, পুরুষের অহংকার চূর্ণ হবে, সেইদিন পুরুষ বুঝবে যে সরস্বতী, দুর্গা মাটির প্রতিমা নয়—কেবল ফুল বেলপাতা দিয়ে পুরুতের দ্বারা পূজা করবার জন্য কল্পিত নয়। আমাদের ঘরে ঘরে সরস্বতী, অন্নপূর্ণা, জগদ্ধাত্রী বিরাজ করছেন। * * * আর যখনই পুরুষের গর্বিত মস্তক মা বলে লুটাবে, মা বলে তাদের সম্মান করতে বাধ্য হবে, তখনই দূর হবে ভারতের দুঃখকষ্ট। আর তখনই লোকে বুঝতে পারবে রামকৃষ্ণদেবের স্ত্রীগুরু গ্রহণের তাৎপর্য, তখনই বুঝবে ঠাকুর কেন অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

চতুর্থতঃ, মেয়েরা মেয়েদের অভাব আমাদের চেয়ে বেশী বুঝতে পারে, আর তাদের বুদ্ধি পুরুষের চেয়ে অনেক বেশী। ভগবান সেটা বেশ জানেন, তাই পুরুষের পেটে ছেলে হওয়ার ব্যবস্থা না করে মেয়ের পেটে ছেলে হবার ব্যবস্থা করেছেন। মার কাছে পুরুষ চিরকাল বাচ্চা। আমরা সেটা ভুলে যাই। একমাত্র স্বামী বিবেকানন্দই বলেছেন, "মেয়েদের ব্যবস্থা মেয়েরাই করবে ; পুরুষেরা তাদের সাহায্য করবে মাত্র। তাদের যে কি দরকার তা তারাই ভাল জানে। যে বয়সে একটি মেয়ে সংসারের ভার নিয়ে সংসার চালায়, তার দ্বিগুণ বয়সেও পুরুষ সংসার চালাতে শেখে না। ইংরাজী ও সংস্কৃত না শিখবার দরুন অনেক জিনিস হতে

মেয়েরা বঞ্চিত। তাদিগকে সর্ববিদ্যায় পারদর্শী হবার সুযোগ দিতে হবে।

সমস্ত বন্ধন হতে মুক্ত হবার জন্য প্রাণটা যত ব্যগ্র হচ্ছে ততই মাতৃজাতির বন্ধন ও দুর্দশা প্রাণে প্রাণে বুঝতে পারছি। স্বামীজী কেন সারা জীবন মাতৃজাতি ও গরীব দুঃখীর জন্য কেঁদে গেলেন, তা এখন বুঝতে পারি। স্বামীজী কন্যাকুমারীতে ধ্যানে বসে গরীব ও পতিত জাতির জন্য নীরবে অশ্রুপাত কেন করেছেন, তা বেশ বুঝতে পারি। যত দিন যাচ্ছে তত প্রাণটা ব্যাকুল হচ্ছে। আমার প্রাণ চায় এখন উন্মুক্ত আকাশ, উন্মুক্ত বাতাস, আর তরুতলে বাস। ঘরে থাকতে বড় কষ্ট হয়। পায়খানাতে বাহ্যে যেতে কষ্ট হয় এই মনে করে যে, আমাদের সুখের জন্য মেথর কত ঘৃণিত জীবন যাপন করে। আর তখনই মনে পড়ে ঠাকুরের কথা। তিনি মেথরকে মর্যাদা দেবার জন্য নিজে পায়খানা পরিষ্কার করতেন। আর লিখতে পারছি না। প্রাণটা যে কেমন করছে তা বুঝতে পারছি না। মা যেন একখানা পত্র দেন। বোধহয় জানুয়ারী পর্যন্ত এখানে আছি। তারপর কোথা তা জানি না। ইতি—

সেবক—নগেন।

৪

৩০. ১. ২২

শ্রীচরণেষু,

দাদা, আপনার প্রেরিত বই তিনখানি পেয়েছি। প্রবুদ্ধ ভারত পাঠাতে ভুলে গিয়েছেন। সেখানাও পাঠাবেন। আমি তুলসী দাসের রামায়ণ, কবিরের দোঁহাবলী, নিশ্চল দাসের বিচারসাগর ও

দাদু দয়ালের জীবনী ও বাণী পড়বার জন্য হিন্দি শিক্ষা করছি। অনেকটা শিখেছি, আর এক মাস লাগবে, তা'হলে আর কোন কষ্ট হবে না। বোধ হয় আর এক মাস এখানে থাকব ভাষা শিক্ষার জন্য, যদি আপনি আর কাউকে আমার কথা না বলেন। যদি লোকে জানতে পারে, তবে আমাকে উৎপাত করবে, আর মনটাও চঞ্চল হয়ে উঠবে। আবার কষ্ট পেতে হবে। তাই হরিদাসকে নিষেধ করে দিলাম আমার খোঁজ কাকেও বলতে। আপনি যদি কাউকে না বলেন, তবে কিছুদিন সময় পাই নিজেকে ঠিক করে নিতে। আমার বিশেষ অনুরোধ, আপনি আমার কথা কাউকে বলবেন না।

হরিদাসকে ঠাকুরের বই পড়তে বলি নাই, তার অনেক কারণ আছে। ওর ভাব আমি ভাঙ্‌তে রাজি নই। ভাঙ্গা খুব সহজ, গড়া বড় কঠিন। আর নিজে খোঁজ করে না নিলে, অন্যের কথায় কিছু হয় না, এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তারপর ওর প্রকৃতি আলাদা। ধৈর্য্য ধরে প্রথম থেকে ঠাকুর সম্বন্ধে কিছু বলবার আমার সময় নেই। তাছাড়া এক সঙ্গে ততদিন থাকবার সুযোগও হবে না। আপনি যদি ওর মঙ্গল চান, আর যদি ইচ্ছা করেন যে, ও ঠাকুরের ভাব কিছু কিছু গ্রহণ করে, তবে কোন কথা বলবেন না। আপনার কথাতে ওর অনিষ্ট ছাড়া উপকার হবে না। আর ঠাকুরকেও ভুল বুঝবে, ও জীবনে হয়ত ঠাকুর সম্বন্ধে একটা ছোট ধারণা করে রাখবে। কিছু বলবার প্রয়োজন নাই। খিদে পেলে আপনিই খোঁজ করবে। আপনার হাতে পড়লে ওর জান শেষ হয়ে যাবে। আপনি জানেন না যে, লোকে আপনার কথা ধরতে বা বুঝতে পারে না, বরং উল্টো ধারণা পোষণ করে। আপনি নিজ

জীবনে তা বেশ জানেন, আর আমিও সেটা বেশ লক্ষ্য করে দেখেছি। যদুবাবু, গণেশবাবু প্রভৃতির কথা তো মনেই আছে; আর ছেলেরা, প্রফেসাররা সকলেই এরূপ ধারণা পোষণ করেছিল, যাতে ঠাকুরের নামের গৌরব হয় নি, বরং অগৌরবই হয়েছিল। ঠিক ঠিক জিনিষ ধরতে হ'লে চোখ সাফ থাকা চাই। রঙিন কাচের ভিতর দিয়ে আলো এলে কিংবা রঙিন চসমা দিয়ে দেখলে ঠিক ঠিক আলোটা দেখা যায় না। কোন একটা জিনিষ ধরতে হলে তিনটি জিনিষ চাই —ভালবাসা, ধৈর্য, বিচার। আপনি আজ কতদিন ঠাকুরের কথা আলোচনা করছেন। কেমন ভাবে ঠাকুরের কথা পড়তেন, ঠাকুরকে কত ভালবাসতেন, সে সব কথা স্মরণ করলে, ও ঠাকুর সম্বন্ধে ধারণা দিন দিন বদলে যাচ্ছে কিনা, সেটা একটু চিন্তা করে দেখলে বুঝতে পারবেন, লোকে আপনার কথা বুঝতে পারে না কেন, আর ঠাকুরকেই বা চিনতে চেষ্টা করে না কেন। যারা স্মরণ, মনন, নিদিধ্যাসন করে, যারা জানবার জন্য ব্যাকুল হয়, তারাই ঠাকুরকে জানতে পারে, আর কোন কথা আলোচনা হলে তার অর্থ তাড়াতাড়ি ধরতে পারে। একদিনে আপনিও জানতে পারেন নাই। কতদিন গিয়েছে, তবে আস্তে আস্তে একটু আভাস পাচ্ছেন। পর্দা আস্তে আস্তে সরে না গেলে কি সত্য দেখার ইচ্ছা হয়? আমার বিশেষ অনুরোধ আপনি হরিদাস কিংবা অন্য কাউকে কিছু বলতে যাবেন না। তাতে তারা আপনাকেও ভুল বুঝবে ও আপনি যাঁকে জানাবার চেষ্টা করেন তাঁকেও ধরতে পারবে না। যদি কেউ গায়ে পড়ে কিছু জিজ্ঞাসা করে, তবে অবশ্য বলবেন। একটা সত্য জানতে হলে যে কেন তপস্যা করতে হয়, কেন বহুদিনের কঠোরতা, সেবা ও

নিষ্ঠার প্রয়োজন হয়, তা বুঝতে পারছি। অনেকের জীবন নষ্ট করে দিয়েছেন। অনেকে ধর্ম-জীবন থেকে দূরে সরে গিয়েছে। প্রত্যেকের মন তো আর জানেন না, আর কি ভাবে কে আসত তাও জানা ছিল না। তাছাড়া তারা নিজেদের মনের ভাবও খুলে বলত না বা সত্য জানবার জন্য আলোচনাও করত না। কাজেই গোলমাল হ'ত অনেক। এই সমস্ত নানা কারণেই সুরেন দা' প্রভৃতি অসন্তুষ্ট। আপনি যে ভাবে ভাববেন অন্যে যে সেই ভাবেই ভাববে, এটা আশা করতে পারেন না। আপনার অজ্ঞাতসারে ও অনিচ্ছা সত্ত্বে অনেকের ভাব নষ্ট হয়েছে। আবার যদি ঐ ভুলই করেন, তবে ভবিষ্যতেও অনেকের অনিষ্ট করা হবে, একথা ভুলবেন না।

আমার সঙ্গে আপনার জন্ম জন্মান্তরের সম্বন্ধ। আমি ছোটবেলা থেকেই একটু আধটু স্বামীজী ও ঠাকুরের কথা আলোচনা করতাম। আমার বয়স যখন পাঁচ ছয় বৎসর তখন আমি ঠাকুর, স্বামীজী, শংকর ও ত্রৈলঙ্গ স্বামীর নাম করতাম। ১১।১২ বৎসর বয়সে আমি দুঃখ করতাম যে, তাঁদের সঙ্গে দেখা হল না। তখন আমি জানি না যে, তাঁরা কেউ তখন এ জগতে নেই। তারপর অনেক দিন তাঁদের স্বপ্ন দেখতাম। একদিন একজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। (সেই সন্ন্যাসী পাবনাতে এসেছিলেন। সন্ন্যাসীটি রামকৃষ্ণ মঠের নয়)। তখন আমার বয়স ১৭।১৮ হবে। সন্ন্যাসী আমাকে দেখেই ঘরে নিয়ে গিয়ে বললেন, বাবা, তোমরা তো দেবভ্রষ্ট জীব। তোমরা যদি নিজের দিকে মন দাও তো বুঝতে পারবে, তোমরা কে? আর একজন সাধু আমাকে বলেন, বাবা, তুমি একটু স্থির

হয়ে বস তো, তাহলে জানতে পারবে, ভিতরে কি আছে। তারপর স্বামী সারদানন্দকে স্বপ্নে দেখি। সেবার কলিকাতায় গিয়ে, স্বামী সারদানন্দকে দেখি, আর মার সঙ্গে সেইখানেই দেখা। আমার সঙ্গে সঙ্গে নীচ থেকে অনেক লোক উপরে গেল মাকে দেখতে। আমি সকলের পরে মাকে প্রণাম করতে গেলাম। তখন আমি আর আমার দুই বন্ধু ছিলাম। মাকে প্রণাম করবার পরই যেন কেমন হয়ে গেলাম। মা কেবল আমার সঙ্গেই কথা বলেছিলেন, আমায় অভয় দিয়েছিলেন ও মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন—"বাবা ভয় নাই"। মার সে কথা বেশ মনে আছে। আর সেই থেকে জীবনটা ক্রমে উপরের দিকে যাচ্ছে। আমি খুব সৌভাগ্যশালী যে আপনাকে প্রথমেই বুঝতে পেরেছিলাম, তাই কখনও আমার কোন ক্ষতি হয় নি, বরং উপকারই হয়েছে। আমার সঙ্গে আপনার যে সম্বন্ধ তাতে যদি আমাকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দিতেন, তাহলেও আবার ফিরে যেতাম। কুচবেহারের কথা মনে হলে এখনও মনটা কেমন হয়ে যায়। আর সেই সঙ্গে মার কথা আরও বেশী করে মনে হয়। মাকে প্রণাম করে তবে ঘরে ঢুকতাম, আর শরীর মন পবিত্র হয়ে যেত, মনটা স্থির হত।

ঝড় হোক, বৃষ্টি হোক, অসুখ হোক আমি একদিনও মাকে প্রণাম করতে ভুলি নি। আমি একদিন দেখি যে, ঠাকুরের মুখের বদলে মার মুখ। যতবার চেষ্টা করি ঠাকুরকে চিন্তা করতে ততবারই মার মুখই দেখতে পেলাম। তখন তার অর্থ বুঝতে পারি নি। পাঁচ বৎসর পরে বুঝলাম, মা'ই ঠাকুর আর ঠাকুরই মা। যত দিন যাচ্ছে ততই মনটা অন্য রকম হয়ে যাচ্ছে। সেকথা লিখতে গেলে আর কোন কথাই লেখা হবে না। মোট কথা হচ্ছে এই যে, আপনি

আমাকে দেখে মনে করবেন না যে, সকলেই আপনার কথা শুনবে বা বুঝবে। হরিদাসকে এ সমস্ত কথা বলবেন না। আমার কোন কথা আর কাউকে বলবেন না, এ আমার বিশেষ অনুরোধ। যদি এই অনুরোধ না রাখেন, তবে খুব দুঃখিত হব।

আর একটা অনুরোধ, আপনি স্বামী অভেদানন্দকে চন্দননগরে আনবার জন্য চেষ্টা করবেন না। যদি লোকের মনের মত না হয়, তবে আপনাকে গালাগালি করবে। কাজেই আপনি চুপ করে যান। যদি তাদের গরজ থাকে, তবে তারা নিজেরা যেমন ভাবে পারে আনবে। তাদের যদি ইচ্ছা না হয়, তবে আপনি মিছে কষ্ট করেন কেন? ——শেঠ রামকৃষ্ণ মিশনের কোন কোন কাজ নিজে দেখেছে। বোধ হয় ১৩২২ সনের প্রবাসীতে "বৃন্দাবন ভ্রমণ" বলে একটী প্রবন্ধ ——শেঠ লিখেছিলেন। তাতে বৃন্দাবনের রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের কথার উল্লেখ আছে। বোধ হয় এই ——শেঠই লেখক। তারা যদি নিজের ইচ্ছায় না আনে, তবে আপনি গরজ করলে কোন ফল হবে না। যদিবা চক্ষুলজ্জায় আপনার কথা এড়াতে না পারে, তবে নিশ্চয়ই কোন না কোন দোষ ধরে আপনাকে জব্দ করবে। "খাদ না থাকলে যে গড়ন হয় না" তা তো তারা বুঝবে না। তারা একথা বুঝবে না যে, জগতের কোন মহাপুরুষ কোন সময়ে সমস্ত লোকের উপর সমান ভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নাই। মানুষ সকলেরই দোষ ধরেছে; কাজেই এঁর দোষও যে লোকে দেখবে, তা মোটেই আশ্চর্য নয়। মহাভারত পড়ে "দ্রৌপদীর পাঁচ স্বামীর" কথাই এদের মনে হবে। যারা নিজেরা খোসামোদপ্রিয়, যারা কেবল টাকা, কাম ও মানকেই সকলের চেয়ে

বড় মনে করে, তারা সন্ন্যাসীর মর্যাদা বুঝবে কি করে ? যারা কখনও সাধু ইচ্ছা হৃদয়ে পোষণ করে না, যারা আত্মার খবর করতে কখনও চেষ্টা করে নাই, তারা কেমন করে বুঝবে যে, রামকৃষ্ণের পদাশ্রিত সন্ন্যাসীরা কে ? তারা কেমন করে বুঝবে যে, এঁরা রাজার ছেলে, এঁদের সম্মান করলে রাজাকেই সম্মান করা হয়। তারা কেমন করে মনে করবে, এঁদের স্পর্শে বিবেক বৈরাগ্য জাগে। এঁরা যে দেশে যান সে দেশ পবিত্র হয়ে যায়। খৃষ্ট তাঁর শিষ্যদের বলতেন, দেশে দেশে গিয়ে সত্য প্রচার কর, আর যে দেশে যাবে সেখানে যদি লোকে তোমাদের কথা না শোনে বা সম্মান না করে, তোমরা তোমাদের পায়ের ধূলি সেই দেশে রেখে এস ; তা'হলেই দেশ পবিত্র হবে, লোকের চৈতন্য হবে, আর সেই দেশ তীর্থ হয়ে যাবে। কারণ তোমরা ঈশ্বরতনয়কে স্পর্শ করেছ। তোমাদের দেহ, মন, বাক্য, এমন কি পদধূলি পর্যন্ত পবিত্র। সেকথা কি চন্দননগরের লোক বুঝবে ? ত্যাগী না হলে কি ত্যাগীকে বুঝতে পারে ? সাধু না হলে কি সাধুর ভাব বুঝতে পারে ? চন্দননগরের লোক সাধুর জটা দেখে ভুলতে পারে বা লোহাকে সোনা ও সোনাকে লোহা করা দেখে সাধুকে ওজন করতে পারে ; কারণ, তারা সোনা লোহারই কারবার করে। যে যে-জিনিষের কারবার করে সে সে-জিনিষ বুঝতে পারে। ভাব দিয়ে যে সাধুকে ধরা, তা তারা কেমন করে পারবে ? নিজেরা তো কখনও ভাব নিয়ে নাড়া চাড়া করে নাই, কাজেই ভাব ওজন করবে কি করে ? ঠাকুরের দেহ থাকতে তো কত লোকই তাঁর কাছে এসেছিল, কিন্তু যারা ত্যাগী, সত্যের উপাসক, আর যারা কৃপা-প্রাপ্ত তারাই ঠাকুরকে বুঝতে পেরেছিল। যারা নিরন্তর ঠাকুরের

চরণে জীবন, মন, সুখ, মান সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়ে দীন হীন হয়েছিল তাদের শূন্য হৃদয় তিনি পূর্ণ করে দিয়েছিলেন। জগতের লোক তা দেখে অবাক হয়ে গেল ; কিন্তু যে গাছের ফল এই, সে গাছে যে আরও কত ফল আছে, তার খোঁজও কেউ কল্লে না, বা গাছটা কেমন তাও চেয়ে দেখলে না।

যারা ভোগ করতে চায় তাদের উচিত সমস্ত ত্যাগ করা ; তাহলে তাদের ভোগের অভাব থাকবে না। বিষয় ভোগে রত যারা, তারাই সবচেয়ে বড় ত্যাগী ! কারণ সন্ন্যাসী বিষয় ত্যাগ করে ভগবানকে ধরেছে, আর বিষয়ী সেই যে শ্রেষ্ঠ বস্তু, সব চেয়ে বড় যেটা, সেই ভগবানকেই ত্যাগ করে নিশ্চিন্তে বসে আছে ; কাজেই তারা শ্রেষ্ঠ ত্যাগী, ও সব চেয়ে বেশী দরিদ্র ; কারণ তাদের অভাব কোনকালেই মেটে না। আর সাধুদের "সাধ মেটে না সে স্বাদে" কারণ তাঁরা দিন রাতই মধু খাচ্ছেন ; তাঁরা অমৃত সাগরে পড়ে গিয়েছেন, পাশ ফিরলেই অমৃতের আস্বাদ পাবেন। ত্যাগ না থাকলে কি সাধুদের কথা ভাল লাগে ?

মানুষ চিরদিনই ভুল করবে, আর চিরদিনই মানবের দ্বারে দেবতা ভিখারী সেজে আসবেন। খেলা শেষ হয়, এ তাঁর ইচ্ছা নয় ; কাজেই ইচ্ছা করেই তিনি ঘুরে ঘুরে যুগে যুগে আসেন। আর প্রত্যেক বারেই দুই একটি ঘুড়ি কাটে বা দু' একটি গুটী পাকে। তাঁর এ ভিখারীবেশ চিরদিনই থাকবে ; আর চিরদিনই লোকে ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হয়ে এই ভিখারীকে বিমুখ করবে। কিন্তু ভিখারী দ্বারে দ্বারে এই ভাবেই ফিরবে, বিমুখ হয়েও সে অভিসম্পাত করবে না, আবার ফিরে ফিরে আসবে।

এ ভিখারী আর কিছুই চায় না, কেবল চায় মনটা। চার যুগ ধরে সে কেবল মনের সন্ধানে ফিরছে। তার মনটা সে বিলিয়ে দিয়েছে, তার মনটা চুরি গিয়েছে ; তাই মনের অভাবে মন খুঁজে ফিরছে। আহাম্মক আমরা, আমরা চাই তাঁকে ঐশ্বর্য্য দিয়ে ভুলাতে। একবারও ভাবি না, দশ বারো লাখ টাকা তাঁর কাছে কিছুই নয়। রত্নগর্ভ সমুদ্রে যাঁর বাস, লক্ষ্মী যাঁর সেবা দাসী, কুবের যাঁর ভাণ্ডারী, ইন্দ্র, বরুণ, বায়ু যাঁর আজ্ঞাবহ ভৃত্য, লোকে তাঁকে চায় ঐশ্বর্য্য দিয়ে ভুলাতে ! ঐশ্বর্য্যে তাঁকে পাওয়া গেলে রাজা বাদ্‌শারা তাঁকে গোলাম করে কিনে নিত, গোপবালক আর গোপীদের তাঁকে পাবার কোন আশাই থাকত না। অথচ তারাই হচ্চে তাঁর অতি আপনার। তারা জাতি, কুল, মান, লজ্জা, দেহ, মন, কিছুই আপনার বলে রাখে নাই ; সমস্তই শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করে নিশ্চিন্ত হয়েছিল। তারা আত্মসমর্পণ করেছিল ; তার প্রতিদানে শ্রীকৃষ্ণ তাদের কাছে দাসখত লিখে দিয়েছিলেন। কেবল তাই নয়, নিজেই যুগ যুগ ধরে তাদের অদ্ভুত আত্মত্যাগের কাহিনী প্রচার করতে লাগলেন, —নিজে আবার সব ছেড়ে 'রাধে রাধে' বলে কেঁদে কেঁদে বেড়ালেন। তিনি চিরদিনই দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে ফিরছেন। লোককে সেই ত্যাগ শেখাবার জন্য নিজে প্রতিবারই পিতা মাতা, আত্মীয় স্বজন প্রভৃতি সমস্ত ত্যাগ করে ভিখারীর বেশে কেঁদে কেঁদে ফিরছেন। গোপীরা একবার ত্যাগ করেছিল, আর তাঁকে সে দান ফিরিয়ে দিতে বার বার ত্যাগ করতে হচ্ছে।

তাঁর ঐশ্বর্য্যের অভাব নেই, তাঁর অভাব শুধু মনের। তাই যুগে যুগে তিনি প্রতিনিয়ত সেই মন খুঁজে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু তাঁর দুঃখ যে,

তিনি মনের মত মন পাচ্ছেন না। যখন তাঁর কান্না শুনে কেউ ছুটে আসে, তখনি তিনি তাঁর দুঃখ জানিয়ে বলেন, "আমার ব্যথার ব্যথী কে আছ, একবার এস ; আমার মনের মানুষ কে আছ, আমাকে শুধু মনটা দাও। আমি ধন, জন, দৌলত, দুনিয়া কিছুই চাই না, আমাকে কেবল মনটা দাও—আমি সুখী হব, আমার সমস্ত দুঃখ দূর হবে। সে চায় মন, আমরা দিই মঠ বা মন্দির। মনটাকে যে দেওয়া যায়, সে বোধ তো আমাদের নেই। মনটা যে আমার, সেইটাই যে বুঝি না ! তাই কোন রকমে চোখ ঠেরে মনকে বুঝাবার জন্য মন্দির গড়তে সুরু করি। নিজেরা কাঠ পাথর কি না, তাই কাঠ পাথরই চিনি। নিজেরা মাটি, তাই তাঁকে মাটি দিয়ে গড়ি। আর নিজেরা গাছ পাতা, ফল মূল চিরকাল খাই ; তাই তাঁকেও ফুল, ফল, পাতা দিয়ে সন্তুষ্ট করতে চাই। একবারও মনে হয় না যে, অনন্ত নীল আকাশ তাঁর মন্দিরের ছাদ, গ্রহ নক্ষত্র তাঁর প্রদীপ। তখন ভুলে যাই যে, ছয় ঋতু তাঁকে সাজাচ্ছে, পবন তাঁকে চামর ব্যজন কচ্ছে, জলদ তাঁকে স্নান করাচ্ছে, পাখীরা তাঁকে গান শুনাচ্ছে, জলধি কম্বুনিনাদে তাঁর জয় ঘোষণা কচ্ছে, আর গিরি ডুবে আছে তাঁর ধ্যানে। আমরা ভুলে যাই, নদ নদী নাচতে নাচতে তাঁর গুণগানে রত, ময়ূর ময়ূরী পেখম ধরে তাঁর সামনে নৃত্য কচ্ছে—সকলেই এ আনন্দে যোগ দিয়ে আনন্দে মাতোয়ারা হচ্ছে। আর মানব, তুমি সব চেয়ে চালাক কি না, তাই তুমি কিছুতেই এদের সংগে যোগ দিতে পাচ্ছ না ; তাই তোমার দুঃখও যাচ্ছে না। তুমিই কেবল এ আনন্দে বঞ্চিত। তাই বুঝি যুগে যুগে তিনি মানুষকে এই লীলায় যোগদান করাবার চেষ্টা করছেন। ইতি—

৫

পাবনা
৩. ৪. ২২

শ্রীচরণেষু,

দাদা, আপনার পত্র পেলাম। মার শরীর খারাপ, কিছুদিন বিশ্রামের প্রয়োজন। এমন কোন লোক নেই যে, তাঁকে সাহায্য করবে। বোনেরা সকলেই শ্বশুর বাড়ী। তাদের উপর আর তো আমাদের কোন হাত নেই। কাজেই মাকে কাজ থেকে রেহাই দিতে হ'লে অন্য ব্যবস্থা করতে হবে। আমি আগামীকাল বাড়ী থেকে সেই উদ্দেশ্যে অন্যত্র যাব, আমার ছোট ভা'য়ের বিয়ে ঠিক করতে, যাতে এই বৈশাখের শেষে বা জ্যৈষ্ঠের প্রথমেই বিয়ে হয়। আমার বাবা, মা এতদিনে রাজি হয়েছেন। আপনি ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করুন যেন ছোট ভাইকে বিয়ে দিয়ে আমি একটি দায় হতে উদ্ধার পাই।

বাবা ও মা'র মনের খুব পরিবর্ত্তন হয়েছে। রোজই রাত্রে ও দুপুরে গীতা, চণ্ডী ও অন্যান্য ভাল গ্রন্থ মাকে পড়ে শুনাই। ঠাকুরের প্রসংগ দিন রাত চলে। মা'র শরীর অচল হয়েছে, তাই এখন সাহায্য করা দরকার। আমি অবশ্য প্রাণ দিয়ে সেবা কচ্ছি, জ্ঞানত কোন ত্রুটি করি না। মা ও বাবার মনের ভাবের পরিবর্ত্তন দেখে আমার মনে হয়, ঠিক ঠিক ঠাকুরকে ডাকলে ধীরে ধীরে সমস্ত বাধা দূর হয়ে যায়, ভিতর ও বাইরের বৈরী সকলেই পরম বন্ধু হয়ে সাহায্য করে।

ধ্যান ধারণা করে অনেক জিনিষ টের পাচ্ছি। সে দিন এক অদ্ভুত অবস্থা হয়েছিল। আমার চিন্তাই যেন ভাব-রূপ ধরে আমার

সামনে উপস্থিত হয়েছিল। বসে বসে ধ্যান কচ্ছি—রাত্রি তখন ৪টা হবে। মনে হ'লো যে, সমস্ত আলোকাকীর্ণ হয়ে গিয়েছে। আস্তে আস্তে সেই জ্যোতি ঘনীভূত হয়ে মূর্তি ধরে ঠিক আমারই সামনে বসলেন। এমন উজ্জ্বল মূর্তি, এমন রূপ আমি কখনও কল্পনায় আনতে পারি নি। সেই মূর্তিটি ঠাকুরের। আমাকে যেন কি বলছেন—আমিও সেই কথা শুনবার জন্য আরো স্থির হয়ে উদ্‌গ্রীব হয়ে বসলাম। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর বললেন, "আমিই গুরু। আমার শক্তিতেই সকলে শক্তিমান, যা চাইবি সবই এখানে। (এই বলে আমার বুকে হাত দিলেন)। স্পর্শ মাত্র সমস্ত শরীর আড়ষ্ট হয়ে গেল, মেরুদণ্ডের ভিতর এক রকম প্রবাহ টের পেলাম—সেটা ক্রমে উপরের দিকে উঠল। একটি মন্ত্র বলে দিলেন, আর সেই মন্ত্রটি মাথায় করে অতি উজ্জ্বল অথচ নীল সর্পাকৃতি একটি আলো আস্তে আস্তে মাথার দিকে যেতে লাগল। তারপর যে ওঁকার দেখলাম সেটা বর্ণনাতীত। কিছুক্ষণ পরে আমার জ্ঞানটা যেন ফিরে এল, আমি তাঁকে বললাম, আমার বাবা মাকে ভাল করে দাও, তাঁদের মনের গতির পরিবর্তন হোক, তাঁদের ভিতর বিবেক বৈরাগ্য আসুক। তাঁদিগকে জানিয়ে দাও, তুমি কে। তখন যেন আদেশ দিলেন, ডাক তোর বাবা মা ও আর আর যাদের ডাকার ইচ্ছা। আমি বাবা ও মাকে ডাকলাম। ঠাকুর তাঁদের স্পর্শ করলেন। স্পর্শ করা মাত্র তাঁদের চৈতন্য হল, তাঁদের মন্ত্র জাগ্রত হল ও ইষ্ট দর্শন হল। আমার একজন সংগী আছেন, খুব ভাল লোক, (বয়স ৩৮।৩৯), তাঁর স্ত্রীও খুব ভাল। তাঁরাও এলেন। ঠাকুর তাঁদেরও স্পর্শ করে দিয়ে কি কি বলে দিলেন। তাঁরা আনন্দে বিভোর হয়ে

এক দৃষ্টে ঠাকুরকে দেখতে লাগলেন। তখন আপনাদের কথা মনে হল। মা ও আপনি এলেন। আপনারা আসার পরই ঠাকুরের যত সাংগোপাংগ—যাঁরা দেহ রক্ষা করেছেন তাঁরা সকলে, এক স্বামীজী ছাড়া, আবার দেহ ধারণ করে আশীর্বাদ নিয়ে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবার জন্য প্রস্তুত হলেন। কয়েকদিন খুব আনন্দে আমাদের ঠাকুরের সংগীদের সংগে কেটে গেল। নূতন আলো, নূতন জীবন পেয়ে আমরা ধন্য হলেম। আপনার দাসত্ব ঘুচে গেল। আমাদের নূতন আশ্রম হল। সেই আশ্রমের অধিবাসী হলেন, রামকৃষ্ণানন্দ প্রমুখ ঠাকুরের সংগীরা, বিবেকানন্দের শিষ্যেরা ও নিবেদিতা প্রভৃতি। সমস্ত ইউরোপ ও আমেরিকা, সমস্ত এশিয়া ঠাকুরের পদানত হল। বিভিন্ন মঠে ঠাকুরের মূর্তি স্থান পেল, বৃন্দাবন ও নবদ্বীপে বৈষ্ণবদের মধ্যে অনেকে ঠাকুরের ভাবে ভাবিত হল। বৌদ্ধরা যে বুদ্ধদেবের জন্য অপেক্ষায় বসে আছে, তারাও দেখল যে, বুদ্ধই এসেছেন। সে যে কি দৃশ্য তা সামান্য পত্রে কি জানাব। ঠাকুরের সেই জ্যোতির্ময় দেহ তিন সপ্তাহ ছিল। তারপর জ্যোতি মিলিয়ে গেল, আমারও ধ্যানের নেশা ভেঙে গেল। সেই থেকে মনটা কেমন যেন হয়ে গেছে। * * * আপনি যে কিছু হল না বলে দুঃখ করেন, আমি সে দুঃখের অর্থ বুঝি না। আমার একটুও কষ্ট নেই। প্রিয়তমের জন্য পথে চলা আরম্ভ করেছি—প্রতি পদবিক্ষেপেই মনে হচ্ছে, তাঁর কাছে যাচ্ছি। এ পথ যত দূরই হোক—এ পথ যে আমার প্রিয়তমের কাছে নিয়ে যাচ্ছে। তাঁর নামে পথে বেরিয়েছি—যদি মরতে হয় তাঁর জন্যই মরব, তাতে তো আর দুঃখ নেই, বরং সেটা হবে আনন্দের মৃত্যু। আমার প্রিয়তম আমার পথ চেয়ে বসে আছেন, আমিও চলতে আরম্ভ করেছি তাঁরই

উদ্দেশে। যত বিলম্বই হোক কোন দুঃখ নেই—দেখা হলেই তো সব আশা ফুরিয়ে যাবে। তাই তো আশায় আশায় চলেছি, আর কত কথাই মনে হচ্ছে। দাদা, দুঃখ কি? সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতও অতি মধুর। তাঁর জন্য এ অপমান, এ নির্যাতন, এ দুঃখ সহ্য করছি; তাই এ দুঃখেও যে আনন্দ আছে। প্রতি আঘাতে যে তাঁরই কথা মনে করে দিচ্ছে। তিনি যে আমাদের জন্য কত অপমান সহ্য করেছেন; তাঁর জন্য কি এতটুকুও সহ্য করতে পারব না? যে রূপ দেখেছি, তাতে তিল তিল করে যে জীবন বিসর্জন করা যায়—কোন কষ্ট হয় না। একবার সে মুখের দিকে চেয়ে দেখলে অতীত সমস্ত ভুল হয়ে যায়। স্বামীজীরা সেই রূপে মুগ্ধ হয়েছিলেন, তাই জীবনে অত দুঃখকষ্ট নীরবে সহ্য করেছেন। যখন শরীর মন দুঃখে অবসন্ন হয়ে আসে তখন যদি সেই রূপ দেখা যায়, তবে কি আর জ্বালা যাতনা থাকে?

আমরা যে তাঁকে ডাকছি সেটা মিথ্যা। তিনিই ডাকছেন, আর আমরা সেইদিকে ছুটে যাচ্ছি। মন দিয়ে মন টেনে নিচ্ছেন, দেহ দিয়ে দেহ আকর্ষণ কচ্ছেন, আর প্রাণ দিয়ে প্রাণ আকুল করে তুলছেন। তাই দেহ, মন, প্রাণ সকলই তাঁকে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়েছে। এখন বুঝতে পারছি, প্রাণে প্রাণে বুঝতে পারছি, কেন বৈষ্ণবেরা চিরদাস হয়ে থাকতে চায়; আর স্বামীজীর কথা—"দাস তব জনমে জনমে দয়ানিধে!"

তাঁর কৃপা বাতাসে পাল তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে উজিয়ে যাওয়াই হচ্ছে কাজ। পালে বাতাস পেলে কি আর ভয় আছে? আমি দেখেছি, পদ্মা নদীতে বর্ষাকালে যখন স্রোতের জন্য ষ্টীমার উজানে

যেতে পারে না, খুব কষ্ট হয় ও সময় লাগে, তখনও ক্ষুদ্র নৌকা পাল তুলে সোঁ সোঁ করে উজান বেয়ে তীরবেগে চলে যাচ্ছে। পালে বাতাস লেগেছে—আর কি ভয় আছে? যত প্রবল বেগই হোক এই ভব-নদীর, ঝাঁপ দিয়েছি অকূলে, অকূলেও কূল পাব। পথ জানি না, অন্ধকার! তবুও যাচ্ছি তাঁরই দিকে। তিনিই নিয়ে যাচ্ছেন। আমার কি সাধ্য তাঁর শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করি। জাতি, কুল, মান সমস্ত বিসর্জন না দিতে পারলে কি আর তাঁর কাছে যাওয়া যায়? তিনি উলংগ, আর আমরা কেমন করে আবৃত হয়ে তাঁর কাছে যাব?

আমার প্রণাম নেবেন। মাকে আমার প্রণাম দেবেন। মাকে বলবেন, তাঁর কৃপায় তাঁদের স্বরূপের আভাস পেয়েছি। আর সেই আভাস পেয়ে দিন দিন জানতে পাচ্ছি—ঠাকুর রামকৃষ্ণ কে?

ইতি—

৬

বাঘনাপাড়া

১৮. ৩. ২৫

স্নেহের—

ভাই, তোমার পত্র পেলাম। কাল আমি আর মা কেবলই তোমার কথা বলছিলাম। বলছিলাম, একবার দীনেশের ওখানে গেলে বেশ হয়; এমন সময় তোমার পত্র পেলাম। আমার মন চাচ্ছে একটু ঘুরে বেড়াতে, কিন্তু ছুটতে পারছি কই?

আগামী রবিবার অমূল্যদা, মা প্রভৃতি সকলে কলিকাতা যাবেন।

সেখানে ৭।৮ দিন থেকে পাবনাতে রওনা হবেন। আমি তাঁদের পাবনাতে রেখে যদি কোনখানে যেতে পারি,—দেখি মায়ের কি ইচ্ছা।

মানুষের ভিতর প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি দুইই আছে। প্রবৃত্তিটা instinctive (সহজাত), আর নিবৃত্তিটা চেষ্টা ও অভ্যাস সাপেক্ষ। প্রবৃত্তিপথেই যাও, আর নিবৃত্তিপথেই যাও—আসল কথা হচ্ছে শান্তিলাভ। যত বাসনা তত দুঃখ ; আর বাসনা না থাকলে মানুষ কখনও প্রবৃত্তিপথে চলে না। বাসনাত্যাগে যে আনন্দ, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু বাসনাত্যাগ কি সহজে হয়? তবে উপায়? উপায় হচ্ছে বাসনার মোড় ফিরিয়ে দেওয়া। একজন যে কাউকে হোক নিজের ইষ্ট ঠিক করে, তাঁকে কেন্দ্র করে সকল বাসনা পূরণ করে নিতে হয়। আর নিজেকে প্রকৃতি মনে করতে হয়। ধ্যানে, জ্ঞানে, জীবনের প্রতি মুহূর্তে যদি মনে করা যায়, এ শরীরটা স্ত্রী-শরীর, আমি মা, কি কন্যা, কিংবা স্ত্রী ; আর এই মনে করে যদি নিজের ইষ্টকে যখন যে ভাব প্রবল হয় তখন সেই ভাবে স্মরণ করা যায়, তবে তাই পার্থিব বাসনার হাত থেকে রেহাই পাবার উপায়। প্রত্যেকেরই তো একটা "নন্দিনী" চাই, নইলে জীবনটা কাঠ পাথর হয়ে যায়। ইষ্ট অর্থ সেই "নন্দিনী", অর্থাৎ something ideal and not real (একটা ভাব-বস্তু, বাহিরের বস্তু নয়)। মানুষ যখনই নিজের দেহে এবং দেহসংশ্লিষ্ট ব্যাপারে আপনাকে লিপ্ত করে, তখনই সে দুঃখ পায়। তার কারণ, মানুষ নিজে দেহ ছাড়া আরও কিছু। কাজেই সে কেন সীমাবদ্ধ দেহ ও দৈহিক সুখে আবদ্ধ থাকবে? একটা ঘরে একজনকে বন্দি করে রাখলে কিছুক্ষণ সে সুখে থাকতে

পারে; কিন্তু যে মুহূর্তে বুঝতে পারবে, সে বন্দি, ইচ্ছামত চলতে পারছে না, প্রতি পদেই গতিরোধ হচ্ছে, তখনই হয় তার দুঃখের আরম্ভ; আর তখনই সুরু হয় তার দুঃখ বিমোচনের চেষ্টা। যার বাসনা যত বেশী সে তত বেশী বদ্ধ। যে শরীরটাকে পিঞ্জর জেনে, মন ও আত্মাকে সর্বস্ব মনে ক'রে তাতেই জীবন ঢেলে দিয়েছে, তাকে যেখানেই রাখা যাক না কেন, সে সর্ব অবস্থায় মুক্ত; তার কোনও দুঃখ নেই। বাসনাতে আমরা সৃষ্টি করি; "আমি" ও "আমার" বলে মনে করি। কাজেই সৃষ্টবস্তুর মিলনে বা বিরহে আমাদের সুখ বা দুঃখ হয়। কিন্তু একবারও মনে করি না যে, যখন সৃষ্টি করেছি তখন থেকেই ধ্বংসের বীজ সেই সংগে আছে। Life and death are synonimous. Life and death are identical. (জীবন ও মৃত্যু সমার্থক—জীবন ও মৃত্যুতে কোন ভেদ নেই)। মনটাকে টেনে ভিতরে নিয়ে চলাই হচ্ছে জ্ঞান নিয়ে সংসার করা, বা নিষ্কাম ভাবে সংসার করা। যাক সে কথা। তোমার সংগে যখন দেখা হয়েছে তখন যে আমাকে তোমার জন্য করতে হবে, তা জানি; আর আমি সেজন্য প্রস্তুত। তবে একটু সবুর কর। মাঝে জ্বরে ভুগে উঠলাম। তুমি মার কথা লিখেছ—মাকে নিয়ে খুব আনন্দে দিন কেটে যাচ্ছে, পড়াশুনাও বেশ চলছে। কি অসীম ধৈর্য, কি অসীম শক্তি! ধন্য মা! ভালবাসা নিও। ইতি—

৭

১৪. ১১. ২৭

দাদা,

জানেন তো আমার কারো উপর রাগ করবার অধিকার নেই। ভাল মন্দ, শত্রু মিত্র সবাই সমান। কারো উপর দাবি নেই। আমি মনে প্রাণে রিক্ত—ভিখারী ; কিছুই চাইবার অধিকার নেই। মার ইচ্ছাতেই চলতে ফিরতে হয়। আমার যা প্রকৃত অভাব, সত্যি আমার যা প্রয়োজন, তা তিনিই আমার চেয়ে ভাল জানেন। কাজেই তাঁর উপর ভার না দিয়ে মানুষের উপর নির্ভর করার অর্থ—মাকে অবিশ্বাস করা। মাকে লক্ষ্য করেই চলছি, তিনিই এ পর্যন্ত আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। এখন জীবনের শেষ সময়। এখন কি তাঁকে ভুলে অকৃতজ্ঞের মত মানুষের উপর নির্ভর করতে পারি ? কাকেও ঘৃণা করি না, কাউকে হিংসা করি না। প্রত্যেককেই সেবা করবার ও ভালবাসবার অধিকার মাত্র রাখি, আর কোনও আকাংক্ষা রাখি না। মার কৃপা, মার আশীর্বাদ, মার স্নেহ প্রভৃতি মানুষের ভিতর দিয়েই প্রকাশিত হয়। তিনিই মা, তিনিই বাবা, তিনিই ভাই বোন, আত্মীয় বন্ধু, তিনিই শত্রু মিত্র, তিনিই সব। তিনিই স্নেহ প্রকাশ করবার সময় মাতৃমূর্তি আশ্রয় করেন, বন্ধুমূর্তি ধরে ভালবাসেন, আবার শত্রুমূর্তিতে শাসন করেন। আমি কোনও মানুষকে ভালবাসি না, আমি মাকেই পূজা করি। মা আমার বিভিন্ন মূর্তি ধরে আমার কাছে পূজা গ্রহণ করেন। সংসার কিংবা শরীর নিয়ে আমার সংগে কারো কোন সম্বন্ধ নেই ; আমার সম্বন্ধ আত্মা নিয়ে। যারা আত্মাকে চায় তারাই আত্মীয়, তারাই পরম বন্ধু। শরীর

ক্ষণস্থায়ী, সুতরাং শারীরিক সম্বন্ধও ক্ষণস্থায়ী ; তাই সংসারী লোকের সংগে ভালবাসা হয় না। যেখানে স্বার্থ সেখানে ভালবাসা নেই। ভালবাসা সাংসারিক স্বার্থের অনেক উপরে। ইতি—

৮

১৮. ১১. ২৭

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

একখানা গ্রন্থ অবলম্বন করে চলা উচিত। ধারাবাহিকরূপে প্রতিদিন সেই গ্রন্থ পড়া ও আলোচনা করা উচিত। যেখানে যেখানে সন্দেহ, সেখানে সেখানে দাগ দিয়ে রাখবেন। নিজেরা অবসরমত সে বিষয়ে চিন্তা করবেন। যদি তাতে কোন মীমাংসা না হয়, একদিন তার উত্তর পাবেন অযাচিত ভাবে। তখন আপনার আর প্রশ্ন করার অবসর থাকবে না। শাস্ত্রকে আশ্রয় না করলে ধর্মজীবনে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। সাধুরা—যাঁরা ভগবানকেই জীবনের ধ্রুবতারা করে সেইদিকে ছুটে চলেছেন, নিশিদিন সেই চিন্তা নিয়েই আছেন, তাঁদের কথা স্বতন্ত্র। আমাদের মত লোকের জন্য চাই গ্রন্থ। সাধুসংগ পাওয়া খুবই শক্ত। আবার সব সাধুর সংগে মেশাও যায় না। কাজেই জীবনের সমস্ত ব্যথা ও দুঃখ দূর করার উপায় গ্রন্থ। সংসারের লোকের সংগে মিশে লাভ নেই, বরং সমূহ ক্ষতি। তাদের ৯৯টা উপকার করলেও সে-সব ভুলে গিয়ে ১টা ভুলের জন্য প্রতিশোধ নেবে—পদে পদে শত্রুতা করবে। স্বার্থের জন্য এমন আঘাত দেবে যে, জীবনটা ভেঙে যাবে সেই ব্যথার চোটে। কাজেই তফাৎ থাকতে হয়। তুলসীদাস বলেছেন, সংসারে সাধুর অবস্থা

কেমন ? জিভের সংগে দাঁতের সম্বন্ধ যেমন। সুবিধা পেলেই কামড়াবে। যদি সংসারকেই বড় বলে মনে হয়, তবে অবশ্য সংসারের লোকের সংগে মিশতে হবে, তাদের সংগে মিথ্যা ব্যবহার প্রভৃতি করতে হবে। আর সংসারকে যদি বড় বলে মনে না হয়, তবে কেন সংসারের লোকের সংগে মেশা ? দেহ ধারণের জন্য অর্থের প্রয়োজন, সুতরাং কাজ করতে হবে ; সেজন্য মেশা ছাড়া, বিনা কারণে লোকের সংগে মিশলে সমূহ ক্ষতি।

স্পষ্ট কথা খুব ভাল, তা অস্বীকার করি না, কিন্তু তা সহ্য করার ক্ষমতা আছে ক'জনের। যদি তাদের উপকারই না হল ; তাদের মনে উল্টো ব্যথাই লাগল, তবে স্পষ্ট কথা ন্যায্য হলেও অন্যায় হয়ে পড়ে। তাই শাস্ত্রের মত হচ্ছে, "সত্যং ব্রূয়াৎ, প্রিয়ং ব্রূয়াৎ, মা ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।" অপ্রিয় সত্য বলে লোকের মনে কষ্ট দিয়ে লাভ নেই। ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব তাই বলতেন—"মাতাল দেখলে বলি, কি খুড়ো, কেমন আছ ? বস, তামাক খাও ইত্যাদি" ; নইলে গালাগাল দেবে। আর কিছু না হোক, মনটাতো কিছুক্ষণের জন্য চঞ্চল হবে। অন্যের জন্য নিজের সুস্থ মনকে চঞ্চল করার সময় কোথায় ? সকলেই তো বিবেকানন্দ নয় যে জগতকে শিক্ষা দিতে এসেছে। কাজেই যার যা ইচ্ছা মনে করুক, স্পষ্ট কথা বলতেই হবে এমন ত নয়। যাঁরা এসেছেন বহুজনহিতায়, বহুজনসুখায় তাঁদের কথা আলাদা। গৃহীদের সেরূপ করা উচিত নয়। সে-ই করতে পারে, মনে যার অসীম জোর, পিছনে যে তাকায় না, লোকের কথা যে মোটেই গ্রাহ্য করে না। মুখটা বন্ধ করা দরকার। ভগবান লাভ না হোক, মনের শান্তি তো পাবেন। নিজের লোকের উপর

রাগ অভিমান চলে, অন্যের উপর তা চলে না ; তাই কষ্ট পেতে হয়। নিজেকে গুটিয়ে ফেলে তাঁর কথায়, তাঁর চিন্তায়, তাঁর নামে দিন কাটান ; নিজে ধন্য হবেন, যারা আপনার স্পর্শে আসবে তারাও ধন্য হবে। ইতি—

৯

১৯২৯

স্নেহের—

সে আজ জীবনের পরপারে। সে গিয়ে আমার জীবনের একটা পর্দা সরিয়ে দিয়েছে। আজ প্রাণে প্রাণে অনেক কিছু বুঝতে পারছি ; আর মনে পাচ্ছি অসীম শক্তি। তার সংগে সংগে সমস্ত আশা-নিরাশার ঘাত-প্রতিঘাত চলে গেছে—জীবনের রহস্য অনেকটা জানতে পেরেছি ; আর ওপারের খবর জানবার জন্য মনটা অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছে। আজ বেশ স্পষ্টই বুঝতে পারছি, মৃত্যুই জীবনের চাবিকাঠি—সমস্ত জীবনটাই মরণের জন্য অর্ঘ্য প্রস্তুত করা। মরণের জন্য যে সদা প্রস্তুত, সে জীবনটাকে জেনে শুনেই তিলে তিলে অর্ঘ্য দিতে পারে। সে-ই ধন্য যে মরণের সংগে আলাপ করতে পারে, তাকে বলতে পারে,—

“মরণ, আমার মরণ, তুমি কও আমারে কথা,
সারা জনম তোমার লাগি
প্রতিদিন যে আছি জাগি,
তোমার তরে বয়ে বেড়াই দুঃখ সুখের ব্যথা,
মরণ, আমার মরণ, তুমি কও আমারে কথা।”

মৃত্যুই জীবনের মূল্য নির্ধারণ করে। মৃত্যুর দ্বার দিয়েই অনন্ত আনন্দের কাছে, অনন্ত জীবনের কাছে পৌঁছান যায়। জীবনটাকে মধুর করে তোলে মরণ, আর ভালবাসাকে ভালবাসতে শেখায় মরণ। যেখানে দেনা-পাওনা আছে সেখানে ভালবাসা নেই; যেখানে আশা-নিরাশা সেখানেও ভালবাসা নেই। মৃত্যু জীবনকে অমৃতের আস্বাদ দেয়। আমরা, হিন্দুরা, তাই মৃত্যুকে মা বলে, আনন্দময়ী বলে পূজা করে থাকি। ভগবান বুদ্ধদেব মৃতের কাছেই অমৃতের বাণী পেয়ে, ভোগ সুখে জলাঞ্জলি দিয়ে বুদ্ধত্ব লাভ করলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েই অর্জুন আত্মার অমরত্বে বিশ্বাসী হলেন ও 'নিমিত্তমাত্র' হয়ে সকল কার্য সম্পন্ন করলেন। নচিকেতা আত্মজ্ঞান লাভ করলেন যমের নিকট থেকে; আর রাজা পরীক্ষিৎ সাত দিন পর মৃত্যু জেনে, জীবন মরণের সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে গুরু-সমীপে উপস্থিত হলেন জ্ঞানলাভের জন্য। গুরু শুকদেব তাঁর প্রশ্নের উত্তরে জিজ্ঞাসু শিষ্যকে শোনালেন 'ভাগবত'।

মৃত্যু সম্মুখে না এলে কিংবা প্রাণপ্রিয় কাউকে না হারালে জীবন মরণ সম্বন্ধে ঠিক ঠিক প্রশ্ন জাগে না। সচরাচর যে সব প্রশ্ন করা হয় তা—(১) খবর সংগ্রহের জন্য, (২) নিজের মত সমর্থনের জন্য, (৩) নিজের বিদ্যা প্রকাশ করবার জন্য ও (৪) অপরের বা নিজের বিদ্যা পরীক্ষার জন্য। সত্যিকার প্রশ্ন ও ঠিক ঠিক জিজ্ঞাসু বিরল। সাধারণত লোকে নিজের মধ্যে কতকগুলি ধারণা পোষণ করে এবং সেই দিক থেকে অন্যের নিকট প্রশ্ন করে। পূর্বপোষিত ধারণার সংগে না মিললেই মনে করে, 'প্রশ্নের ঠিক জবাব হল না। নিজের জ্ঞানে অবিশ্বাস না এলে মানুষ কখনই অন্যের নিকট হতে কিছু গ্রহণ

করতে চায় না, পারেও না। প্রাণে প্রাণে যোগ না থাকলে, এক সংগে বসবাস না করলে প্রশ্ন ও উত্তর ঠিক ঠিক হয় না, অর্থাৎ প্রশ্নের উদ্দেশ্য বুঝে যথাযথ উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় না। আবার একই প্রশ্নের উত্তর লোকভেদে ভিন্ন হতে পরে। যাদের ধারাবাহিক চিন্তা আছে, যাদের বেশ পড়াশুনা আছে, কোন বিশেষ বিষয়ে তাদের সংগে প্রশ্নোত্তরে অবশ্য ভাবের আদান-প্রদান করা যেতে পারে ; তবে সত্যিকার প্রশ্ন করতে হলে কঠোর তপস্যার প্রয়োজন। কঠোর তপস্যাদ্বারা মন যখন পূর্বপোষিত ধারণাসমূহ থেকে মুক্ত হয় তখনই প্রশ্ন জাগে, তখনই জাগে জ্ঞানের পিপাসা, তখনই ভিতর থেকে মন উৎসুক হয় জ্ঞানের জন্য। আর প্রশ্ন জাগে মৃত্যুকে সম্মুখে রেখে। যখন এমন কেউ এ জগৎ থেকে চলে যায়, যার বিচ্ছেদের আঘাতে সমস্ত মনটা চিরদিনের জন্য অন্তর্মুখ হয়, তখন মানুষের অন্তরে জেগে উঠে পরম জিজ্ঞাসা। সে উৎকণ্ঠিত হয় জ্ঞানের জন্য।

সাধারণত আমরা জাগ্রত অবস্থায় যা করি বা শুনি আমাদের মনের নির্জন নীরব অবস্থায় সেই সব বিষয়েরই প্রশ্ন উঠে—মন তার উপরে আর যেতে চায় না। তপস্যা না থাকলে বা জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে না দাঁড়ালে এই জগৎটা যে অসার বা মিথ্যা তা মনেই হয় না। তাই জীবনের গভীরতর সমস্যা সম্বন্ধে প্রশ্নই জাগে না। যাঁরা বিশেষ শক্তিশালী পুরুষ তাঁরা অতি অল্পবয়সেই মনকে একাগ্র করে জীবনের পরপারের তথ্য অবগত হন। তাঁরাই 'বধির যবনিকা' তুলে অনন্ত আলোক দেখতে পান। সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা যাঁরা জগতে বড়লোক বলে বিখ্যাত তাঁরাও, ছেলে বয়সে তো দূরের কথা বৃদ্ধ বয়সেও এ সমস্যা সমাধানে অক্ষম।

মৃত্যু এসে যখন মানুষের সকল সাধ-স্বপ্ন চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেয়, যখন আঘাতের পর আঘাত পেয়ে সে হতাশায় কেঁদে বলে, 'এ কি নিঠুর খেলা!' তখনই তার জীবনতরী চেনার কূল ছেড়ে অচেনার কূলে চলে যায়। তখনই তার মন হয় ঊর্ধ্বগামী, আর সে অধিকারী হয় এই প্রশ্নের। প্রকৃত প্রশ্ন তখনই জাগে যখন মানুষ জীবনটাকে দেখে মিথ্যা—স্বপ্নবৎ। মৃত্যুরূপা মা সীমাবদ্ধ মানব-মনকে অসীমের দিকে নিয়ে গিয়ে চরম জ্ঞানের আভাস দেন।

জীবনে কোন দুরাকাংক্ষা, স্বার্থ, সাধ না থাকলে মরণের চিন্তায় জীবনকে মধুর করে তোলে। মরণের দূত দুঃখ। আমরা সুখের কথা সহজেই ভুলে যাই, কিন্তু দুঃখের কথা সহজে ভুলতে পারি না। যেটা যত দুঃখের, সেটা আমাদের জীবনে তত গভীর দাগ রেখে যায়। মৃত্যুকে সামনে রাখলে ভোগের ইচ্ছা পালায়, উচ্চ ভাব জাগ্রত হয়, ত্যাগ বিবেক বৈরাগ্য স্থায়ী হয়। মরণ শিক্ষা দেয় প্রকৃত ভালবাসা, কারণ তখন শুধু দেওয়া থাকে, পাওয়া থাকে না। অগ্নিশিখার মত হৃদয়ের সব আশা তখন ঊর্ধ্বমুখী হয়—জাগতিক কোন দ্রব্যের প্রতিই আকর্ষণ থাকে না—কিছুরই প্রত্যাশা থাকে না। মৃত্যুচিন্তায় বা গভীর দুঃখে মানুষের সুপ্তশক্তি জাগ্রত হয়—মানুষ অন্তর্মুখ হয়; আর সুখ মনকে হাল্কা করে। দুঃখের সংগে প্রেমের মিলনে মানবমনে গভীর তত্ত্বের দ্বার খুলে যায়। "Let love clasp grief lest both be drowned." (প্রেমকে দৃঢ় আলিংগনে বদ্ধ হতে হবে দুঃখের সংগে, নইলে উভয়েই ব্যর্থ হয়ে যাবে।)

আমাদের আধুনিক শিক্ষার কথা একবার ভেবে দেখ। জীবনের এই গভীর সত্যকে আমরা জানতে চাই কি? জীবনের সংগে

বর্তমান শিক্ষার কোন যোগ নেই। তাই জীবনের গভীর সমস্যা, যার উপর সমস্ত জীবন নির্ভর করে, যা জীবনের ভিত্তি, তার সংগে কোন সম্বন্ধ নেই। সমস্ত শক্তি ও অর্থ ব্যয় করে আমরা যে বিদ্যা শিক্ষা করি, তা আমাদের জীবনসংগ্রামে কোন কাজেই লাগে না। অথচ আমরা এই শিক্ষারই বড়াই করি ও নিজেদের শিক্ষিত বলে অভিমানও রাখি। যাঁরা দেশের বড় বড় লোক তাঁদের কথাই বলছি, আমরা তো অতি ক্ষুদ্র। এ শিক্ষার লক্ষ্য জ্ঞান নয়—ভোগ। তাই এই ভোগায়তন দেহ নিয়েই এর আরম্ভ ও শেষ ; এর উপরে আর কিছু ভাবতে শিখায় না। দেহাতিরিক্ত কিছুর উপর দৃষ্টি না থাকায় ত্যাগ, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য প্রভৃতি এ শিক্ষার বাইরে পড়ে গেছে। তাই এ শিক্ষা জীবনের সবচেয়ে বড় প্রশ্ন সম্বন্ধেই চিন্তার খোরাক দেয় না। এ শিক্ষা, শিক্ষা দেয় অন্যান্য সভ্যতার যা লক্ষ্য, সেই কাম কাঞ্চন ; অথচ আমাদের দেশের বাণী হচ্ছে—

"আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ"

আমাদের দেশের প্রাচীন ঋষিরা জগৎকে আহ্বান করে ঘোষণা করেছেন—

"ন কর্মণা প্রজয়া ধনেন
ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানশুঃ।"

সেই সুদূর অতীতকালে মৃত্যুকে জানতে গিয়ে, ত্যাগকে জীবনের ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল ঋষিদের শিক্ষাপ্রণালী। সেই সুদূর অতীত, যার খবর ইতিহাসও জানে না, সেই সময় ঋষিরা প্রশ্ন করেছেন, মৃত্যু সবাইকে গ্রাস করে, মৃত্যুকে গ্রাস করে কে? মৃত্যু কি? মৃত্যুর পর কি থাকে? জগতে এমন কি আছে যাকে জানলে আর

অজানা কিছুই থাকে না, যাকে পেলে অলব্ধ কিছুই থাকে না? এই জ্ঞানের দেশে আজ জিজ্ঞাসা বা জ্ঞানপিপাসা কিছুই নেই। সত্যিকার পড়াশুনা উঠে গেছে—চিন্তার বালাই নেই। শ্রদ্ধা, আত্মবিশ্বাস, উদ্যম, উৎসাহ, আত্মজ্ঞানের জন্য ব্যাকুলতা কিছুই নেই। জ্ঞানের নিতান্তই অভাব। যে দেশে জ্ঞান নেই, সে দেশের কিছুই নেই। আত্মজ্ঞানের জন্য পয়সা খরচ করে স্কুলে যেতে হয় না। তবে আমাদের আত্মজ্ঞান হয় না কেন? কারণ, আমরা আদর্শচ্যুত ; ইচ্ছার তীব্রতা আমাদের আদপেই নেই। কোন প্রকারে হৈ চৈ করে জীবন কাটানোই আমাদের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই এত বড় সত্য জিনিষটাকে ধামাচাপা না দিয়ে আর উপায় কি? আমরা আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলেছি ; তাই নিজেদের পণ্ডিত মনে করি ও আনন্দে আটখানা হই। পাশ্চাত্য গুরুদের বমি-করা গোটা কতক কথা শিখে নিয়ে নিজেদের জাতি, ধর্ম, শাস্ত্র সবই অবজ্ঞা করতে শিখেছি ; অথচ জগতের প্রায় সকল শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল ব্যক্তি ভারতের জ্ঞান নিয়ে নিজেদের ধন্য মনে করছে—জ্ঞানের জন্য ভারতের দ্বারস্থ হচ্ছে। জেন্দ্-আভেস্‌তা, টালমুদ, বাইবেল ও কোরাণ পড়, আর সেই সংগে উপনিষদ্ পড়, দেখতে পাবে পার্থক্য কতখানি। আমরা দেশের মাটিকে ভালবাসি, কিন্তু দেশের সংস্কৃতিকে গ্রহণ করতে নারাজ। দেশের জন্য জেলে যাচ্ছি, কত ত্যাগ করছি, কিন্তু নিজেদের মধ্যে হিংসা দ্বেষের বিরাম নেই। নিজেদের মধ্যে সহানুভূতি নেই, ভালবাসা নেই ; আছে সেই সব যার কোন প্রয়োজন নেই।

আমাদের শিক্ষার কোন আদর্শ নেই, শিক্ষা দেবার জন্য কোন

যোগ্য প্রতিষ্ঠান নেই। প্রত্যেক দেশেই শিক্ষার একটা আদর্শ আছে। সেখানকার শিক্ষাব্রতীরা ছেলেবেলা থেকেই জাতীয় আদর্শ অনুসারে সবাইকে গঠন করতে চেষ্টা করে; সকলকেই বাল্যকাল থেকে এমন একটা ছাপ দিয়ে ছেড়ে দেয় যে, সমস্ত জগৎ থেকে তাদের চিনে বার করা চলে।

আজ তুমি নির্জনে আছ—যথেষ্ট অবসর পেয়েছ; অথচ লিখেছ, অবসর পেলেও ধারাবাহিক চিন্তা করতে পার না, কোন একটা ভাব নিয়ে দিন কাটিয়ে দেবার মত তীব্র ইচ্ছা বা ক্ষমতা নেই। পাঁচ মিনিট স্থির হয়ে বসবার জন্য প্রতিদিন অন্ততঃ দুই ঘণ্টা করে লড়াই করতে হয়। তবেই বোঝ, কতটা শক্তি এই দিকে ব্যয় করলে তবে একটা ভাব বা ধারাবাহিক চিন্তা নিয়ে জীবন কাটান যায়। তোমার আন্তরিকতা আছে বলেই অনেক কথা লিখেছ, অনেক প্রশ্ন জেগেছে। তোমার পত্র পেয়ে খুবই আনন্দিত হয়েছি, তুমি নিজের দিকে নজর দিয়েছ দেখে। কপটতা না থাকলে কর্ম থেকে অবসর পেলে এই সব প্রশ্ন জাগবেই। কর্ম করা স্বাভাবিক। ছোট বড় সবাই কর্ম করছে, দেশসেবা করছে। কর্মবিমুখ দেশে যে আবার কর্ম-প্রেরণা জেগেছে, এটা খুব আনন্দের বিষয়। কিন্তু হাত পা ছুঁড়লেই কর্ম হয় না। যুক্ত কর্মই কর্ম। এতে উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হয়, শান্তি ও আনন্দও পাওয়া যায়। কর্মের সংগে চিন্তা যুক্ত না থাকলে কর্ম অকর্ম হয়ে যায়। তাতে উন্নতি না হয়ে অবনতিই ঘটে। কর্ম কখনও জীবনের উদ্দেশ্য নয়, উপায় মাত্র। জ্ঞান বা প্রেমই মানব জীবনের লক্ষ্য। কর্ম তিন ভাবে করা চলে—প্রেমে, জ্ঞানলাভের পর ও জ্ঞানলাভের জন্য। এ ভাবে কর্ম করলে কর্ম ও ধ্যানে কোন পার্থক্য থাকে না।

নিম্নস্তরে জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি আলাদা হলেও চরমে এরা একই হয়ে যায়।

কর্ম করে তো দেখলে। কর্ম হৃদয়ের কতটুকু পূর্ণ করতে পারে? কর্ম মন ও অন্তরের খোরাক দিতে পারে কি? মন ও অন্তরের খোরাক না দিলে তারা শুকিয়ে মরে; আর যত দুঃখ ও অশান্তি এসে উপস্থিত হয়। যারা সংসারে আছে স্ত্রীপুত্র পরিপালন ও অর্থ উপার্জন নিয়ে, তারা অবসর মত দেশের কাজ করে, এবং কর্মশেষে নিজ নিজ সংসারের কাজে মন দেয়; কিন্তু যাদের জীবনে সাংসারিক দায়িত্ব নেই, যাদের মন একটা কিছু উপরের বস্তু চায়, তারা কি কেবল কর্ম নিয়ে থাকতে পারে? তাই পুরাকালে গৃহীরা থাকত কর্ম নিয়ে, আর সন্ন্যাসীরা মন ডুবিয়ে দিত জ্ঞানের সাধনায়। গৃহীদের ধর্ম এক, আর সন্ন্যাসীর ধর্ম অন্য। সবারই প্রকৃতি এক নয়, লক্ষ্যও এক নয়, ধর্মও এক নয়। ভোগ থেকে মনকে টেনে নিয়ে কোন একটা উচ্চ ভাবে ডুবিয়ে রাখতে হলে বা একটা ধারাবাহিক চিন্তা নিয়ে সময় কাটিয়ে দিতে হলে প্রত্যহ অন্তত ১২।১৪ ঘণ্টা একটা বিষয় নিয়ে মেতে থাকতে হয়। অন্য কর্ম বা অন্য চিন্তা ছেড়ে সেই বিষয় ধ্যান, তাই আলোচনা, সেই সম্বন্ধে বই পড়া, সেই ভাবের ভাবুকদের সংগ করা প্রভৃতি জীবনে একটা ধারাবাহিক চিন্তা বা ভাব আনবার উপায়। সকল কর্মে, সকল অবস্থায় যদি একই চিন্তা জাগে, তবেই জীবনের ধারা ঠিক হয়, জীবন একই খাতে প্রবাহিত হতে থাকে।

মনের স্বাভাবিক গতি বাইরের দিকে। মন ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় ক'রে রূপ, রস, গন্ধ স্পর্শ শব্দের উদ্দেশ্যে বাইরে ধাবিত হয়। সেই

মনকে বহির্জগৎ থেকে ইন্দ্রিয়ে এবং ইন্দ্রিয় থেকে মনে ফিরিয়ে আনা যে কি কঠিন, এবং এজন্য কি মূল্য দিতে হয় তা একমাত্র আর্ত্ত মানবই বুঝতে পারে। মনকে সর্বদা ব্যাপৃত রাখতে হয় উচ্চ চিন্তায়। কর্ম উচ্চচিন্তার সংগে যুক্ত না থাকলে কর্মের চাপে মানুষের মন নীচে নামবেই; তাই কঠোর তপস্যা ও একনিষ্ঠ সাধনা দ্বারা কর্মের যোগ্যতা অর্জন করতে হয়। কেউ সাধন শেষ করে কর্ম করেন, কেউবা সাধন করতে করতে কর্ম করেন, অথবা কর্ম করতে করতে সাধন করেন; যার যেমন প্রকৃতি ও অভ্যাস। সংসার নেই, অথচ সাধন ছাড়া কর্ম,—সে কিছুতেই দাঁড়াতে পারবে না, তাকে ভেঙে পড়তেই হবে।

মহাত্মাজীর কথা চিন্তা কর। চিরদিন কর্ম-সাধনা ক'রে এবং কর্মসিদ্ধ হয়েও তিনি মাঝে মাঝে নির্জনতা চান, অবসর নেন, নির্জনে সাধনা করেন আরো ভাল ভাবে কর্ম করবার জন্য। সমস্ত শারীরিক শক্তিকে রূপান্তরিত করতে হবে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিতে। সে কি সহজ কথা! তা কি এলোমেলো ভাবে হয়? একটা অবিচ্ছিন্ন চেষ্টা চাই। আমাদের দেশে কর্ম সম্বন্ধে একটা মস্ত ভুল ধারণা আছে যে, কর্মের সংগে চিন্তা, ভক্তি বা জ্ঞানের কোন সম্পর্ক নেই; অথচ কর্মযোগের উৎপত্তিই এই দেশে। যে যত চিন্তাশীল সে তত বড় কর্মী। এ কথা আমরা জানিও না, মানিও না। পাশ্চাত্য গুরুরা বলেন, শ্রেষ্ঠ ভাবুকরাই সব চেয়ে বড় কর্মী। চিন্তার এমন শক্তি আছে যে, বিশ্বকে গুঁড়ো করে দিতে পারে। আমাদের দেশের তমোনাশ ক'রে যিনি কর্মে প্রবৃত্তি দিলেন, এ মরা ভারতে যিনি নূতন জীবন সঞ্চার করলেন তিনি অক্লান্ত কর্মী ছিলেন। তিনি বলেছেন,

তিনিই সবচেয়ে বড় কর্মী যিনি নিজেকে যথেষ্ট পবিত্র করতে পেরেছেন। চিন্তা ও কর্মপরিকল্পনা আরো অনেক নেতার ছিল, কিন্তু মহাত্মার শক্তি তাঁর পবিত্রতায়। মানুষ প্রথমে কাজ করে শরীর দিয়ে, তারপর চিন্তা দিয়ে, সর্বশেষে কাজ করে মৌনী হয়ে অন্তরের ভাব দিয়ে। যে কর্মে যতটা হৈ চৈ, যতটা বাইরের উদ্দীপনা সেই কাজ ততটা কম স্থায়ী। আর যেখানে নীরবতা, যেখানে শান্তি সেখানেই কর্ম স্থায়ী ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। এই প্রসংগে এক পাশ্চাত্য মহাকর্মীর বাণী শুনাই—"It is idle to think that one can communicate with others through the medium of words. Silence is the best medium of communication. Bees will not work except in darkness, morality will not work except in secrecy and thought will not work except in silence. (ভাষার মাধ্যমে ভাবের আদান প্রদান সম্ভব নয়। এটা একটা অলস কল্পনা। নীরবতাই ভাব-বিনিময়ের সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম। অন্ধকার ব্যতিরেকে মৌমাছি কাজ করে না, গোপনতা ব্যতীত নীতি কার্যকরী হয় না, নীরবতা ভিন্ন চিন্তার উৎস খোলে না।)

মৌমাছি তিন প্রকারের, একদল কেবল ছুটাছুটি করে। তারা বাইরে থাকে এবং মধু সংগ্রহ করে আনে; আর একদল মোটেই বাইরে যায় না। তারা দিন রাত কেবল কাজ করে। তাদের কাজ মৌচাক তৈরী করা। এ ছাড়া আর এক তৃতীয় দল আছে। তারা বাইরেও যায় না, কাজও করে না। তারা সংখ্যায় খুব কম। তারা প্রস্তুত করে মোম যার উপর সমস্ত মৌচাক ঝুলছে। সমাজেও এই

তৃতীয় স্তরের লোক আছে—তাঁরা ধ্যানী, সাধক ও চিন্তাশীল। পূর্বে এঁরাই ছিলেন ব্রাহ্মণ বা ঋষি। এই স্তরের লোকই প্লেটোর দার্শনিক শ্রেণী। এঁরা ছিলেন জাতির শীর্ষস্থানে। যে দেশে ও সমাজে এই স্তরের লোক যত বেশী সে দেশ তত বড়। আর যে দেশে এই ধরনের লোকের যত অভাব সে দেশ তত দুর্ভাগ্য। এঁরা থাকেন আপন চিন্তায় মগ্ন হয়ে, বাইরের কোন প্রয়োজনে এঁরা লাগেন না। কর্ম নাই, হৈ চৈ নাই—আছে নীরব সাধনা ও চিন্তাশীল জীবন।

নদী যখন চলে তখন তার স্রোতে দেখা যায় অনেক আবর্ত। জল এক আবর্ত থেকে অন্য আবর্তে পড়তে পড়তে অবশেষে মহা-সমুদ্রে গিয়ে মিলিত হয়। কর্মস্রোতও তেমনি আবর্ত সৃষ্টি করে প্রবাহিত হয়। একদল কর্মী এক আবর্তে কিছুদিন ঘুরপাক খেয়ে অন্য আবর্তে গিয়ে পড়ে; সেই অবসরে অন্য একদল পূর্ব আবর্তে এসে উপস্থিত হয়। এই ভাবে কর্ম চলে, দেশ চলে, জাতি চলে। জাতির জীবনে তখনই দুঃখ উপস্থিত হয়, যখন প্রত্যেককেই একটী আবর্তে আবদ্ধ রাখতে চেষ্টা করা হয়। এতে জাতির গতি বন্ধ করা হয়। তাই হাজার বছর সমাজ ও দেশ অধঃপতিত হয়ে আছে —জাতি পরাধীন হয়ে আছে।

পূর্বে এই গণ্ডিবদ্ধতা ছিল সমাজে—সমাজকে একটা বিশিষ্ট আবর্তে সীমাবদ্ধ রাখতে চেষ্টা করা হয়েছিল। আর এখন সেই চেষ্টা চলছে রাজনীতিক্ষেত্রে। রাজনীতিকে একটা নির্দিষ্ট গণ্ডিতে আবদ্ধ রাখবার চেষ্টা চলছে। সকলের জন্য এক ব্যবস্থা—একই কর্ম, এ হতে পারে না। প্রত্যেক ব্যক্তি ও জাতির জীবনে এমন পরিসর

থাকা চাই যেখানে স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে পারা যায়। তবেই উন্নতি হয়—তবেই কর্ম সাফল্যমণ্ডিত হয়।

কর্মের প্রবাহ ছুটে চলেছে। এক এক প্রকৃতির লোক এক এক কর্ম নিয়ে আছে। যারা এক আবর্ত ছেড়ে যাচ্ছে তাদের সেই স্থান অন্যে পূর্ণ করছে। এই ভাবে ব্যক্তি, সমাজ ও জাতি অভিব্যক্তির স্তর সমূহ পার হয়ে পূর্ণতার দিকে যায়। এই প্রবাহ বন্ধ হলে জীবন নষ্ট হয়—জাতি অধঃপতিত হয়।

কর্ম আছে, চিরদিনই থাকবে; কিন্তু লক্ষ্যস্থল বদলে যাবে, যদি সত্যি নিঃস্বার্থ ও নিষ্কাম কর্ম হয়, যদি কর্মের পেছনে মান, যশ, প্রতিপত্তি প্রভৃতি না থাকে, আর সামনে লক্ষ্য থাকে জ্ঞান ও প্রেম। যে মানুষ জীবন্ত ও যে জাতির প্রাণ আছে তাদের কর্মের ধারা বদলে যেতে বাধ্য। যেদিন থেকে আমাদের দেশে সকালে শয্যাত্যাগ হতে রাত্রিতে শোয়া পর্যন্ত সারাদিনের একটা বাঁধাধরা রুটিন হল, সেই দিন থেকে আমাদের সমাজ মরতে আরম্ভ করেছে। বর্তমানে সমাজের বাঁধ ভেঙে গেছে সত্য, কিন্তু রাজনীতিক্ষেত্রে একটা গণ্ডির সৃষ্টি হয়েছে। একই প্রকার কর্ম দেশের কর্ম, আর অন্য সব কর্ম দেশের কর্ম নয়; এ কখনো জীবন্ত জাতির লক্ষণ হতে পারে না। স্বাধীনতার আন্দোলন ঠিক ঠিক এলে মানুষের চিন্তায়, কর্মে, আহারে বিহারে সর্ব বিষয়ে স্বাধীনতা থাকে। যে নিজে স্বাধীনতার আস্বাদ পেয়েছে সে কখনো অন্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে না। যদি বাইরে কর্ম করতে চাও, তবে অন্তর্জীবনের উপরে জোর দাও। কর্মের হৈ-চৈ ও উচ্চ জীবন এক সংগে চলে না। তোমার জীবন তেমন নয়। অন্তর্জীবনের দিকে নজর নেই, তাই

বাইরের কর্মে ঝাঁপ দিতে চাও। প্রত্যক্ষের প্রতি আকর্ষণ সহজ ও প্রবল, কিন্তু অপ্রত্যক্ষ রাজ্য প্রত্যক্ষের চেয়েও সত্য।

মহাত্মাজী বলেছেন, "Meditation, prayer etc. are more real than eating, drinking and sleeping." "ধ্যান, প্রার্থনা প্রভৃতি পান, আহার ও নিদ্রা হতে অধিকতর বাস্তব।" কেউ চুপ করে বসে থাকতে পারে না; প্রকৃতি তাকে কর্ম করাবেই। সুতরাং কর্মের দিকে না ঝুঁকে জোর দাও ধ্যানের দিকে। Seek ye first the kingdom of heaven (সবার আগে স্বর্গরাজ্য অনুসন্ধান কর)। তাঁকে খোঁজ; এতে তাঁকে লাভ করবার সুযোগ হবে, সংগে সংগে কর্মও হয়ে যাবে।

কলুর বাড়িতে ঘানিভাঙা দেখেছ তো? বলদ খড়ের আশায় ক্রমাগত ছুটতে থাকে আর তাতে ঘানিও ঘোরে, তেলও হয়। বলদ কিন্তু এ সব টের পায় না, তার নজর থাকে সামনের ঐ খড়ের দিকে। এই কলুর বলদের মত তাঁকে লক্ষ্য করে চল। যতদিন কর্মের সংস্কার আছে ততদিন তিনিই কর্ম করিয়ে নেবেন; তারপর তিনিই কর্ম থেকে ছুটি দিয়ে নিজের দিকে টেনে নেবেন। কেবল কর্মের জন্য কর্ম করতে গেলে কিছুই হবে না। নিজের ইচ্ছায় কিছুই হয় না। ভগবানের ইচ্ছা না হলে কোন কর্মই হয় না। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ বলেন,—

"তোমার ইচ্ছা হোক হে পূর্ণ আমার জীবন মাঝে।"

নিজের ইচ্ছাকে তাঁর ইচ্ছাস্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে ভেসে চল। তাঁর উপর বিশ্বাস রাখ। তিনিই তাঁর কাজ করিয়ে নেবেন। জাতির উত্থান-পতনও তাঁরই ইচ্ছায় হয়। কালের

অলংঘ্য নিয়মে ঘটে থাকে জাতির ওঠা-পড়া। নিয়তির গতিরোধ করে এমন শক্তি কারো নেই। নিজে ইচ্ছা করে কোন কর্মে লিপ্ত হ'য়ো না—সামনে যে কাজ পড়ে করে যাও। কর্মের উদ্দেশ্য জ্ঞান লাভ, সে কথা যেন মনে থাকে। ইতি—

১০

১৯২৯

স্নেহের—

প্রথম জীবনের দিকে মনটা ফিরাও—শক্তি ও শান্তি দুই-ই পাবে। অভিমানই সমস্ত দুঃখের মূল; কিছুতেই যেন অভিমান না আসে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, "আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল"। সংসারে 'আমি'র উপর জোর দিতে হয়, আর এ-জগতে আমিকে ভুলতে হয়। কাম ক্রোধাদি সব গুটিয়ে থাকে অভিমানের মধ্যে। দুঃখ অশান্তির সংগে লালসার খুব সম্বন্ধ। মন শান্ত হলে সব শান্ত হয়। বাইরের উত্তেজনা ছেড়ে দিয়ে মনকে অন্তর্মুখ করবার চেষ্টা না করলে মনকে বশে আনবার চেষ্টা বৃথা। মনের স্বাভাবিক গতি বাইরে—তার সহায় বহিরিন্দ্রিয়-সমূহ। যখনই মন কিছু সৃষ্টি করতে চায় তখনই ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বহির্মুখ হয়। স্রষ্টাকে চাইতে হলে মনকে অন্তর্মুখ করতে হবে। কাম একটা শক্তি। ভগবানের যা সৃজনীশক্তি, মানুষে তাই কাম-শক্তি। মানুষও চায় সৃষ্টি করতে। যতক্ষণ জীবন থাকবে ততক্ষণ সৃষ্টি চলবে। যে শরীর নিয়ে থাকে, সে

সৃষ্টি করে শরীর দিয়ে। শরীরের সৃষ্টিক্ষমতাকেই বলা হয় কাম। যে মন নিয়ে থাকে, তার সৃষ্টি মনোরাজ্যে ; একে বলা হয় চিন্তা বা কল্পনা। সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি সবই এই স্তরের সৃষ্টি। আর যাঁরা আত্মা নিয়ে আছেন, তাঁদের সৃষ্টি আধ্যাত্মিকতা। শক্তি এক—বিভিন্ন স্তরে তার বিভিন্ন রূপান্তর। যেখানে শক্তি নেই, সেখানে মনুষ্যত্বও নেই। 'খোজা' বা impotent সংযমী নয়। অস্ত্রোপচার করেও ভোগের শক্তি নষ্ট করে দেওয়া যায়, অথচ শরীরের কোন ইন্দ্রিয়ের ক্ষতি হয় না। ডাক্তাররা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, এত কষ্ট না করে ঐ উপায়েই তো মানুষ কাম থেকে রেহাই পেতে পারে। উত্তরে আমি বলি, "শক্তি নষ্ট করা আর সংযত করা এক জিনিস নয়।" শক্তিকে অন্য শক্তিতে পরিণত করাই আত্মসংযম, কাম-শক্তিকে ধী-শক্তি ও প্রেমে পরিণত করাই ব্রহ্মচর্য। মনটাকে সদা উচ্চ প্রসংগে ও উচ্চ চিন্তায় না রাখলে সে নীচে নামবেই।

যতক্ষণ না প্রত্যাহার অভ্যাস হয় ততক্ষণ চরিত্রগঠন হয় না—কোন আদর্শ নিয়ে পড়ে থাকতে পারা যায় না। যৌবনের শক্তিতে মানুষ জিদ ক'রে একটা পথে হৈ-চৈ ক'রে চলে বটে, কিন্তু বেশি দিন ধরে থাকতে পারে না। বেশিদিন সেভাবে থাকা সম্ভব হয় না। তাই চাই নিয়মিত সাধন-ভজন, ধ্যান-জপ, শাস্ত্র আলোচনা, সৎসংগ, সৎপ্রসংগ ; চাই নির্জনতা, কঠোরতা, উপবাস ইত্যাদি। প্রত্যহ ৮।১০ ঘণ্টা করে একটা বিষয় নিয়ে পড়ে না থাকলে, বহুদিন পর্যন্ত সেইভাবে ভাবিত না থাকলে, একটা ধারাবাহিক চিন্তা বা ভাব নিয়ে পড়ে থাকবার ক্ষমতা জন্মে না। একটা লক্ষ্য করে চল, আর সব ভুলে যাও ; দেখ শক্তি পাও।

কি না। মন অর্থই চঞ্চলতা—সে একবার উপরে উঠবে আবার নীচে নামবে। তাকে চেষ্টা করে উপরে না তুললে, সে নীচে নামবেই। তাকে সর্বদা উপরে তুলে রাখা দরকার। এক ঘণ্টা বাজে কথা বললে দশ ঘণ্টা লাগে তাকে আবার উপরে তুলে ধরতে—তার নষ্ট শক্তি জাগাতে। একই ভাবাপন্ন লোক একত্র থাকলে সাধন-ভজন অজ্ঞাতসারেই হয়ে যায়, কারণ অন্য কোন বাজে কথা হয় না। বহুভাবের লোকের সংগ করলে মনের শক্তি হারিয়ে ফেলতে হয়। প্রথমে শক্তি সঞ্চয় করতে হয়। সেজন্য চাই নিষ্ঠা, চাই সাধনা।

পাগলের মত বলছ, সময় ফুরিয়ে গেল—জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সময় বৃথা হয়ে গেল। কিছুই বৃথা যায় নি, কোন চেষ্টাই ব্যর্থ হয় নি, সব ঠিক আছে। একবার ডুব দিয়ে দেখ। কোন ভাল কাজই কখনো বিফল হয় না। ভয় কি? পথ তো ঠিকই আছে, তবে ঘুরে যাচ্ছ—তাই না একটু বিলম্ব হচ্ছে। তাতেই বা কি আসে যায়? যে পথ দিয়েই যাও, জ্ঞান লাভ হচ্ছেই। শক্তি বা সময় নষ্ট হয় নি। "Ah, it is not too late till the tiring lungs cease to palpitate." (যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ)।

বাল্যজীবনের আদর্শকে আঁকড়ে ধর। আবার সেই উৎসাহ উদ্যম সবই ফিরে পাবে। প্রথম জীবনের ছাপ কখনো নষ্ট হয়ে যায় না—সমস্ত জীবন ধরে সেই ভাবেরই প্রকাশ হয়। তার বিরুদ্ধে লড়াই করতে গেলেই জীবনটা ভেঙে পড়ে, শক্তি নষ্ট হয়ে যায় এবং জীবন দুর্বিষহ হয়।

আত্মচিন্তায় নিমগ্ন হও। আত্মার ধ্যান কর। কোন মহাপুরুষকে

প্রাণ দিয়ে ভালবাস, তাঁর জীবনকে আদর্শ কর, তিনি যা করেছেন সেইরূপ কাজ কর, তিনি যেরূপ চিন্তা করেছেন সেইরূপ চিন্তা কর। যাঁরা আত্মার কথা, ভগবানের কথা বলেছেন তাঁদের বাণীই জীবনের সম্বল। তাঁদের বাণীই বল দিবে। খাওয়া-পরা ইত্যাদি সম্বন্ধে চিন্তা স্বাভাবিক। তা মানুষ করতে বাধ্য, আর সে সম্বন্ধে উপদেশ দেবারও লোকের অভাব নেই। আত্মার চিন্তাই পরমপুরুষার্থ; আর আত্মার বাণী—ভগবানের বাণী শোনাবার লোক জগতে বিরল। যাঁরা যুগে যুগে সেই অমৃতের বাণী নিয়ে আসেন তাঁরাই Salt of the earth (পৃথিবীর রসস্বরূপ)। তাঁদের জীবন ধ্যান ক'রে মানুষের জীবন বড় হয়ে ওঠে। তাঁদের সংগে অন্তরের যোগ হলে তাঁদের শক্তি হৃদয়ে প্রবাহিত হতে থাকে। তাঁদের একজনের বাণী তোমাকে শোনাচ্ছি,—"In the midst of the depths of misery and degradation the soul sends a ray of light, and man wakes up and finds that what is really his he never loses. * * * None can be degraded for ever. * * * The whole nature cannot crush me, it's my servant. Awake arise and stop not. Be not afraid. Think not how many times you fail. Never mind. Time is infinite. Go forward, assert thyself again and again, and light must come. * * * Help thyself out of thyself. None else can help thee friend, for thou alone art thy greatest enemy and thou art thy greatest friend." (আত্মা পাঠিয়ে দেন তাঁর আলোকরশ্মি দুঃখ ও অধঃপতনের অতল

তলে। মানুষ তখন জাগ্রত হয়ে দেখতে পায়, যা তার নিজস্ব সম্পদ, তার কখনো বিনাশ নেই। * * * কেউ চিরদিনের জন্য পড়ে থাকতে পারে না। সমস্ত প্রকৃতি একত্র হয়েও আমাকে ধ্বংস করতে পারে না,—প্রকৃতি আমার দাসী। 'উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত', থেমো না—ভয় পেয়ো না। কতবার পড়ে গেলে সে চিন্তা কোরো না। অভী, সময় অনন্ত—এগিয়ে চল, বার বার আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোল—আলোর সন্ধান পাবেই। "উদ্ধরেৎ আত্মনা আত্মানং।" অন্য কেউ তোমাকে সাহায্য করতে পারে না, কারণ তুমিই তোমার সবচেয়ে বড় শত্রু এবং তুমিই তোমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু।)

ওঠ, আবার গর্জে ওঠ। কোন শক্তিই নষ্ট হয় নি। কোন চেষ্টাই ব্যর্থ হয় নি। সঠিক চেষ্টাই সফল সাধনা। কিছু ব্যর্থ হয় না। একটা ভাব নিয়ে পড়ে থাকলে শক্তি আসবেই। বন্ধু-বান্ধবের প্রতি নির্ভর করার কোন প্রয়োজন নেই। প্রত্যেকে প্রত্যেকের প্রকৃতি অনুসারে চলে। একই লক্ষ্য, একই প্রকৃতি ও একই ভাব না হলে পাশাপাশি থাকলেও ব্যবধান থেকেই যায়—কিছুতেই মিল হয় না। Inner life বা অন্তর্জীবন চাইলে প্রত্যেককে তার প্রকৃতি অনুযায়ী চলতে দিয়ে, তার সংগে যতটা সম্ভব খাপ খাইয়ে চলতে হয়। অন্যের দোষ ত্রুটি দেখিয়ে বা সমালোচনা করে লাভ নেই। যাঁরা ওপারের লোক, যাঁরা জগতে আসেন বিশেষ বার্তা নিয়ে নতুন বাণী শোনাতে, তাঁরাই মানুষের দোষ ত্রুটির সমালোচনা করতে পারেন। সাধারণ মানুষের অধিকার নেই কিছু বলবার, বললেও তার কথায় কোন ফল হয় না। অন্যের দোষ ধরতে গেলে নিজের ভিতর সেই দোষ জাগে ও নিজেকেও সেই দোষে লিপ্ত

হতে হয়। "Hate the sin and not the sinner" (পাপকে ঘৃণা কর, পাপীকে নয়)। মানুষের নিজের মনের উপর কোন অধিকার নেই, সুতরাং সে যে অন্যায় করবে এতে আর আশ্চর্য কি? ক্ষমা করা, দোষ ছেড়ে গুণ ধরা, ভালবাসা এইগুলিই আশ্চর্য। We should weep that yet we are to see weakness in others. (এখনও যে আমরা অন্যের মধ্যে দোষ ত্রুটি দেখতে পাই, সেজন্য আমাদের অনুশোচনা করা উচিত)। নিজের যে গুণ নেই তা অন্যের ভিতরে দেখতে পাওয়া যায় না। যে দোষ নিজের নেই, সে দোষ অন্যের ভিতরেও দেখতে পাওয়া যায় না।

"দেখিলে পরের মুখ দেখে আপনার মুখ।"

The whole world is thy reflection. (এই নিখিল বিশ্ব তোমারই প্রতিবিম্ব।) যে যত পবিত্র সে অন্যের দোষত্রুটি তত কম দেখতে পায়। তাই জগতের শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ, যাঁরা অবতাররূপে যুগ-যুগান্তর ধরে পূজিত হচ্ছেন, তাঁরা কাউকে নিন্দা করেন নি বা ঘৃণা করেন নি।

মনের এক অবস্থায় যেটা গুণ অন্য অবস্থায় সেইটাই দোষ বলে মনে হতে পারে। দুঃখ দৈন্য সবই আমাদের স্বকৃত কর্মেরই প্রতিক্রিয়া। জগৎকে ভালবাস, জগৎ বেশিদিন তোমার উপর শত্রুতা করতে পারবে না। জগতের সংগে মেশা মানে আর্শিতে মুখ দেখা,—যেমন মুখ করবে তেমনি প্রতিবিম্ব দেখতে পাবে। মনে কোন বাঁক থাকলে তার প্রতিক্রিয়া আসবেই। যেখানে দুঃখ পাবে, যেখানে আঘাত পাবে সেখানেই দোষ নিজের উপর নেবে। মনকে প্রশ্ন করবে, কেন এরূপ হল—এটা কোন কর্মের প্রতিক্রিয়া।

প্রথম ধরতে না পারলেও পরে বেশ বুঝতে পারবে যে, লোকে নিজের ত্রুটির জন্যই দুঃখ পায়। একজনের ত্রুটির জন্য অন্যে দায়ী নয়। এক সময় নিজের অজ্ঞাতসারেও যে ভাব জগৎকে দান করবে, অন্য সময় জগৎ সেই ভাবটাই ফিরিয়ে দেবে। এই প্রসংগে বুদ্ধদেবের বাণী স্মরণ হচ্ছে,—"Ye suffer for yourself, none else compels thee friend." (তুমি নিজের দোষেই দুঃখ পাও, অন্য কেউ তোমাকে দুঃখ পেতে বাধ্য করে না)। স্বামী বিবেকানন্দও বলেছেন,—"Thine is the hand that holds the rope that drags thee on." (যে রজ্জু তোমাকে টেনে নিয়ে চলেছে তা তুমি নিজ হাতেই ধরে আছ)। সুতরাং দুঃখ করবার কারণ নেই।

যদি মানুষ নিজের দুঃখের জন্য নিজে দায়ী হয়, (অবশ্য আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ছাড়া) তবে সে-দুঃখ দূর করবার শক্তি তার নিজেরই আছে। যদি দুঃখের কারণ তার বাইরে থাকে, তবে শত জীবনের চেষ্টাতেও সে দুঃখ দূর হবে না। সব দুঃখের মূল 'আমি'। সেই 'আমি' ভগবানের দিকে না গেলে মানুষের কিছুতেই শান্তি ও আনন্দ হয় না। "You are miserable wherever you are, whatever way you turn yourself, unless you turn to God." (যদি তুমি ভগবানের দিকে না ফের, তবে যেখানেই থাক না কেন, যেখানেই যাও না কেন, তোমার দুঃখ-দুর্দশা থাকবেই।) এটা একজন পাশ্চাত্য মহাপুরুষের বাণী।

বাইরের কোন কিছুর উপর নির্ভর না করে আত্মনির্ভর হও। 'আত্মনির্ভর' অর্থ নিজের উপরে নির্ভর নয়। যে শরীর নিয়ে চলেছে,

যার মন অস্থির, আজ একরূপ কাল অন্যরূপ, সে নিজের উপর নির্ভর করবে কি করে? 'আত্মনির্ভর' অর্থ আত্মস্থ মহাপুরুষের উপর নির্ভর,—তাঁর উপর নির্ভর করে জীবনটাকে তাঁর পায়ে অর্ঘ্য দেওয়া। আত্মস্থ মহাপুরুষগণ কেউই মৃত নন। তাঁরা তথাকথিত জীবিত লোকদের চেয়ে অধিকতর জীবন্ত ও আমাদের অধিকতর নিকটবর্তী। আত্মচিন্তা ক'রে তাঁরা আত্ম-স্বরূপ হয়ে গেছেন। তাই তাঁদের কোন পরিবর্তন নেই—তাঁদের সর্বাবস্থায় একই ভাব। যাঁরা প্রতিদিন মত পরিবর্তন করেন, যাঁরা এখনো চলার পথে, যাঁরা পারদর্শী নন, তাঁদের উপর নির্ভর করা বা আত্মসমর্পণ করা চলে না। আত্মনির্ভর হও, তবে সব দুর্বলতা দূর হয়ে যাবে। আত্মাই সমস্ত শক্তির উৎস, কারণ সেখান থেকে আলো পেয়েই বুদ্ধি বুদ্ধির কাজ করে, মন মননের ক্ষমতা লাভ করে, আর শরীরও দাঁড়িয়ে আছে তাঁকেই অবলম্বন করে। যাঁরা আত্মচিন্তা ক'রে আত্মস্বরূপ হয়েছেন তাঁরাই জগতের গুরু; তাঁরাই বলতে পারেন, "মামেকং শরণং ব্রজ।" অথবা "Come unto me, all ye that are heavy laden, and I will give you rest." (হে ভারক্রান্ত মানব, আমার কাছে এস, আমি তোমাদের শান্তিদান করব।)

ছেলেবেলার শুভ সংস্কার আবার জাগাও। সব শক্তি সব বাসনাকে একমুখী কর। আবার সেই ব্যাকুলতা, সেই বৈরাগ্য, অদম্য ইচ্ছাশক্তি ও অফুরন্ত উৎসাহ-উদ্যম ফিরে পাবে। এখনও তুমি তোমাকে পার করতে পার; এখনও মনমাঝি তোমাকে সকল দুঃখের পারে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু এখনও যদি সতর্ক না হও তবে পরে বলতে হবে—

"কাছে যবে ছিল, পাশে হল না যাওয়া
চলে যবে গেল, তারি লাগিল হাওয়া
যবে ঘাটে ছিল নেয়ে, তারে দেখিনি চেয়ে
দূর হতে শুনি স্রোতে তরণী বাওয়া।"

অতীত অতীত হয়ে গেছে, ভবিষ্যৎ অন্ধকারে, বর্তমান শুধু জাগে। সেই বর্তমানকে খুব শক্ত করে ধর। নূতন ভাবে জীবনকে গঠন কর। ভুলে যাও পুরানো দিনের অতীত কাহিনী। নূতন করে গড়ে তোল জীবনটাকে।

"একটি একটি করে তোমার পুরানো তার খোল
সেতারখানি নূতন বেঁধে তোল।

* * *

দুয়ার তোমার খুলে রাখ নীরব আঁধার আকাশ পরে
সপ্তলোকের নীরবতা আসুক তোমার ঘরে।
এতদিন যে গেয়েছ গান আজ তার হোক অবসান,
এ যন্ত্র যে তোমার যন্ত্র সেই কথাটাই ভোল।
সেতারখানি নূতন বেঁধে তোল।"

তাঁর হাতের যন্ত্র হও—তিনি যেমন ইচ্ছা তেমনি বাজাবেন। ভাব নিয়েই সম্বন্ধ। একই ভাবের লোকের মিলন হবে নিশ্চয়। যেই ভাব বদলে যায়, অমনি পূর্বের বন্ধুরা দূরে চলে যায়। জীবনে কত লোকের সংগে মিশলে, কত লোকের সংগে বন্ধুত্ব হল—কোথায় সে সব? তাই বলি, একটা ভাবকে শক্ত করে ধর, তবে সেই ভাবের লোক এসে জুটবে। ভাব যত দৃঢ় ও স্থায়ী হবে বন্ধুত্বও তত ঘনিষ্ঠ ও স্থায়ী হবে।

সাধারণত যাকে ভালবাসা বলা হয়, সেটা ভালবাসা নয়— 'ভাল লাগা'। যতক্ষণ ভাল লাগে ততক্ষণ মেশামিশি ; তারপর মন বদলে গেলে আর সে ভাব থাকে না। ভালবাসা একবার হলে আর যায় না। ভালবাসার প্রতিক্রিয়া আনন্দ। একবার ভালবাসলে জীবনেও সে সম্বন্ধ নষ্ট হয় না। ভালবাসাই জগৎকে ধরে রেখেছে। বাসনা যার যত কম সে তত পবিত্র, সে তত নিঃস্বার্থ, সে তত ভালবাসতে পারে। ভালবাসার জন্য ভালবাসাই প্রকৃত ভালবাসা। যে ভালবাসার স্বাদ পেয়েছে সেই প্রকৃত ধনী। আর যে ভালবাসার স্বাদ পায়নি সে মহা-দরিদ্র। নিঃস্বার্থ ভালবাসা অর্থহীন, ভালবাসা মাত্রই নিঃস্বার্থ। যেখানে স্বার্থ সেখানে ভালবাসা নেই। ভালবাসার কথা মনে হলেই অনেক কথা মনে হয়। ভালবাসাতে দেওয়া আছে পাওয়া নেই। ভাললাগা ও ভালবাসার পার্থক্য ভুলেই মানুষের যত কষ্ট। ভালবাসায় সর্বত্যাগ হয়, নিজের সুখ সম্পদ সব তুচ্ছ হয়ে যায়। স্বার্থের ভিত্তি দেহ, আর ভালবাসার ভিত্তি আত্মা। তাই স্বার্থ মানুষকে নীচে নামায়, আর ভালবাসা মানুষকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে।

ভালবাসার টানেই মানুষ ছুটছে। কিন্তু "হৃদয়ের ধন দেহেতে কি যায় ধরা ?" হৃদয়ের ধনকে যে দেহে ধরা যায় না, সে কথা মানুষ ভুলে যায়। দেহ নিয়েই মানুষ থাকে, দেহকে লক্ষ্য করেই চলে ; তাই দেহের উপর আর কিছু যে আছে তা ভাবতেই পারে না। দেহের টানে যে মিলন হয়, তাতে জ্ঞান, আনন্দ ও শান্তি না দিয়ে দুঃখ, অজ্ঞান ও অশান্তিই বাড়িয়ে তোলে। ছেলেবেলা থেকে কঠোর তপস্যা করে শরীর, মন ও প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে যে ভালবাসার রাজ্য,

সেইখানে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত ক'রে ঋষিরা জীবন যাপন করতেন। তাই তাঁরা সর্বত্র দেখতে পেতেন আনন্দ ও সৌন্দর্য, আর মনের আনন্দে গাইতেন,—

"মধুবাতা ঋতায়তে, মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ
মাধ্বীর্ণঃ সন্তোষধীঃ।
মধুনক্তম্ উতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।
মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাং অস্তু সূর্যঃ॥"

তাঁরা জগৎকে দেখতেন মধুময়। তাঁদের জগতে কোন প্রকার ভয়, অশান্তি বা দুঃখ ছিল না। তখন বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, শৌর্যে, বীর্যে সর্ববিষয়ে তাঁরা বড় ছিলেন। আত্মায় বিশ্বাসী হয়ে, আত্মধ্যানে নিমগ্ন হয়ে তাঁরা আত্মস্বরূপ হয়ে গিয়েছিলেন। আমরা এখন দেহসর্বস্ব হয়ে সেই মধুবিদ্যা হারিয়ে ফেলেছি। তবে সেই অমৃতের বাণী শোনাবার জন্য দু'চার জন মহামানব এখনো জন্মগ্রহণ করেন।

"তাঁরি লাগি রাত্রি অন্ধকারে
চলেছে মানব যাত্রী যুগ হতে যুগান্তর পানে
ঝড় ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তর-প্রদীপখানি।"

তাই বলি, কিছুই ব্যর্থ হয়নি। জীবনের দিক দিয়ে ব্যর্থতা বলে কিছু নেই। ব্যর্থতাকে মার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দাও। তিনি সেই পূজাই গ্রহণ ক'রে সার্থক ক'রে দেবেন তোমার জীবনকে। যা কিছু ব্যর্থতা সব জগতের দিক থেকে। মনে হয়, অন্যে ধন জন, মান যশ, বিদ্যা বুদ্ধি কত কি অর্জন করল, আর আমার জীবনে কিছু হল না। কিন্তু জীবনের দিক থেকে স্ত্রী পুত্র, মান যশ, অর্থ

প্রতিপত্তি কিছুরই মূল্য নেই। যেখানে জীবনের অভিব্যক্তিই লক্ষ্য সেখানে ব্যর্থতার অর্ঘ্য মা সাদরে গ্রহণ করেন। সুতরাং কবির সংগে সুর মিলিয়ে বল,—

"দেবি, অনেক ভক্ত এসেছে তোমার চরণতলে
অনেক অর্ঘ্য আনি
আমি অভাগ্য এনেছি বহিয়া নয়নজলে
ব্যর্থ সাধনখানি।"

সংসারের দিকে যা ব্যর্থতা, জীবনের দিকে সেইটাই সার্থকতা। মা অতি আগ্রহে তোমার ব্যর্থসাধনখানি গ্রহণ করবেন। তুমি লিখেছিলে নূতন করে আবার জীবনের বাণী শোনাতে; তাই এই কলম ধরা। অন্যে তোমায় ভুলতে পারে, আমরা কেউ তোমায় ভুলি নি। অবসাদ ত্যাগ কর। নীরবে নিজের জীবন বিশ্লেষণ করে দেখ, এতদিন ধরে কোন খাতে জীবনের ধারা বয়ে চলেছে। জীবনের প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত একটা ধারাবাহিক ইতিহাস চিন্তা কর। তা সম্ভব না হলে জীবনটাকে বিভিন্ন কালে ভাগ করে এক একটা কালে যে সব ঘটনা ঘটেছে, সেগুলি স্মরণ করতে চেষ্টা কর। Try to find out the missing links of life. Try to find out the meaning of life. (জীবনের হারানো সূত্রগুলিকে খুঁজে বার করতে চেষ্টা কর। চেষ্টা কর জীবনের অর্থ উপলব্ধি করতে।) তবেই জীবনের গতি কোন দিকে টের পাবে এবং বুঝতে পারবে, না জেনে তাঁর দিকেই চলেছ। বুঝতে পারবে,—

"ঝরণা যেমন বাহিরে ধায় জানে না সে কাহারে চায়,
তেমনি করে ধেয়ে এলাম জীবন ধারা বেয়ে।"

১১

সারদাধাম ঃ ১৯৩২

স্নেহের—

তোমার পত্র পেলাম। তুমি আমার মত মান আর নাই মান, তবে এটা জেনে রেখো যে, ভাবই জগৎ,—ভাবের পরিবর্তনে জগতের পরিবর্তন। প্রত্যেকেই এক একটি জগতে বাস করে। নক্ষত্রের কক্ষের মত মানুষেরও একটা ভাবরাজ্য আছে। সে সেখানে ঘুরে বেড়ায়, আর সমভাবের লোক সেখানে এসে মেলামেশা করে। যারা যে ভাবের লোক তাদের সংগে সেই ভাবের লোকের দেখাশোনা মেলামেশা শীঘ্র শীঘ্র হয়। সময় ও দূরত্বের ব্যবধান তখন দূর হয়ে যায়। আর ভিন্ন ভাবের লোকের সংগে সহজে দেখা-সাক্ষাৎ হয় না —নানা বিঘ্ন উপস্থিত হয়। তখন নিকটও দূর হয়ে যায়। বাইরের যোগাযোগ কিছুই নয়, সেটা উপলক্ষ্য মাত্র। ভাবের যোগই প্রকৃত যোগ।

দেহ, মন ও আত্মা নিয়ে মানুষ। ভিন্ন ভিন্ন লোক ভিন্ন ভিন্ন স্তরের। তাদের রুচিও ভিন্ন ভাবও ভিন্ন। যে যার নিজের ভাবেই চলে। কেউই অপরকে তার নিজের ভাবে চালিত করতে পারে না। চালিত করতে চেষ্টা করলেও তা স্থায়ী হয় না। মানুষ ইচ্ছা করলেও যখন-যেমন-খুসী ভাব নিয়ে চলতে পারে না। জড়বাদীই হোক আর অধ্যাত্মবাদীই হোক, প্রত্যেক মানুষ অতি-ক্ষুদ্র বীজ অবস্থা থেকেই একে অন্য থেকে ভিন্ন। সে তখন থেকেই নিজের প্রকৃতি অনুসারে পরিবেশ রচনা ক'রে পূর্ণতার দিকে চলেছে।

এর মধ্যে কোন ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রশ্ন নেই, এ গতির বিরাম নেই। কেউ একে রোধ করতে পারে না।

জীবনটাকে নিয়ে আলোচনা করতে হলে অতীত ও ভবিষ্যতের অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে যেতে হয়। Life is a flash between two darknesses. (জীবন দুই অন্ধকারের মধ্যেকার একটা আলোর ঝলক)। যতক্ষণ অতীত ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন যোগসূত্র নির্ণয় করতে পারছি না, ততক্ষণ পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হলে ভুল করা হবে। একটা ঘটনার পূর্ব ও পর যদি না জানা থাকে, তবে মাঝের গোটা কতক কথা যেমন উদ্ধার করা যায় না তেমনই।

একটা কথা ভাবা উচিত যে, আমাদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। সুতরাং কোন বিষয়ে কোন কথা বলতে হলে নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করা উচিত, যে-বিষয়ে আমি বলতে যাচ্ছি সে বিষয়ে আমার জ্ঞান কতটুকু। "Judge not that ye be not judged." (নিজের বিচার যদি না চাও তবে অন্যের বিচার কোরো না)। এ কথাটা খুবই সত্য, আর সদা স্মরণ রাখা উচিত। যদি মনে কর যে, তোমার জানা শেষ হয়ে গেছে, মানবমনের আদি ও অন্ত সব দেখে জীবনের পথে অগ্রসর হয়েছ, তবে অবশ্য আমার বলবার কিছু নেই। আর তা যদি মনে না কর, তবে মনে রেখো যে, তোমার চিন্তার বাইরেও অনেক কিছু আছে। এই নিখিল বিশ্বে এমন অনেক কিছু আছে যা মানবকল্পনার বাইরে। যে যে-কাজই করুক না কেন, এতে কিছুই বাহাদুরি নেই; এতে মানুষের ইচ্ছার কোন স্থান নেই। যার যা প্রকৃতি তা মানুষ ইচ্ছা করে তৈরী করতে পারে না—

প্রকৃতি তার কাজ করিয়ে নেবেই। আমরা অন্য একটা শক্তি দ্বারা সর্বদাই চালিত হচ্ছি,—তা শারীরিক, মানসিক অথবা অধ্যাত্মিক যে স্তরেই থাকি না কেন। প্রকৃতির নিয়ম সার্বজনীন—কেউ লংঘন করতে পারে না। মানুষের ইচ্ছার কোন স্থান নেই, সুতরাং অনুযোগ করবার কারণ নেই। মানুষ মাত্রই একটা লক্ষ্য অভিমুখে ছুটে চলেছে—একটা দুর্নিবার স্রোতে পড়ে আছে ; এ থেকে উদ্ধার পাবার সাধ্য কারো নেই। অন্ধকারের পর আলো ও আলোর পর অন্ধকারের মত চক্রবৎ পরিবর্তিত হচ্ছে বিশ্বের সকল বস্তু। এই পরিবর্তনের ফলে স্বাধীন জাতি পরাধীন হচ্ছে, আবার পরাধীন জাতি স্বাধীন হচ্ছে ; ধনী নির্ধন হচ্ছে, নির্ধন ধনী হচ্ছে ; গৃহী সাধু হচ্ছে আবার সাধু গৃহী হচ্ছে—এই স্রোতের বিরাম নেই। এই একই নিয়মে রাজনীতিক্ষেত্রে রাজতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র, গণতন্ত্র প্রভৃতি এবং সমাজে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি পর পর আধিপত্য করে আসছে।

ত্যাগের কথা লিখেছ। Sacrifice ও renunciation এক নয়। Sacrifice হচ্ছে পার্থিব উদ্দেশ্য লাভের জন্য ত্যাগ। Sacrifice অর্থে যদি ত্যাগ শব্দের ব্যবহার কর, তবে ত্যাগ বোঝা হয়ে দাঁড়ায়—ত্যাগের বোঝা বহন করা কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু renunciation অর্থে যদি ত্যাগকে গ্রহণ কর, তবে 'ত্যাগের বোঝা' বহন করতে হয় না। ত্যাগের আনন্দই ত্যাগকে মহিমান্বিত করে।

তুমি যাকে সহজ জীবন বলছ তার কোন মানে নেই। বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যায় না। Only the struggling soul can understand the penalty he is paying for it. (যে

ব্যক্তি অবিরাম সংগ্রাম করে চলেছে সেই শুধু বুঝতে পারে, কি দণ্ড তাকে ভোগ করতে হচ্ছে।) জীবনে অবসাদ আসা অসম্ভব নয়। আর জান তো ধাতুনির্মিত যন্ত্রেরও অবসাদ আছে ; একটা নিষ্ক্রিয়তার অবস্থা আসে, তারপর আবার গতি আরম্ভ হয়। থামাটাই থামা নয়, থামার পরে আবার চলা আছে। কোনটা মানুষের প্রকৃতি, সেটা নির্বাচনের উপরই তার জীবনের আদর্শ নির্ভর করে। আর আদর্শলাভের সফল চেষ্টাই সফল জীবন। মানুষের সংগে মাটির যতটা সম্বন্ধ, তার সংগে আকাশের সম্বন্ধ তার চেয়ে কম নয়। দেহের দিক দিয়ে সে পশুর নিকট জ্ঞাতি বটে, কিন্তু অন্তরের দিক থেকে সে দিব্য আনন্দের উত্তরাধিকারী—ঈশ্বরের সন্তান। সুতরাং মানুষের মত মানুষ হয়ে চলার অর্থ টা আগে জেনে নেওয়া দরকার ; তারপর জীবন সম্বন্ধে কথা বলা চলে। তোমরা মনে কর, জীবনটা একই ভাবে প্রবাহিত হবে। কিন্তু ভুলো না, বৈচিত্র্যই জীবন। বৈচিত্র্যের অবসান হয় মৃত্যুতে, নইলে বৈচিত্র্য থাকবেই। যা কিছু সংগ্রাম, এই প্রাণময় জগতে ; এর উপরে কি নীচে সংগ্রাম নেই। আর এই প্রাণময় জগতেও প্রকৃতিভেদে সংগ্রামের ভেদ আছে। সকলেরই সংগ্রাম একরূপ নয়। 'প্রাচ্য ধর্ম ধর্ম করেই মরছে', এ কথা তো প্রতিদিনই শুনতে পাওয়া যায়। তাই পাশ্চাত্য মনীষীর বাণী উদ্ধৃত করছি—

"There are some men who are but the embodiment of desire, restless and acquisitive souls, who are absorbed in material quests and quarrels ; these are the men who dominate and manipulate industry.

There are others who are temples of feeling and courage, who care not so much what they fight for, as for victory for itself ; they are pugnacious rather than acquisitive ; their pride is in power rather than in possession, their joy is in the battlefield rather than in the mart ; these men make the armies and navies of the world.

There are a few whose delight is in meditation and understanding, who yearn not for goods, not for victory, but for knowledge ; who leave both market and battlefield to lose themselves in the quite clarity of secluded thought ; whose will is a light rather than a fire ; these are men who stand aside.

(এই পৃথিবীতে এমন কতকগুলি লোক আছে যারা বাসনার মূর্তিস্বরূপ, সদাচঞ্চল ও উপার্জনকামী, যারা ব্যাপৃত থাকে জাগতিক দ্রব্যের অনুসন্ধানে ও বিবাদ-বিসংবাদে। এদের দ্বারাই শিল্পজগৎ অধিকৃত ও পরিচালিত হচ্ছে।

আর একপ্রকার লোক আছে যারা আবেগ ও সাহসিকতার আধারস্বরূপ। এরা জয়ের জন্যই জয় চায়, কি পেল না পেল তা গ্রাহ্য করে না। এরা সমরপ্রিয়, সম্পদপ্রিয় নয়। পণ্যশালা অপেক্ষা যুদ্ধক্ষেত্রেই এদের আনন্দ অধিক। এই সকল লোকের দ্বারা সংগঠিত হয়েছে পৃথিবীর সৈন্যবাহিনী ও নৌবাহিনী।

অন্য একপ্রকার লোক আছে যাদের সংখ্যা খুবই কম। এদের

আনন্দ হচ্ছে ধ্যানে ও জ্ঞানে। এরা ঐশ্বর্য চায় না, বিজয় চায় না, চায় শুধু জ্ঞান। এরা পণ্যশালা ও রণাঙ্গন উভয়কেই পরিত্যাগ করে নিভৃত চিন্তার শান্ত গভীরতায় ডুবে থাকবার জন্য। এরা সেই জাতের লোক যারা সংসার থেকে দূরে সরে থাকে।)

প্রত্যেক লোকের ঐরূপ কোন না কোন প্রকার প্রকৃতি সুপ্ত থাকে এবং যে যার প্রকৃতি অনুযায়ী কর্ম বেছে নিয়ে জীবনযাত্রা সুরু করে; শত ব্যর্থতাতেও তার যাত্রা বন্ধ হয় না, কিংবা তার জীবনের গতির পরিবর্তন হয় না; ইচ্ছা করলেও সে এই গতির পরিবর্তন করতে পারে না। যখনই মানুষ নিজ প্রকৃতিকে অন্যের উপর চাপাতে ইচ্ছা করে তখনই হয় সর্বনাশ, তখনই হয় "মহতীবিনষ্টিঃ"।

জীবনের প্রতিটি স্তরই এক একটা ধাপ। মানুষকে চলতে হয় ধাপে ধাপে। এমার্সনের কথায় বলতে হয়, we have crossed many steps, but there are many more to be crossed. (আমরা অনেক ধাপ পেরিয়ে এসেছি এবং আরো অনেক ধাপ বাকি আছে পার হবার।) যেন মনে পড়ছে, ফরাসী বিপ্লবের অগ্রণীদের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলেছেন, "when a nation begins to think, it is impossible to stop its progress." (কোন জাতি যখন চিন্তা করতে সুরু করে, তখন তার প্রগতি বন্ধ করা অসম্ভব।) চিন্তাশূন্য কর্ম বেশীদিন ও বেশীদূর মানুষকে নিয়ে যেতে পারে না। চিন্তা যদি থাকে তবে জ্ঞাতসারেই হোক আর অজ্ঞাতসারেই হোক সে-দেশের অগ্রগমন অব্যাহত থাকে। দেশ জড় নয়, দেশের প্রাণ আছে, চিন্তা আছে, আদর্শ আছে। সে তোমার আমার কাজের অপেক্ষা করে না। সে চলে তার নিজের গতিতে,

আর সকলে তারই পথে চলতে বাধ্য হয়। যাক সে কথা। তুমি যদি দেশকে পুষ্ট করতে চাও, তবে লোকনয়নের অন্তরালে থেকে নীরবে কাজ করে যাও। ইতি— নগেন

১২

কলিকাতা

২৫. ১২. ৪১

কল্যাণীয়াসু,

তোমার পত্র পেলাম। আমার নিজের ইচ্ছায় কিছুই হবে না তা আমি জানি ; তাই তাঁর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে বসে আছি। তিনি যখন যেখানে যেমন ভাবে রাখেন তখন সেখানে তেমনি ভাবেই থাকতে বাধ্য ; সুতরাং নিজের চেষ্টার কোন প্রয়োজন বোধ করি না। স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছি। যেখানে ইচ্ছা টেনে নিয়ে যাক্, হাত পা নাড়বার কোন প্রবৃত্তি নেই! যদি দেহের কর্ম শেষ হয়, তাতেই বা দুঃখ কি? একদিন হিসাব নিকাশ শেষ করে বাড়ী ফিরতেই হবে, তা দু'দিন আগে আর পিছে। তরি এক ঘাটে পূর্ণ ক'রে আর এক ঘাটে শূন্য করবার জন্য ঘাটে ঘাটে ঘুরে বেড়ায়। এক ঘাটে পূর্ণ করে আবার অন্য ঘাটে শূন্য করে। আমার মনে হয়, আমার দেনা-পাওনা শোধ হয়েছে ; তাই এখন পুঁটুলি বেঁধে খেয়া ঘাটে বসে আছি পারের আশায়। আমার নিজের কোন চিন্তা নেই, কোন ভাবনা নেই। আশা থাকলেই নিরাশা আছে—আশা ভঙ্গেই দুঃখ। তাই এখন।

"পুড়িয়ে দিয়েছি আশার বাসা
চাইনে কারো ভালবাসা।"

যা সম্বল ছিল দিয়েছি। ক্ষুদ্র ভাণ্ড, তাই বেশী ছিল না। যতটুকু ছিল, শূন্য করে ঢেলে দিয়েছি। তারপর আর ভাববার নেই।

কলিকাতা এখন জনমানব শূন্য মনে হয়। অবশ্য এখনও ট্রাম বাস সবই চলে, এখনও চৌদ্দ পনের লক্ষ লোক আছে। তবুও মনে হয় শূন্য। শরীর মন ক্লান্ত হলে একটু বিশ্রামের জন্য কোথাও যে বসব সে স্থানও নেই। পথে পথে ঘুরে বেড়াই, রাত হলে ফিরি। সবাই নিজের নিয়ে ব্যস্ত, পরকে কে স্থান দেয় বল? কে পরের চিন্তা করে? আমরা শ্রীশ্রীঠাকুর ও মার ছবি সামনে রেখে চিন্তা করি নিজের কথা। শ্রীশ্রীঠাকুর যে পর, তাঁর কথা চিন্তা করবার সময় যে আমাদের নেই! আজ প্রাণে প্রাণে বুঝি—

"ফিরি আমি উদাস প্রাণে
তাকাই সবার মুখের পানে,
তোমার মত এমন টানে
কেউ তো টানে না।
আকাশে কার ব্যাকুলতা
বাতাস বহে কার বারতা
তোমার আমার গোপন কথা
কেউ তো জানে না।"

এই নীরব নির্জনতার মাঝে তাঁকেই বেশী করে মনে পড়ে যিনি পর; কিন্তু তাঁর মত আপন আর কেউ নেই। বাইরের বস্তু বা ব্যক্তির উপর যতটা নির্ভর করবে ততটা দুঃখ পাবে। আত্মার উপর নির্ভর করলে দুঃখেও শান্তি ও আনন্দ পাবে। ভালবাসা নিও। ইতি

—নগেন।

১৩

৬ নং রামমোহন রায় রোড
কলিকাতা
৬. ৮. ৪২

প্রিয়—

তোমার পত্র পেলাম। আমার শরীর একরূপ। ভোলানাথ ভাল আছে। ছেনুর টাইফয়েড হয়েছে আজ ৮ দিন। দিদি ও সেজদি ভাল আছেন। মনের দৃঢ়তা নেই কোন বিষয়েই, তাই কিছুই হয় না। যার মনের বল নেই তার কিছুই নেই। কোন একটা নিয়ম, কোন একটা আদর্শ নিয়ে না চলতে পারলে জীবনে শান্তি ও আনন্দ পাবার আশা বৃথা। ব'লে আর কি লাভ? সময় বসে নেই। সে চলছেই এবং চিরকাল চলবেও, কিন্তু ব্যক্তির পক্ষে একদিন যখন কালের গতি থেমে যাবে সে দিনটা তো আর এড়াবার উপায় নেই। কাজেই সেই জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে যে ব্যস্ত, তার কাছে জগতের বিশেষ কিছু মূল্য নেই। জগতের চাওয়া-পাওয়া আর হিসেব-নিকেশ শেষ করতেই হবে, নতুবা নিশ্চিন্ত মনে যাওয়া যাবে না। এখানে তো চিন্তার বোঝা মাথায় নিয়েই কাটল, আর যদি যাবার বেলায়ও সেই চিন্তার বোঝা নিয়েই যেতে হয়, তবে আর তার চেয়ে দুঃখের বিষয় কি আছে? তুমি দুঃখ করেছ। দুঃখ করে লাভ নেই। মনের স্ফূর্তিতে থাকতে চেষ্টা কর। যে ক'দিন আনন্দ করতে পার সেই ক'দিনই লাভ। ভালবাসা নিও। যতীন ও অন্যান্য সকলে ভাল আছে। ইতি—

তোমাদের নগেন।

১৪

সারদাধাম

২৬. ১. ৪৪

প্রিয়—

তোমার প্রেরিত টাকা পেয়েছি। তোমার কষ্ট করে টাকা পাঠনো ঠিক হবে না। এখানে এক ভাবে দিন কেটে যাচ্ছে। জানি না আর কতদিন এখানে থাকা হবে। দেশের অবস্থা খুব শোচনীয়। যারা ভিখারী ছিল তারা তো সব শেষ হয়ে গেছে। এবার গৃহস্থরা ভিখারী হয়েছে ; এরপর আমাদের পালা। মধ্যবিত্ত লোকদেরও লংগরখানায় খেতে হবে। এই যুগে চারিদিকে অশান্তি ও দুঃখ। কেবল বিশ্বাসীরাই বাঁচবে, অর্থাৎ সমস্ত দুঃখের মধ্যেও যারা ভগবান ছাড়া আর কিছুই চায় না, জানে না, কেবল তারাই এই দুঃখের মধ্যেও শান্তিতে থাকবে। যত দুঃখ পাবে ততই তারা মনটাকে অন্তর্মুখ করে নেবে। তারা মনে প্রাণে বেশ ধারণা করতে পারে যে, এ দুনিয়ায় কোথাও দাঁড়াবার স্থান নেই। এই ধ্বংসের মধ্যে তিনিই একমাত্র ভরসা। অর্থ, মান, যশ সবই মানুষ পায়, কিন্তু শান্তি তো পাওয়া যায় না। কেউ জীবনে আনন্দ চায় না, সবাই খোঁজে সুখ। আর এই সুখ পাবার জন্যে তারা যত দুঃখ পায়, তত-দুঃখ দুঃখও দিতে পারে না। আনন্দ পেতে হলে দুঃখকে বরণ করে নিতে হয় ; দুঃখের মধ্য দিয়েই আনন্দের পথে চলতে হয়। মা বাইরে রুদ্রমূর্তি, কিন্তু ভিতরে আনন্দের ফল্গুধারা, তাই তাঁর নাম আনন্দময়ী। দুঃখকে যে সাহসে আঁকড়ে ধরে, সেই মার কৃপা পায়। বাইরে দুঃখ, ভিতরে আনন্দ—এই হল সাধনার সংকেত।

দুঃখকে মা ডরামোই হল মা কালীকে পূজা। "পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার" এটা স্মরণ রাখাই সাধনজীবনের ভিত্তি। তবে সব সময় মনে রাখ্‌তে হবে, "একাকী চলিতে হবে মন, দীর্ঘ পথ নিশিদিন—সুখহীন, সংগিহীন, সুখ-আশাহীন।" আর কি লিখব। আমার ভালবাসা নিও। ইতি—

নগেন

১৫

সারদাধাম : ভুবনেশ্বর
৯. ৮. ৪৪

স্নেহের—

তোর পত্র পেলাম। পাশের সংবাদ পেয়ে মনে মনে তার জবাব দিয়েছি, তা নিশ্চয় পেয়েছিস। ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না, নীরবতায় তার চেয়ে অনেক বেশী প্রকাশ করা যায়। নীরবতার ভাষা যার জানা আছে, সে বাইরের ভাষার কোন প্রয়োজনই বোধ করে না। Soul speaks to soul in silence. (আত্মায় আত্মায় কথা হয় নীরবতার মধ্যদিয়েই)। যেখানে স্বার্থ, যেখানে প্রয়োজন, সেখানেই বাইরের প্রকাশ বেশী দরকার; নতুবা কথা বলার কি প্রয়োজন? অন্তরের ভাষা অন্তর জানে। আমরা অন্তর হারিয়ে ফেলেছি উঠ্‌তে, বসতে, খেতে, শুতে চাই কথা শুনতে বা বলতে। জীবন তো বসে থাকে না, সে ক্রমাগত চলে। চলতে চলতে একদিন তার এপারের চলা শেষ হয়ে যায়, রেখে যায় কেবল স্মৃতির একটি ক্ষীণ রেখা। সাধনা না থাকলে সে রেখা মুছে যায়। যদি তপস্যা থাকে

তবে স্মৃতি হয়ে ওঠে জীবন্ত। তখন আর পাওয়ার আশা বা হারাবার ভয় থাকে না। তখন মনে রাখার কথাও মনে জাগে না, ভুলে যাবার ভয়ও থাকেনা। যা আছে তাই আছে, তাই থাকে, আর কিছু থাকেনা। স্বার্থ না থাকলেই এরূপ হয়। স্বার্থ থাকলে সবই হয় অন্যরূপ। যতক্ষণ স্বার্থ থাকে, ততক্ষণ কেউ আপন হয় না। যদি আপনই না হল, তবে পরের জন্য এত বিড়ম্বনা সহ্য করা কেন? ভাল মন্দ, সুখ দুঃখ, ভালবাসা ঘৃণা সবই নিজের স্বার্থ দৃষ্টিতে। যে মুহূর্তে স্বার্থ চলে যায় সে মুহূর্তে আর ঐ সব কথা জাগেনা। ভালবাসা অন্যের কাছে পাওয়া যায় না, ভালবাসা দিতে হয় নিজে। ভালবাসা দিলে সেই ভালবাসা ফিরে এসে নিজেকে আনন্দ দেয় প্রতিধ্বনির মত। নিজে ধ্বনি করলে তবে প্রতিধ্বনি হয়।

Matric পাশ করে কলেজে পড়লেই কেউ পণ্ডিত হয় না। আমরা সব পাশ-করা মূর্খ। বাড়ীতে বসে যদি নিয়মিত পড়, তবেই সত্যিকার শিক্ষা হবে। নিজে যদি যত্ন করে ইংরাজী Dictionary (অভিধান) দেখে অর্থ বুঝবার চেষ্টা কর, তবে কিছুদিন কষ্ট করবার পরই সব বই বুঝতে পারবে। তখন দেখবে, I. A. পাশ করার চেয়ে অনেক বেশী জ্ঞান হয়েছে। জ্ঞান তো কেউ চায় না, চায় পাশ করা নাম! ইংরাজী উচ্চ সাহিত্য বুঝতে পারবে না। তাই সব বইয়ের নাম দিলাম না। সামান্য কয়েকখানা বইয়ের নাম দিলাম মাত্র।

জীবনে ভালমন্দ বুঝবার ক্ষমতা হয়েছে। দুনিয়ার চারিদিকে চেয়ে দেখে নিজের জীবনটা গড়ে নাও। তোমার সুখ শান্তি তোমারই মধ্যে। অন্যের উপর নির্ভর করলেই সুখ শান্তি পালাবে; আর

তুমিও ভেঙে পড়বে। জ্ঞানের স্পৃহা জাগাও, সব ঠিক হয়ে যাবে। অভাব এলে সব যোগাযোগ আপনিই হয়ে যায়। প্রকৃতি সব ঠিক করে দেন। যেখানে আন্তরিকতা নেই, প্রকৃত অভাব নেই, আছে শুধু মুখস্থ অভাববোধ, আছে দুনিয়ার অন্য জিনিষের উপর আসক্তি বা টান, সেখানে যোগাযোগ হয় না। নানা ওজর আপত্তি বুদ্ধি বিবেচনা মনে ওঠে।

এমন একটা জিনিষ ধর, যা চিরস্থায়ী, যা থেকে তোমাকে কেউ বঞ্চিত করতে পারবে না। মানুষ আজ আছে কাল নেই। তার উপর নির্ভর করা কেন? যে জীবন দিয়েছে সেই যে একদিন ডেকে সব কেড়ে নেবে, এ তো জানা কথা। আর তার ইঙ্গিত তো পেয়েছিই; তাই নিজেকে সদা প্রস্তুত রাখি, যেন একথা বলতে না হয়, দাঁড়াও একটু সবুর কর, সকলের সংগে কথা বলে আসি। নিজের আত্মার উপর নির্ভর কর, আত্মাকে ভালবাস, তা হলেই সব ভালবাসা পাবে। এখন বিদায়। ইতি—

নগেন

পুঃ—নিজের আনন্দ পর্যন্ত খুঁজো না। সুখ চাইলেই সুখ পালাবে। দিয়ে যাও ফিরে চেয়ো না। ভিক্ষুক কখনও সুখী হয় না। তোমার সুখ দুঃখ, ভাল মন্দ নিয়ে তুমি জন্মেছ। অন্য কেউ তোমাকে সুখ দুঃখ দিতে পারবে না। যদি এটা দৃঢ়ভাবে অনুভব করতে পার, তবে কোন দিনই আর দুঃখ বা অশান্তি ভোগ করতে হবে না। ইতি—

নগেন

১৬

সারদাধাম : ভুবনেশ্বর
১০. ৩. ৪৫

কল্যাণীয়াসু—

মা, তোমার পত্র পেলাম। ঘর বাড়ী নিয়ে এত বিব্রত যে সময় করে উঠাই কষ্ট। যাই হোক কোন প্রকারে সময় করে পত্র দিচ্ছি। জীবনে কেবল নিলেও চলে না, দিলেও চলেনা। আদান প্রদান রাখতে হয়। ভাবের আদান প্রদান নিয়ে অন্তর্জগতের সম্বন্ধ। সে আদান প্রদান বন্ধ হলে একদিন সম্বন্ধ ছিন্ন হবেই, ইচ্ছা কর আর নাই কর। আগুনকে প্রজ্বলিত রাখতে হলে কাঠ দিতে হয়। অন্তরের আগুনকে জ্বালিয়ে রাখার জন্য ভাব দরকার। সংসারের সম্বন্ধ চলে সংসারের আদান প্রদানে। সেটা বন্ধ হয়ে গেলে সব সম্বন্ধ ঘুচে যায়। আর, জগতের নিয়ম—জিনিষ মাত্রেরই মূল্য দিতে হয়, নতুবা সে জিনিষ থাকে না। পূজা করবার আরম্ভে সঙ্কল্প, আর শেষে দক্ষিণা। কোন প্রকারে ফুল ফেলে দিলে নিয়ম রক্ষা হয়, কিন্তু জীবন তৈরী হয়না। আধ্যাত্মিক জীবন কেবল কতকগুলি নিয়ম পালন নয়। নিয়মের গণ্ডিতে জীবনকে ধরে রাখা যায় না। ধার্মিক হওয়া বরং সহজ, আধ্যাত্মিকতা লাভ করা অত্যন্ত কঠিন। আধ্যাত্মিকতার স্বাদ পেলে জীবনের ক্ষোভ থাকে না। জীবন আনন্দে পূর্ণ হয়, পার্থিব কোন বস্তুর প্রতি আসক্তি থাকে না। কোন প্রকারে নিয়ম রক্ষা করতে গিয়ে শেষে জীবনের রস শুকিয়ে যায়; আর কিছু ভাল লাগে না। নিজের মধ্যে যে আনন্দকে জাগিয়ে তুলতে পারে, সেই কেবল সব জিনিসে আনন্দ পায়—অন্যকেও আনন্দ দিতে পারে। দিনের

পর দিন চলে যায়, কিন্তু জীবন তেমনই থাকে। কে চায় বল ভগবানকে? সবাই পৃথিবীর বস্তু নিয়ে মত্ত, উপরের দিকে দৃষ্টি যাবে কি করে? আমি তো মায়ের দুয়ারে ভিখারী। মার প্রসাদ যা সামান্য কিছু পাই, তার ভাগ সকলকেই দিয়ে থাকি। এখন বিদায়। ইতি—

তোমার ছেলে

১৭

সারদাধাম : ভুবনেশ্বর
২১. ৪. ৪৫

প্রিয়—

তুমি আমার নববর্ষের ভালবাসা ও শুভেচ্ছা জেনো।—কে পেয়ে খুব আনন্দ করলে। মানুষের যা প্রকৃত প্রয়োজন তা সে পায়; আর যা সে অন্তর দিয়ে চায় তাও পায়, যদিও সকল চাওয়াই যে সফল হয় তা নয়। সাধনার দ্বারা আনন্দকে জাগিয়ে তুলতে হয়। যে তা পারে না তাকে অন্যের নিকট হতে আনন্দ নিয়ে নিজের আনন্দকে জাগ্রত করতে হয়। —এর সংগে যে আনন্দ করলে সেটাকে সাধনা ও তপস্যার দ্বারা স্থায়ী করতে চেষ্টা কর। একটা ভাব স্থায়ী করার চেষ্টাই সাধনা; আর কোন একটা আদর্শকে পাওয়ার জন্য যে ত্যাগ তাই তপস্যা। মাঝে মাঝে আনন্দ সকলের জীবনেই আসে—সে বিদ্যুৎ-চমকের মত। সাধনা করে আনন্দকে স্থায়ী না করলে, আনন্দ থাকে না। একটানা আনন্দ সকলের ভাগ্যে

হয় না। বাইরের আনন্দ দীর্ঘদিন স্থায়ী হলে আর তাতে আনন্দ থাকে না। বাস্তবতায় আনন্দ নেই, আনন্দ ভাবে—কল্পনায়। সাহিত্য, আর্ট, মিউজিক সকলেরই কাজ এই জগতের বাস্তবতা নষ্ট করে চিন্তার উন্মেষ করা—ভাবজগতে মনকে নিয়ে যাওয়া। জীবনের প্রত্যেক কাজে ও কথায় যাতে ভাব জাগ্রত হয়, তাই করলে তবে আনন্দ পাওয়া যায়।

মনটাকে এমনিভাবে তৈরী কর, যাতে সদা ভাবরাজ্যে বিচরণ করতে অভ্যস্ত হয়। তখন বুঝতে পারবে যে, "The visible world is no longer a reality, and the unseen world no longer a dream" (দৃশ্য জগৎও বাস্তব নয় আর অদৃশ্য জগৎও স্বপ্ন নয়)। Bergson (বার্গসঁ)-এর একটা কথা স্মরণ হচ্ছে—"The more we are entangled in the living, the less truly are we all to see. From time to time by happy chance men are born who are not bound by the tread-mill of the practical life. In one side of their nature or of their consciousness they are born free, and according to circumstances become painters and sculptors, musicians, poets or prophets." (যতই আমরা বাস্তব জগতের সংগে জড়িয়ে পড়ব, ততই আমাদের সত্যদৃষ্টি ক্ষীণ হবে। সময়ে সময়ে সৌভাগ্যবশতঃ এমন মানুষ জন্মগ্রহণ করেন যাঁরা বাস্তব জীবনের ঘানিতে আবদ্ধ হন না। তাঁদের প্রকৃতির অথবা চেতনার এক অংশে তাঁরা মুক্ত হয়েই জন্মগ্রহণ করেন এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থানুসারে তাঁরাই চিত্রকর, ভাস্কর, গায়ক, কবি

অথবা মহাপুরুষ হয়ে থাকেন।) এঁরাই জীবনের আনন্দপ্রবাহ জাগ্রত করে, বর্ত্তমানকে ভেঙে, স্থান-কালের সীমানা ভুলিয়ে আনন্দ-রাজ্যে মনটাকে টেনে নিয়ে যান। এমন একজন লোক ভাগ্যক্রমে পেয়েছ যাঁর স্পর্শ, যাঁর স্নেহ জীবনের মস্ত সম্পদ। ধ্যান-ধারণা, পাঠ-আলোচনা, সাধনা ও তপস্যা দ্বারা সেই আনন্দকে ধরে রাখ। আলো-আঁধারের মধ্য দিয়েই জীবন-প্রবাহ ছুটেছে। প্রত্যেকটাই জীবনকে ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করে। যদি আদর্শ ঠিক থাকে, যদি লক্ষ্যকে আঁকড়ে ধরে থাকতে পারে, তবে জীবনের সুখদুঃখ ভাল-মন্দ সবই লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যায়। লক্ষ্যহীন জীবনে আশা-নিরাশা, ভালমন্দ, আনন্দ-নিরানন্দ কোনটাই স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। জীবনে আঁধার ঘনিয়ে আসে, কিন্তু তাতেই জীবন নষ্ট হয় না। আঁধার আসে আলো-কে প্রকাশ করবার জন্যই। অন্ধকারের গর্ভেই প্রভাতের জন্ম, কাজেই অন্ধকার দোষের নয়। আঁধার যত বেশি হবে, আলো ততই উজ্জ্বল ও প্রখর হবে। "It is often darkest just before light." (আলোর অব্যবহিত পূর্বেই অনেক সময় গভীরতম অন্ধকার দৃষ্ট হয়।) জন্মিবার পূর্বে শিশু অন্ধকার মাতৃগর্ভেই থাকে। শীতের আঁধারের পরেই বসন্তের জন্ম। "Bees will not work except in darkness, morality will not work but in secrecy, thought will not work except in silence." (অন্ধকার ব্যতীত মৌমাছি কর্ম করে না, গোপনতা ব্যতিরেকে নীতিধর্ম কার্যকরী হয় না, নীরবতা ভিন্ন চিন্তা প্রভাব বিস্তার করে না।) সৃষ্টির জন্য চাই অন্ধকার, দুর্যোগ, বেদনা। গভীর কিছু পেতে হলে অন্ধকার, দুর্যোগ, বেদনা, অপমান এবং দুঃখ-কষ্টের

মধ্য দিয়েই পেতে হয়। মৃত্যুর দ্বার দিয়ে অমৃতের রাজ্যে যেতে হয়। দুঃখ থাকা ভাল, কিন্তু দুঃখকে বড় করে দেখা ও হতাশ হওয়া জীবনের চিহ্ন নয়। নিজের জীবনকে গড়ে তুলতে হলে চাই বীরত্ব, দুঃখ, অপমান ; এমন কি ভালবাসাকেও অগ্রাহ্য করতে হয়। যাঁরা শক্তিমান তাঁরা শুধু পুরাতনকে নিয়েই মেতে থাকেন না, নতুন করে গড়েন ; মন মত গড়ে নিয়ে নিজের উদ্দেশ্য সার্থক করেন। সংসারে ভালবাসার কোন মূল্য নেই। স্বার্থকে কেন্দ্র করেই সংসারের ভালবাসা। সংসারের কেন্দ্র স্ত্রী, পুত্র, টাকা, মান, যশ প্রভৃতি। একদিন মনে মনে টের পাবে যে, সংসারের খুঁটিনাটি নিয়ে থাকলে নিজেরই মন নষ্ট হয়। তখন বুঝবে, what was loved in life has little worth beyond (জীবনে যা কিছু ভালবেসেছিলে ওপারে তার কোনই মূল্য নেই।) তারই জীবন শান্তি ও আনন্দে যায়, যার হারাবার কিছু নেই। সব সময় মনে রেখো যে, "It is better to suffer evil than to do it." (অনিষ্ট করা অপেক্ষা অনিষ্টহেতু দুঃখ ভোগ করা শ্রেয়ঃ।) নিজের দোষ বা পরের দোষ দেখে লাভ নেই ; নজর রাখ লক্ষ্যের দিকে, ইষ্টের দিকে। "It is by forgiving the shortcomings of others and forgetting your own shortcomings, that you can be a channel through which godliness flows." "We cannot be all Buddhas, but we can be friends." (অপরের দোষত্রুটি ক্ষমা করে এবং নিজের দোষত্রুটি বিস্মৃত হয়েই তুমি দিব্য ভাবপ্রবাহের প্রণালীস্বরূপ হতে পার। আমরা সকলেই বুদ্ধ হতে পারি না বটে, কিন্তু পরস্পর বন্ধু হতে পারি।) শেষ কথা—"God governs the world and

we are only to do our duty wisely and leave the issue to Him." (ঈশ্বরই জগতের বিধাতা, আমাদের শুধু বিচার-বুদ্ধি নিয়ে কর্তব্য করে যেতে হবে, আর ফলাফল ছেড়ে দিতে হবে তাঁরই হাতে।) ভালবাসা নিও। ইতি—

তোমার শুভাকাংক্ষী

নগেন

১৮

সারদাধাম ঃ ভুবনেশ্বর

২০. ২. ৪৫

স্নেহের—

মা, তোমার পত্র ও M.O. অদ্য পেলাম। আমাদের স্বভাব চলা-পথ অনুসরণ করা। নূতন করবার ইচ্ছাই জাগে না। নিয়ম পালন করে আমাদের এমনি দুর্দশা হয়েছে! স্বাধীন চিন্তা না জাগলে কি স্বাধীনতার ইচ্ছা জাগে? সংসারে আমরা শরীরে, মনে, প্রাণে, অন্তরে, সর্ব দিক্ দিয়ে পরাধীন। পশু পরাধীন। তার নিজের কোন বিচার-বুদ্ধি নেই; সে চলে প্রকৃতির বশে প্রবৃত্তি নিয়ে। আমরাও সেইরূপ হয়ে গেছি। বিচার নেই, স্বাধীন চিন্তা নেই, কেবল লোক-ভয়, সমাজ-ভয়, প্রভুর ভয়। ভয় নিয়েই জীবন কাটাই। তাই মনে হতাশার ভাব মাঝে মাঝে জাগে। আমাদের ধর্ম-কর্ম, আচার-ব্যবহার, আহার-বিহার সবই যন্ত্রবৎ চলে। গতানুগতিক জীবন আমাদের বড়ই ভাল লাগে। জগতের সব জিনিষের পরিবর্তন

আছে, কেবল পরিবর্তন নেই আমাদের কর্মের, আমাদের সমাজের ও আমাদের মনের। প্রেমিকের হৃদয় আমাদের নেই; তাই ধর্মে আমাদের নিয়ম-পালন, আর কর্মে আমাদের (খুব ভাল লোক হলে) করুণা বা দয়া, অথবা নিজের স্বার্থসিদ্ধি। প্রেমিকের হৃদয় আমরা হারিয়ে ফেলেছি। প্রেমের প্রধান কথা পূর্ণ স্বাধীনতা, পূর্ণ নিষ্কামতা ও পূর্ণ নির্ভীকতা। আমাদের এ তিনটির একটিও নেই। হৃদয় নেই, তাই হৃদয়ের সাড়া বুঝতে পারি না। মানুষ যে নীরবে অন্তরের কথা ব্যক্ত করতে পারে, সে ধারণাও নেই। Soul speaks to soul in silence (আত্মায় আত্মায় কথা হয় নীরবতার মধ্য দিয়েই)। হৃদয়ের ভাষা হৃদয় জানে। তপস্যার দ্বারা শুদ্ধ না হলে প্রেম লাভ করা যায় না। যে প্রেমিক তার নিজের ইচ্ছা, সুখ, স্বার্থ বা সাধ থাকে না। যে প্রেমিক সে ভালবাসাও চায় না। শ্রদ্ধা না থাকলে প্রেম দাঁড়াতে পারে না। আধুনিক যুগ লালসাকে প্রেমের আসন দিয়েছে। লালসা মানুষকে দগ্ধ করতে পারে, কিন্তু শান্তি দিতে পারে না। "Love, thou Goddess! broken heart is thy altar"—Byron. (ওগো দেবী ভালবাসা! ভাঙাবুকে তুমি অধিষ্ঠিতা।)

"By devotion mind rises above,
But Heaven descends in love."

(ভক্তিতে মন ঊর্ধ্বে ওঠে,
আর প্রেমে নেমে আসেন ভগবান।)

প্রেমে অনন্তও সান্ত হয়, অসীমও সীমার মাঝে ধরা দেয়। প্রেম পাওয়া কি এতই সহজ? সে কি তোমার কা[illegible]

আছে? আমাদের ভালবাসা লোক-দেখানো। আমরা লোকের কাছেই প্রেমিক সাজি। একটা কথা মনে রেখো ঃ—

"Laugh, and the world laughs with you.
Weep, and you are to weep alone."

(Ella. W. Wilcok)

(হাস যদি, এ নিখিল হাসিবে তোমার সাথে,
একাকী কাঁদিতে হবে কাঁদিবার বেলা।)

মা, তোর যে পড়ার ব্যবস্থা হয়েছে, তাতে আমাদের মনে খুবই আনন্দ হয়েছে। "Intellectual effort is morally elevating." (বুদ্ধির অনুশীলন দ্বারা নৈতিক শক্তি উৎকর্ষ লাভ করে।) পড়াশুনা যদি থাকে, তবে জীবনটা উচুস্বরে বাঁধা হয়ে যায়। সুর উচুতে না ধরে রাখলে জীবন হয়ে যায় পশুর মত। পশু ভালবাসতে জানে না। ভালবাসা অন্তরের বস্তু। সেটাকে বাইরে খুঁজে পাবে না। ভালবাসার চিন্তাই ভালবাসা। সংসারে কোথাও ভালবাসা নেই; সেখানে আছে স্বার্থ। সমাজেও স্বার্থই প্রবল হয়েছে; তাই সমাজের ক্ষমতা নেই অপরকে নিজের অংগে মিলিয়ে নেবার। দেশ যখন স্বাধীন ছিল, সমাজ তখন ছিল জীবন্ত। জীবন্ত সমাজের সবই ছিল বীরত্বপূর্ণ। একমাত্র বীরই ভালবাসতে পারে। দুর্বল যে সে কি ভালবাসা বুঝতে পারে? কি পুরুষ কি নারী সকলের মধ্যেই একটা আদর্শ থাকা দরকার। সেই আদর্শকে লাভ করাই জীবনের উদ্দেশ্য। একটা আদর্শ থাকলে তবে হয় মনের জোর। মনে শক্তি না থাকলে, তেজ না থাকলে কি ভালবাসার মর্ম ধারণা করতে পারা যায়? বীরত্ব চাই। তোমরা তেজস্বী

হও। আমি কাউকে অবিশ্বাস করতে পারি না; তাই আমার চক্ষে কেউ হীন নয়। হিন্দু হলেই মহৎ হয় না, আর ক্রিশ্চিয়ান বা অন্য ধর্মাবলম্বী হলেই হীন হয় না।

একটা উপলক্ষ্য চাই জীবনটাকে গড়ে তোলবার জন্য। আমরা জানি না, কোথায় গেলে কে কখন প্রেরণা পাবে। তোমার যেটা প্রয়োজন ছিল সেটা পেয়ে গেলে। আর কোন কথা বলবার প্রয়োজন নেই। যেটা পেলে তার জন্য কৃতজ্ঞ হও, যা পাওনি তার জন্য দুঃখ যেন মনে না আসে। তুমি তো চাকুরী করবে না, সুতরাং ফল ভাল করবার দিকে নজর দেবার প্রয়োজন কি? তোমার প্রয়োজন জীবনটাকে গড়ে তোলা। জ্ঞান অর্জন কর। পরে যাতে পড়াশুনা করে জীবন কাটাতে পার সেজন্য নিজেকে প্রস্তুত কর। কলেজের পড়া শেষ হলে তবে আসল পড়া আরম্ভ হয়। দুঃখকে দোষ দিও না। দুঃখের ছবি বড়ই মধুর।

"সুখের কথা বলো না,
সুখ কেবল ফাঁকি।
দুঃখে আছি, আছি ভাল—
দুঃখে ভাল থাকি।"

"দুঃখ মহৎ—সুখ নীচ। দুঃখ জমায়—সুখ শুধু খরচ করে।" যারা মহৎ, তারাই দুঃখী, তারাই নিপীড়িত।

মা, তোমার যদি দুঃখ না থাকত, তবে কি তোমাকে আমি অন্তরের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করতে পারতাম? তুমি মহৎ, তাই তোমার ভাবনায় মনটা ডুবে থাকে। আর একটা কথা মনে হয়—"দুঃখ দিয়ে রাখেন তোমার মান; তোমার লাগি জাগেন ভগবান॥"

"To many prison is their mosque."

—Jalauddin Rumi

(জগতে এমন অনেক লোক আছে যাদের কাছে কারাগার দেবালয়স্বরূপ।)

দুঃখের আঘাত না পেলে কি জীবনের মাধুর্য বুঝতে পারা যায়? আমি তো মনে করি যে, দুঃখই তোমাকে মহত্ত্ব দান করেছে। বীরের মত দুঃখকে বরণ করে নাও।

"সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়,
মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে।
কাল-নৃত্য করে উপভোগ
মাতৃরূপা তারি কাছে আসে।"—বিবেকানন্দ

কলেজের lectureএর (বক্তৃতার) উপর কৃতকার্যতা নির্ভর করে না। শিক্ষার্থীরা lectureএর উপর বেশী জোর দেয় না। অতএব তোমার কোন দুঃখ নেই। হাঁ, রাধাকিষণই হিন্দু ইউনিভার্সিটির একমাত্র আকর্ষণ। তাঁর বলবার ভঙ্গি খুবই ভাল আর ভাষাও কবিত্বপূর্ণ। আমি তাঁর বক্তৃতা শুনেছি। তোমার পড়ার ব্যবস্থা হওয়ায় সকলেরই খুব আনন্দ হয়েছে। পড়াশুনার সুযোগ পেয়েছ শুনে আমি আনন্দিত হয়েছি সত্য, কিন্তু তার চেয়েও বেশী আনন্দিত হয়েছি এই জেনে যে, তুমি সংসার থেকে দূরে বাস করতে পারছ, বাড়ি থেকে বাইরে এসেছ ও নিজের চোখে দুনিয়াকে দেখতে পারছ। তোমাকে যে সংগীরা ভালবাসে তাতে আশ্চর্যের কিছুই নেই। তোমাকে যদি ভাল না বাসত, তবে বলতাম তাদের হৃদয় নেই। সংগীদের সংগে ব্যবধান রেখো না—ছাত্রেরা

সকলেই এক বয়সী। আমাদের সকলের ভালবাসা ও আশিস্ গ্রহণ কর। ইতি—

তোমার কাকাবাবু

১৭

সারদাধাম ঃ ভুবনেশ্বর
১০. ৪. ৪৬

স্নেহের—

তোমার পত্র পেয়েছি। তুমি নব বর্ষের শুভ ইচ্ছা ও ভালবাসা নিও। তোমার পত্র পেয়ে সময় মত উত্তর দিতে পারিনি। হাঁ, এক বৎসর পূর্বে তুমি এখানে ছিলে, আজ দূরে চলে গিয়েছ। দূরও নিকটে আসে, আবার নিকটও দূরে চলে যায়। শরীর নিয়ে দূরত্ব নয়, ভাব নিয়ে দূরত্ব। ভাবের পরিবর্তনে জগতের পরিবর্তন হয়। আমরা প্রত্যেকেই এক একটি জগতে বাস করি। In spirit we are one, but we are seperate as bodies. আত্মার দিক থেকে আমরা সকলেই এক, কিন্তু শরীরের দিক থেকে পৃথক। তুমি একভাবে চল, আর আমি অন্যভাবে চলি। এই নিয়েই পার্থক্য।

মনই মানুষ। মন নিয়েই মিল ও অমিল। চিন্তাতেই মানুষ স্বর্গ-নরক সৃষ্টি করে—সুখ-দুঃখ ভোগ করে। মানুষ এমন চিন্তা করতে পারে যাতে চির আনন্দে, চির শান্তিতে থাকতে পারে। আমরা প্রত্যেকেই স্রষ্টা—যে যার মত সৃষ্টি ক'রে তার মধ্যে অনুপ্রবেশ করি। আমরা আমাদের সৃষ্টির মধ্যে নিজেকে হারিয়ে

ফেলি। তারপর মনে করি আমি বদ্ধ, আমার নিজের কোন স্বাধীনতা নেই। As we dream, so we live. What one dreams is one's life. To most of us life is a disturbed dream, life is a parting shadow, and youth is a departing guest, but we forget this. (আমাদের স্বপ্নই আমাদের জীবন। মানুষ যেমন ভাবে তেমনি হয়ে যায়। আমাদের অধিকাংশের কাছেই জীবন একটা এলোমেলো স্বপ্ন, একটা চলমান ছায়া; আর যৌবন হচ্ছে বিদায়ী অতিথি; কিন্তু আমরা তা ভুলে যাই।) আমরা অনেকেই জীবনটা নষ্ট করে ফেলি, কোন আদর্শ নিয়ে চলি না বলে। Life without an ideal is like riding a horse without reins. (আদর্শহীন জীবন বল্গাবিহীন ঘোড়ায় চড়ার মত।) যদি ভাব ঠিক থাকে তবে স্থান ও কালের দূরত্ব থাকে না। আর ভাবটা বদলে গেলে নিকটও অতি দূর হয়ে যায়।

নব-বর্ষের কথা আর কি বলব? অতীত—অতীত হয়ে যাক্‌, বর্তমানকে শক্ত করে ধর ও ভবিষ্যৎকে গড়ে তোল। ভাবের তীব্রতা না থাকলে মানুষ কোন মহৎ কাজ করতে পারে না। তুমি বলেছিলে সব হুজুক। সত্যই হুজুক। একটা চিন্তা নিয়ে ডুবে যেতে পারে এমন লোক জগতে বিরল। ধীর স্থির ভাবে চলতে পারে সেই, যে সমস্ত পথটা জানে। যখন কোন একটা আন্দোলন আসে তখন চিন্তাশীল লোক সেটাকে চিন্তা দিয়ে ধরে রাখতে চেষ্টা করে; কর্মী তাকে কর্মের দ্বারা স্থায়ী করতে প্রয়াস পায়; ভাবুক ভাবের উচ্ছ্বাসে কবিতা লিখে বা গান গেয়ে ভাবের আবহাওয়া সৃষ্টি ক'রে লোকদিগকে সেই ভাবে অনুপ্রাণিত

করে। আর যাদের চিন্তা নেই, কর্ম নেই, ভাব নেই তারা হুজুক ক'রে দেশটাকে গরম রাখে; তবে তাতেও অনেক ফল আছে। দেশটা যতটা গরম হয়েছিল Cabinet Mission এসে ততটা ঠাণ্ডা করে দিয়ে গেল, অবশ্য তাদের আসবার উদ্দেশ্যও তাই। Stafford Cripps, Wavel প্রভৃতি যা করলেন, তারপর Cabinet Misson এসে বেশি কিছুই করে নি। Cabinet Mission * এসে পার্থক্য ও ভেদকে আরও বাড়িয়ে দিল। নির্বাচন ব্যাপারে যে রক্তারক্তি হল, এ সবই প্রভুদের দয়া। ইচ্ছা ক'রে মতলব ঠিক ক'রেই সব করা হয়েছে। দেশের ভাবনা দেশবাসীকেই ভাবতে হবে। তোমার আমার চিন্তাই দেশকে এগিয়ে দেবে। আর কিছু না পার চিন্তা ও প্রার্থনা করতে পার। সমবেত চিন্তা হতেই এমন এক মহাশক্তির উদ্ভব হয় যা সমস্ত দেশকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। নেতাজী তোমার আমার চিন্তারই ফল। তিনিই আবার দেশের নরনারীকে নিজের চিন্তার দ্বারা চালিত করছেন। Whether he is living or dead his spirit is working and will work. তিনি বেঁচে থাকুন অথবা মরে গিয়েই থাকুন, তাঁর ভাবের কাজ চলছে এবং চলতেই থাকবে। একটা কথা স্মরণ করিয়ে পত্র শেষ করছি।

(*a*) Knowledge is a lamp from which men light their candles. (জ্ঞান হচ্ছে দীপস্বরূপ যা থেকে মানুষ নিজ নিজ আলো জ্বালিয়ে নেয়)

---

* ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষ ভাগে ভারতের সাথে স্বাধীনতা সম্পর্কে বোঝাপড়া করবার জন্য ইংলণ্ড থেকে পরপর Cripps mission ও Cabinet mission ভারতে আসে।

(*b*) That day in which I have learned nothing and in which I have added nothing to my knowledge is no part of my life. (যে দিনটাতে আমি কিছু শিখি নাই বা আমার জ্ঞানভাণ্ডারে কিছু সঞ্চয় করি নাই, সে দিনটা আমার জীবন থেকে বাদ পড়ে গেছে।)

আজ বিদায় নিচ্ছি। অমিয় তোমার ঠিকানা চেয়েছিল। তার সংগে একবার দেখা কোরো। ইতি—

নগেন

২০

সারদাধাম ঃ ভুবনেশ্বর

১৪. ১০. ৪৬

স্নেহের—

তুমি আমার ৺বিজয়ার প্রীতি-সম্ভাষণ ও ভালবাসা লও। আমার শরীর বর্ষার সময় প্রায়ই ভাল থাকে না। এবার দীর্ঘদিন শয্যাশায়ী ছিলাম। সে সময় নড়বারও ক্ষমতা ছিল না। সেই থেকে শরীরটা একটু অচল হয়ে পড়েছে, আর বসে থাকার জন্যও অনেকটা অচল হয়েছে।

এবার বের হব, এমন সময় সংবাদ পেলাম, কলিকাতায় ভীষণ কাণ্ড চলছে। কলিকাতার সংবাদে মর্মাহত হয়েছি। মানুষ যে এতটা হীন হতে পারে তা ভেবে উঠতে পারি নি। কলিকালে পাপ প্রবল হয় শুনেছিলাম ; এবার দেখলাম পাপেরই রাজত্ব। যে যত নারকী, তার ক্ষমতা তত বেশী, আর তারই উপর মানুষের সব

দায়িত্ব। জানি "Power of suffering is greater than the power of doing." (কর্মশক্তির চেয়ে দুঃখ-সহন-শক্তি বড়।) তবু প্রাণটা কেঁদে ওঠে এই ভেবে যে, ভগবান মানুষকে আর কত পরীক্ষা করবেন, আর কত সে সহ্য করবে। যে পরবশ তার দুঃখের শেষ নেই; আর পরবশতার চেয়ে বড় পাপও নেই। কবি বলেছেন—

"মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে।"

কিন্তু এ জগৎ সাক্ষাৎ নরক কুণ্ড, এখানে কি থাকতে আছে? সত্য, সরলতা, বিশ্বাস ও প্রেমের স্থান এখানে নেই। যে শঠ, যে সত্যহীন, যে কপট, যে নিষ্ঠুর তারই প্রাধান্য এ জগতে। জগতের উপর আধিপত্যই সকলের কাম্য। কিন্তু এ জগৎটার কি মূল্য, যদি অন্তরে শান্তি, আনন্দ না থাকে, যদি অন্তরের ভালবাসার মর্যাদা না থাকে? Mahomed said, "The world is a carrion and those who seek it are dogs." Jesus said, "The world revealed in the form of an ugly old hag." He asked her how many husbands she had possessed. She replied that they were countless. He asked whether they had died or been divorced. She said that she had killed them all. "I marvel," he said, "at the fools who see what you have done to others and still desire you."

(মহম্মদ বলেছেন, "এ সংসার একটা গলিত শবদেহ; আর যারা এর পেছনে ছোটে তারা কুকুর।" যীশুখৃষ্ট বলেছেন, "এই

সংসারটা একটা কুরূপা, বৃদ্ধা ডাইনীরূপে উপস্থিত হয়েছিল। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার স্বামীর সংখ্যা কত ?" ডাইনী উত্তর দিল, "হাজার হাজার।" যীশু বললেন, "তারা মরে গেছে না তাদের তালাক দেওয়া হয়েছে ?" ডাইনী বলল, "আমি তাদের সবাইকে মেরে ফেলেছি।" যীশু বললেন, "আমি সেই বেকুবদের দেখে অবাক হই, যারা অন্যের প্রতি তোমার এইরূপ আচরণের খবর রেখেও তোমাকেই চায়।"

এই জগতের জন্য মানুষ পাগল। যীশুখৃষ্ট বলেছেন—"The lover of the world is like a man drinking sea water, the more he drinks, the more thirsty he gets, till at last he perishes with thirst unquenched." (এই সংসারকে যে ভালবাসে সে সমুদ্র-জলপায়ী মানুষের মত। যতই পান করে ততই বেড়ে যায় তার তৃষ্ণা। অবশেষে সে তৃষ্ণা নিয়েই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।)

এই জগৎ ছাড়া যে আরও কিছু আছে, এ বোধ না হওয়া পর্যন্ত শান্তি অসম্ভব। মানুষ মনে করে, এই দেহ ও এই জগৎই সব; এর পারে আর কিছু নেই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে "The world is a curse and all which is in it is a curse, except the remembrance of God, and that which aids it." (এই সংসার একটা অভিসম্পাত। ভগবানের স্মরণ মনন, আর যা কিছু এর সহায়ক, তাছাড়া এ সংসারের সমস্তই অভিসম্পাত স্বরূপ।)

মহম্মদ বলেছেন, "The world is a paradise to the

infidels, but a prison for the faithful. (এই সংসার অবিশ্বাসীদের কাছে স্বর্গ, কিন্তু বিশ্বাসীদের কাছে নরক।) আমরা এখানে নিশ্চিন্ত ও নিরাপদে থাকতে চাই, তাই এত হিংসা, এত মারামারি। সামান্য কারণে আগুন জ্বলে ওঠে, সামান্য ভুল বোঝা থেকে সর্বনাশ ঘটে যায়। An enormous avalanche begins by the displacement of one atom, and the conflagration of a town by the touch of a spark. (বিশাল হিমানীসম্প্রপাত সুরু হয় একটী মাত্র অণুর অপসরণ থেকে, আবার একটিমাত্র অগ্নিকণা থেকে সারা শহর দাউ দাউ ক'রে জ্বলে ওঠে।)

বর্তমানে এমনি যুগ চলেছে যে, কোনও চিন্তা নেই, ভালবাসা নেই, আছে কেবল স্বার্থ, আছে ভোগ বিলাস আর বাইরের জিনিষ নিয়ে হুজুগ। ভালবাসার অত্যন্ত অভাব। যুগ-প্রয়োজন হল প্রেম। দেশ আজ আধ্যাত্মিক বিষয়ে উদাসীন, ইন্দ্রিয়ই সব, তাই এই দুর্দশা। নেতারা আত্মদ্রষ্টা নয়, আর দায়িত্বশূন্য। তারই পরিণাম হচ্ছে, দেশময় অশান্তি, মারামারি, কাটাকাটি। আমরা অন্যের সংগে লড়াই করতে যাই, অথচ গৃহবিবাদ মেটাতে চাই না। এখন আর সময় নেই; তবে এমন সময় ছিল যখন অন্য পথে কাজ করলে এইরূপ গৃহবিবাদ হতে পারত না।

Love, true and profound love, should be a source of light and calm, a religion and a revelation in which there is no place left for the lower victories of vanity. (ভালবাসা—যথার্থ ও গভীর ভালবাসাই জীবনের আলো,

শান্তি, ধর্ম, এবং এমন একটা অনুভূতি যেখানে অহংকারজাত নিম্নতর সফলতার কোন মূল্য নেই।)

মহত্ব আমরা হারিয়ে ফেলেছি। বর্তমানে মহত্ত্বের প্রয়োজন সব চেয়ে বেশি। মহৎ হওয়া খুবই শক্ত, অনেক কিছু ত্যাগ কর্তে হয় মহৎ হতে হলে; তবুও মহত্ব চাই জাতির এই দুর্দিনে। কারণ মহত্ব ছাড়া জাতির উন্নতি হতে পারে না।

আমাদের মধ্যে তত্ত্বজ্ঞতার অত্যন্ত অভাব হয়েছে। ভাব-বাদী মন হুজুগে-মনের বিপরীত। অতীন্দ্রিয়জ্ঞান হারিয়ে আমরা অত্যন্ত জড়বাদী হয়ে পড়েছি। তাই আমাদের এই অধঃপতন। ধর্মও যে যন্ত্রের মত হয়ে পড়েছে, তার কারণও তত্ত্বজ্ঞানের অভাব। ইন্দ্রিয়াতীতের অনুভূতিহীন ধর্ম গন্ধবিহীন গোলাপের মত।

কলকাতার ব্যাপারে বুকটা ভেঙে গেছে। কেবলই মনে হয়, "What man has made of man!" (মানুষ মানুষের কি দুর্দশাই না করেছে!)

নীরবে কেঁদে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। তোমরা কাঁদো। সকলের চোখের জলে জাতির পাপ ধৌত হবে, তবে জাতির দুঃখ দূর হবে। আর কিছু লিখবার নেই। তুমি ভালবাসা নিও। প্রভা-মায়ীকে আমার স্নেহ জানিও। তোমাদের কথা প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা স্মরণ করি। এখন বিদায়। ইতি—

শুভাকাংক্ষী

নগেন

২১

সারদাধাম : ভুবনেশ্বর
৫. ১. ৪৮

স্নেহের—

তোমার পত্র পেলাম। আমার শরীরের জন্য অত ব্যস্ত কেন? শরীর থাকলেই তার রোগ আছেই, তা আর কি করা যায়? আমার নিজের ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য আমি কোন কিছু করতে চাই না। সর্বপ্রকার দুঃখ নীরবে সহ্য করাই আমার ধর্ম। শরীর চিরকাল থাকবে না। ঔষধে দুঃখের ভাগ কমাতে পারে, আয়ু দিতে পারে না। কিছু রোগ ভোগ করলে শরীর মন শুদ্ধ হয়। "Illness is often a blessing. By ravaging the body it purifies the soul and frees it. No one who is not ill can know himself thoroughly." (রোগ কখনো কখনো আশীর্বাদ স্বরূপ; ইহা শরীরকে বিধ্বস্ত ক'রে আত্মাকে নির্মল ও মুক্ত করে। যে কখনো অসুস্থ হয়নি সে নিজেকে পুরোপুরি জানতে পারে না।) পড়াশুনা কর, তবে মনটার জোর থাকবে, নতুবা মন দুর্বল হবে। যারা রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ করে, তাদের মধ্যে অনেকেই পড়াশুনা করে না। এর ফলে বিদ্যার অভাবে ব্যক্তি, সম্প্রদায় ও জাতি নষ্ট হয়ে যায়। চাই বিদ্যা। ভগবান অনেক দূরে, বিদ্যা প্রত্যক্ষ। ভগবান নিরাকার, কিন্তু তাঁর দুটি রূপ আছে যা মানুষ ধরতে পারে। একটি জ্ঞান অন্যটি প্রেম। প্রেম দুষ্প্রাপ্য, কিন্তু জ্ঞান কঠিন হলেও তা নিয়ে জীবনের পথে চলা সহজ হয়। সুতরাং জ্ঞানের অনুশীলন করতেই হবে। ভালবাসা নিও।ইতি—

নগেন

২২

সারদাধাম
১৯. ২. ৪৮

স্নেহের—

তোর পত্র পেলাম। তোর শরীরটা সংসারে, মনটাও কি সংসারে? সংসার সংগে নিয়ে যেতে পারবি? যাবার সময় টের পাবি। যাক সে কথা। আমি জানি, মানুষের জীবন নির্ভর করেনা ঔষধের বা স্থান পরিবর্তনের উপর। ঔষধে আয়ু দেয় না, ভোগ খণ্ডাতে পারে মাত্র। যেজন্য শরীরধারণ, তাই যদি না হল, তবে আর শরীর থাকার কি প্রয়োজন? যদি জীবনের উদ্দেশ্য ঠিক থাকে, তবে অল্পদিন বেঁচে থাকলেও কোন ক্ষতি নেই। রোগে একটু কষ্ট দেয়, তা অতটুকু কষ্ট পাওয়া উচিত। রোগ একটা তপস্যা—অনেক সুবিধা করে দেয়। মানুষ সংসারের জন্য অযথা শক্তি নষ্ট করে। যদি তপস্যার জন্য শক্তি না দেওয়া যায় তবে সে শক্তি থেকে লাভ কি? বেঁচে থাকাই তো আর জীবনের উদ্দেশ্য নয়! যতদিন আয়ু আছে ততদিন বেঁচে থাকবই; কাজেই সেজন্য আমার চিন্তা করবার কোন প্রয়োজন নেই। যদি ভক্তি বিশ্বাসই না হ'ল, তবে শরীর সুস্থ রেখে কি লাভ? কর্তব্য মানুষ জুটিয়ে নেয়, অথচ আসল কর্তব্য যেটা সেখানে মানুষের চেষ্টা নেই। যাক সে কথা। তোর যত ইচ্ছা সংসারের জন্য কর্তব্য কর, আমার কিছু বলবার নেই। ভালবাসা নিস। ইতি—

নগেন

২৩

সারদাধাম

২৬. ৩. ৪৮

স্নেহাস্পদেষু—

তোমার পত্র এইমাত্র পেলাম। তোমার পত্র পেয়ে অত্যন্ত সুখী হলাম। ঠিক ঠিক পথে চল, সব অ-সুখ দূরে যাবে। এ পথে চলতে হলে সবার আশীর্বাদ চাই, না হ'লে অনেক দুঃখ ভোগ করতে হয়। একটু নিয়মিত চল, সব রোগ ভাল হয়ে যাবে। তোমার জন্যই তো এত ভাবনা। তুমি ঠিক ঠিক চলতে পারলে শান্ত মনে বিদায় গ্রহণ করতে পারব। নিজের শরীরের ও মনের দিকে নজর রাখবে সব সময়। সুস্থ শরীরে ও সুস্থ মনে জীবনের পথে চলতে আরম্ভ কর, দেখে নিশ্চিন্ত হই। দুনিয়ার দিন তো হিসাব করা—একটি একটি করে চলে যাচ্ছে। শেষের দিনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করছি। তাই এক ভাব, এক উদ্দেশ্য, এক চিন্তা ছাড়া আর কিছু চাই না, আর কিছুই ভাল লাগে না। তোমরা যদি নিজের উপর নির্ভর করে ঠিক ঠিক চলতে পার, তবেই সব চেয়ে বেশি খুসী হব, আর পিছনে ফিরে চাইবার প্রয়োজন থাকবে না। তুমি সুস্থ হও, শান্ত হও। লক্ষ্যের প্রতি তোমার দৃষ্টি স্থির হোক। ইষ্টের প্রতি ঐকান্তিকা ভক্তি হোক, এই একমাত্র প্রার্থনা। ভালবাসা নিও। ইতি—

নগেন

২৪

সারদাধাম
১১. ৬. ৪৮

স্নেহাস্পদেষু—

তোমার পত্র পেয়েছি। * * How can a man come to know himself ? Never by thinking but by doing. Try to do your duty and you will know your worth." (কেমন করে মানুষ নিজের সামর্থ্য বুঝতে পারে ? শুধু কর্ম দ্বারাই বুঝতে পারে, চিন্তা দ্বারা নয়। নিজের কর্তব্য করতে চেষ্টা কর, তবেই তোমার যোগ্যতা কতখানি তা জানতে পারবে)। এখন duty (কর্তব্য)-টা কি ? কর্তব্য হচ্ছে দিনের দাবি। সমস্ত দিনের দাবিটা পূরণ করতে গেলেই বুঝতে পারবে যে, নিজের শক্তি কতটুকু, নিজের ত্রুটি কোথায়। যাদের বাসনা কর্ম ও কর্মফলের সহিত সামঞ্জস্যহীন তাদের মনে কখনও শান্তি হয় না—তারা কখনই জ্ঞান লাভ করতে পারে না। আমাদের শক্তির কত অপব্যয় ! নিজেকে আমরা খণ্ডবিখণ্ড করি নানা চিন্তায় ; তাই কোন কিছুতেই তো তৃপ্তি পাই না।

একটা ভাব নিয়ে জীবন কাটাবার চেষ্টা করতে হয়। সমস্ত কাজকর্মের ফাঁকে সুখেদুঃখে, অবসর সময়, বন্ধুদের সংগে আলাপে সেটাকে আঁকড়ে ধরে থাকলেই মনের তৃপ্তি হয়। যারা ভাব নিয়ে না চলে তাদের শেষে চলতে হয় sensations (উত্তেজনা) নিয়ে। * * * গ্যেটের একটা কথা আছে—'He is the happiest man who can set the end of his life in

connection with the beginning.' (সেই সবচেয়ে সুখী যার জীবনের আরম্ভ ও শেষ এক সূত্রে বাঁধা)। একটি ভাব আশ্রয় করলে তবেই তা সম্ভব, নতুবা নয়। প্রতিদিনের কর্মে অনেক শক্তি তো নষ্ট হয় বৃথা। তারপরও যখন একত্র হও, তখনও অনেক বাজে কথা বলে সময় নষ্ট কর। জীবনের দিক থেকে সেটা অত্যন্ত ক্ষতিকর। তাই খৃষ্ট বলেছেন, জীবনের শেষে প্রত্যেক কথার জন্য তোমাদের কৈফিয়ৎ দিতে হবে। জীবনটা continuous whole (অখণ্ড ও ধারাবাহিক), তাই অন্তর্জীবনটার একটা ধারাবাহিকতা থাকা দরকার। একসংগে দশ ঘণ্টা ধ্যান করেও তারপর যদি বাজে চিন্তা প্রভৃতি নিয়ে থাকা যায়, তবে সেই ধ্যান-জপের কোন মূল্য নেই। যতটা পারা যায় জীবনের অধিকাংশ সময় নিজের ইষ্টকে স্মরণ রাখাই হল সাধনা। এজন্য চাই, বাজে কথা বন্ধ করা, বৃথা সময় নষ্ট না করা, উপযাচক হয়ে কোন কিছুতে লিপ্ত না হওয়া এবং বুদ্ধি ও অন্তরের বিকাশের জন্য পড়াশোনা করা; আর চাই, আত্মবিশ্লেষণ, নীরব থাকার অভ্যাস এবং যে সব গল্প-গুজব ও কৌতূহলের সংগে অন্তর্জীবনের কোন্ সম্বন্ধ নেই তা থেকে দূরে থাকা। বাজে কথায়, বাজে চিন্তায় ও বাজে কাজে জীবনের সমস্ত সদ্গুণ বের হয়ে যায়। মানুষকে খুশী করবার চেষ্টা করার মত এতবড় আহাম্মুকী আর জগতে নেই। কুকুরের লেজ সোজা করার মত যতক্ষণ টেনে ধ'রে রাখবে ততক্ষণ ঠিক থাকবে, ছেড়ে দিলেই বেঁকে যাবে। * * ধ্যান ও কঠোরতা, কঠোরতা ও ধ্যান—দুটোই এক সংগে চাই। সাধনা করতে হলে কিছু ছাড়া চাই, কিছু ধরা চাই। আমরা ভিতর থেকে

কিছুই ছাড়তেও চাই না ধরতেও চাই না। সাধনা মানেই অবিরাম সংগ্রাম। এক মুহূর্ত নষ্ট করলে চলবে না। সময় একবার গেলে আর ফিরে আসে না। তবে মনে রেখো, "peace is a necessary condition of spirituality" (আধ্যাত্মিকতার জন্য শান্তির একান্ত প্রয়োজন)। এখন প্রার্থনা—

"যখন মুদে আঁখি করব শয়ন শমনের সেই শেষ কালে,
যখন সবই হবে আঁধার, স্থান দিও মা ঐ কোলে।"

সকলে ভালবাসা নিও ও আমার জন্য প্রার্থনা কোরো যেন কর্মবন্ধন ঘুচে যায়। ইতি—

নগেন

২৫

সারদাধাম
১১. ৭. ৪৮

স্নেহের—

তোমার পত্র পেলাম। তুমি আর টাকা পাঠিও না। তোমার নিজেরই চলে না; তুমি কেন টাকা পাঠাও? 'বিজ্ঞানানন্দ স্বামী' অনেক বড় বই। শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রত্যেক সন্তানই সাধারণ লোকদের চেয়ে অনেক বড়। তাঁদের জীবনে বাইরের প্রকাশ নেই। তাঁরা নীরবেই জীবনযাপন করে গেছেন। যাঁরা ভালবেসে পাগল হয়েছেন তাঁরা কেন জগতের সামনে আসবেন? যারা প্রেমের স্পর্শ পায় নি, কিংবা প্রেমের স্পর্শ পেয়েও ধরে রাখতে পারে নি তারাই বাইরের উপর নির্ভর করে। ঠাকুরের সন্তানরা স্পর্শ

পেয়ে পাগল হয়েছিলেন। আমরা পাগল হতে পারি নি, কারণ আমরা স্পর্শমণির স্পর্শ পাই নি। আমার ভালবাসা নিও। ইতি—

নগেন

২৬

সারদাধাম : ভুবনেশ্বর

২২. ৭. ৪৮

স্নেহাস্পদেষু,

তোমার পত্র পেয়েছি। দোষত্রুটি কিছু নেই। নিজের মনের দুর্বলতাই সব চেয়ে বড় দোষ—জীবনের সব চেয়ে বড় ত্রুটি। মনে রেখো সব সময় যে, Boldness has power, genius and magic in it. Be bold, be bold! (সাহসিকতায় শক্তি আছে, প্রতিভা আছে ও যাদু আছে। সাহসী হও! সাহসী হও!) জীবনই তো দুর্বলতা—Man's hour on earth is weakness, error and strife. (সাংসারিক জীবন মানেই দুর্বলতা, ত্রুটি ও সংঘর্ষ।) কিন্তু সেটা নিয়ে কোন লোক বসে বসে কাঁদে না। ভাল-মন্দ সবই ক্ষণিক, বাস্তব নয়। জীবনকে কি কেউ আটকাতে পারে? Determine and it will be yours. Begin and the work will be completed. (দৃঢ়সংকল্প হও—ইহা তোমারই হবে। কাজ সুরু করে দাও, শেষ হবেই)। যতই দুর্বলতা আসুক, যতই অবসাদ আসুক, মানুষ তা কখনই স্বীকার করে নেয় না—সে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেই। যখনই আত্মসত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনই শান্তি জেগে উঠে। মানুষ মাত্রই দুর্বল। ভ্রমবশতঃ কোন লোকের

জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল যদি আচ্ছন্ন হয়, তবে সেজন্য তাকে দোষী করা যায় না। যে মুহূর্তে মানুষ বোঝে সে দুর্বল, সেই মুহূর্তে সে ভগবানের কৃপা পায়। তিনি দুর্বলকেই কৃপা করেন। কিন্তু আমরা "নয়নে বসন বাঁধিয়া, আঁধারে মরি গো কাঁদিয়া"। কাজেই আমাদের কেউ সাহায্য করে না।

ভীষণ মারাত্মক পাপের মধ্যে অলসতা একটি। যদি নিজের চেষ্টা না থাকে তবে বুঝতে হবে যে, শয়তান আশ্রয় করে বসেছে। মনে রেখো, অধীর আগ্রহই মানুষের সর্বোত্তম কর্মবৃত্তি। সমস্ত জিনিষই একের পর আর আসে যায়। যদি সুযোগকে ধরে রাখতে পারি, তবে শুভ মুহূর্ত জীবনে আসবেই। দুনিয়ার দিকে তাকিও না। দুনিয়া কখনই ক্ষমা করে না। ভগবানের দয়া আছে, কিন্তু মানুষের নাই। নিজের ইচ্ছাই সর্বপ্রধান। নিজের একটু ইচ্ছা হলেই ভগবান সব সুযোগ এনে দেন। আবার নিজের সামান্য একটু আলস্য বা অনিচ্ছা হলে অনেক দুঃখ পেতে হয়। চোখে সামান্য ধূলিকণা গেলেই আর কিছু দেখা যায় না। আমার আর লিখবার কি আছে? শেষ কথা এই—A man cannot be nourished by the anticipation of tomorrow's dinner or the recollection of what he ate a week ago. Bread serves its purpose only when consumed this day, here and now. It is the same with spiritual food. (কাল কি খাবে বা এক সপ্তাহ পূর্বে কি খেয়েছিল সেই চিন্তা করে মানুষের পেট ভরে না। আজ এবং এখনি খেলে তবেই খাদ্যের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রেও

এই নিয়মই প্রযোজ্য।) স্মরণ, মনন, ধ্যান ও প্রার্থনা দরকার, কিন্তু contemplation without austerity and austerity without contemplation is not at all possible. (কঠোরতা ব্যতীত ধ্যান-ধারণা ও ধ্যান-ধারণা ব্যতীত কঠোরতা কখনও সম্ভব নয়।) ভালবাসা নিও। ইতি—

নগেন

২৭

সারদাধাম : ভুবনেশ্বর

৩১. ৭. ৪৮

স্নেহাস্পদেষু—

তোমার পত্র পেয়েছি। * * দুঃখ করবার কিছুই নেই। আমাদের সব সময় মনে রাখা দরকার যে, এ দুনিয়াতে আমরা বিদেশী ও যাত্রী। কাজেই অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়েই যেতে হবে। এক ভাবে না এক ভাবে দুঃখ পেতেই হবে। দুঃখ পেলে শরীর মন ভাল থাকে, চোখ পরিষ্কার হয়, নতুবা দৃষ্টি খারাপ হয়ে যায়। নিরাপত্তা মানুষের নিকৃষ্টতম শত্রু। দেহ ধারণ করলে নানাবিধ দুঃখ ভোগ করতেই হবে। যে দুঃখ পায় না, যার মনে দুঃখ নেই, হয় সে দেবতা, না হয় সে পশু। সংসারের দিক দিয়ে অন্যের সংগে যতই নিজেকে এক করবে, শেষে ততই দেখবে, কেউই তোমার কথা শোনে না— সবাই চলে নিজের মত। অবশেষে নিজেকে রিক্ত, তিক্ত ও ক্লান্ত বোধ করবে। তখন মনে হবে, "হারাইয়া লাভে মূলে মরণেরই সিন্ধুকূলে

পথশ্রান্ত দেহখানি টানিয়া এনেছি হায়।" এ সংসারে জীবনটা হচ্ছে দুঃখদ্বন্দ্ব ও বাধাবিপত্তিময়। তবে ভুলেরও একটা মস্ত দান আছে। ভুলই জ্ঞান দেয়। "You never will get sense except you err." (ভুল না করলে কখনও চৈতন্য হয় না)। মানুষকে কোন কথা বলে লাভ নেই ; মানুষ শোনে না, শুনতে পারে না। "Men hear advice and then it freezes in the ear. Though lessoned by the fierce fact over and over, yet men are ever self-willed as before" (মানুষ পরামর্শ শোনে, কিন্তু তা কাণের মধ্যেই জমাট বেঁধে থাকে। বার বার ভয়াবহ ঘটনার দ্বারা শিক্ষা পাওয়া সত্ত্বেও মানুষ চিরকাল পূর্ববৎ নিজের একগুঁয়েমি নিয়েই চলে।) শেষের দিন ক্রমাগত যে এগিয়ে আসছে সেটা কি কেউ স্মরণ করে ? "Yet the end comes. No force or prayer can stay it. All know it, but few contemplate it with pleasure." (তথাপি মৃত্যু আসে। কোন শক্তি বা প্রার্থনাই তাকে বাধা দিতে পারে না। মৃত্যুকে সকলেই জানে, কিন্তু খুব কম লোকই সানন্দে মৃত্যু সম্বন্ধে চিন্তা করে।) এই ঘুম ভাঙে তখন, যখন আসে অনুতাপ ও স্মৃতি। "Remembrance and repentance will awake" (স্মৃতি এবং অনুতাপ জাগবেই)। আর কি লিখব ? ভালবাসা নিও। ইতি—

নগেন

২৮

সারদাধাম : ভুবনেশ্বর
১০. ৮. ৪৯

স্নেহের—

তোমার পত্র পেলাম। আমার শরীর এই ভাবেই চলবে। যেদিন তোমরা সকলে একমুখী হবে, ব্যাকুল হবে, জীবনের একটা মূল্য দিয়ে কথাবার্তা, কাজকর্ম প্রভৃতিতে হিসাব করে চলবে, সেই দিন শরীর ভাল হবে। বাইরের হাওয়া-বদলে এ-শরীর ভাল হবে না। তোমাদের জীবনের সংগে অভিন্ন, কাজেই যতদিন না তোমাদের মধ্যে ব্যাকুলতা আসছে, জ্ঞান স্পৃহা জাগছে, ততদিন আমার মুক্তি নেই। একজন তীরন্দাজের চক্ষু যেমন তীর ও লক্ষ্যবস্তুর উপর স্থির হয়, যতদিন না তোমাদের দৃষ্টি তেমনই লক্ষ্য বস্তুর উপর স্থির হচ্ছে, ততদিন আমাকে ভুগতেই হবে।

শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করলে পথের বাধাবিঘ্ন সব দূর হয়ে যায়। তোমার সৌভাগ্য তাঁকে প্রণাম করেছ ; তাই তাঁর কৃপায় সংসারের ঘূর্ণীপাকে পড়ে হাবুডুবু খেতে হয় নি, আর ভাল সংগ ও সকলের ভালবাসা পেয়েছ।

শারীরিক ও মানসিক কামনা বাসনাই মানুষকে চালায় এবং মানুষের বাসনা, প্রলোভন, অহংকার, আসক্তি ও ক্রোধকে উদ্দীপিত করে। যে-মনকে পবিত্র হতে হবে, মুক্ত হতে হবে এবং ফিরে যেতে হবে তার আদি বাসস্থানে, সেই মনকে এরা তিমিরাচ্ছন্ন ক'রে দাস করে রাখে। সুতরাং মন থেকে অপসারিত করতে হবে সর্বপ্রকার আসক্তির বস্তুকে ; তারপর একে মুক্ত করতে হবে সর্বপ্রকার ভয় ও ঘৃণা থেকে।

একজনের তো প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে, একজনকে তো দুঃখ পেতেই হবে! তাই ভাবছি আমিই দুঃখ পাই। আমার নিজের কোন উপদেশ নেই। আমি মজুর, আমি ভারবাহী বলদ, তবে জগতের শ্রেষ্ঠ লোকেদের চিন্তার ভার বহন করি এই মাত্র। আমার কোন কৃতিত্ব নেই।

পর-চর্চা, বাজে-কথা জীবনের বিষম অন্তরায়। যতক্ষণ পর-চর্চা করতে থাকবে ততক্ষণ কিছুই করতে পারবে না। যেদিন পর-চর্চা, বৃথা-কথা, কল্পনা-জল্পনা ছেড়ে দেবে সেদিন দেখবে হৃদয় কথা বলছে। যে কিছু ভালবেসেছে, যে কোন আদর্শ জীবন গঠন করার জন্য চেষ্টা করছে সে এ জগতের দুঃখ-সুখ গ্রাহ্য করে না। সে বর্তমান জীবনের দুঃখ কষ্ট থেকে রেহাই পেতে চায় না। জগতের সব চলে যাবে; সংসারের সুখ, মানুষের ভালবাসা, সংসারের আসক্তি এসব ভেসে যাবে; কিন্তু থাকবে মানুষের সত্যের অনুসন্ধান। যখনই মানুষ সত্যের সন্ধানে ছুটবে তখনই পার্থিব সম্পর্ক সব বদলে যাবে। সে একটি মিনিটও অপব্যবহার করবে না।

বাহিরের আঘাতে ভিতরে একটা উত্তেজনা আসে; তার সংগে এসে যোগ দেয় কল্পনা; তখন সেই কল্পিত লোকের আকর্ষণ মধুর বলে মনে হয়। কিন্তু মানুষ তখন টের পায় না যে, সে কুমীর ধ'রে নদী পার হতে যাচ্ছে, আর এজন্য তাকে শেষে অনেক কষ্ট পেতে হয়। ধর্ম এলে ভয়, দুঃখ, মৃত্যু ও ব্যর্থতা সব চলে যায়। "Religion is the conquest of fear, the antidote to failure and death." (ধর্ম ভয়, ব্যর্থতা ও মৃত্যুকে জয় করে।) দেহ ও মনের দিক দিয়ে দেখলে

জগৎকে একরূপ দেখা যায়, আর আত্মার দিক থেকে দেখলে অন্যরূপ দেখা যায়। তাই জগতের লোক যারা সংসার চায়, সংসার যাদের কেন্দ্র, স্ত্রী-ভোগই যাদের জীবনের চরম লক্ষ্য, তারা হারায় জীবনের আলো ও আনন্দ। তাদের জীবনে নেই আশার প্রেরণা, নেই লাভ করবার মত কোন উচ্চাকাংক্ষা, নেই অনুসন্ধানের যোগ্য কোন সুখের ধারণা বা জীবনের অবলম্বনস্বরূপ কোন ধর্ম।

যাদের একটু বুদ্ধি আছে, চিন্তা আছে তারা এইরূপ অবস্থায় পড়ে বলে, "যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না।" আর এই অবস্থাতেই মনে হয়, প্রেমে পরমা শান্তি—পরমা তৃপ্তি। তারপর অনেক দুঃখ, অনেক ব্যথা, অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের পর যখন একটু চেতনা হয়, তখন বুঝতে পারি—

কোথাও থাকিতে না পারি ক্ষণেক
রাখিতে পারিনে কিছু,
মত্ত হৃদয় ছুটে চলে যায়
ফেন পুঞ্জের পিছু।

"ফেন পুঞ্জের পিছু ছুটেছি"—এটা বোঝাই হল, জীবন যে অসার সেটা বোঝা। এই অবস্থায় জীবন আরম্ভ হয়। পুরানো মানুষটির মৃত্যু না হলে পুনর্জন্ম হয় না। যতদিন পর্যন্ত না পুনর্জন্ম লাভ করবে ততদিন স্বর্গরাজ্যে প্রবেশের অধিকারী হতে পারবে না। দ্বিজ হওয়া মানে হৃদয়ের পরিবর্তন ও মনের রূপান্তর। যখন এইরূপ অবস্থা হয় তখন মানুষ সব ছেড়ে পাগল হয়ে ছোটে। এই হচ্ছে ভালবাসা। ভালবাসার বশবর্তী হয়েই স্বামীজীরা সর্বত্যাগী হয়েছিলেন। যীশুর শিষ্যরা এইজন্য পরিত্যাগ করেছিলেন, পিতা

মাতা, গৃহ, পরিজন সবাইকে। তাঁরা এই লোকটির জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করেছিলেন। তিনি তাঁদের অর্থ কিংবা জমিজমা দিতে চান নি, দিতে চেয়েছিলেন, ভালবাসা, দারিদ্র্য ও পূর্ণতা। লিখেছ, ভালবাসার কি অমোঘ শক্তি! এই শক্তি আসে ত্যাগ থেকে। আসল কথা ভিতরের মানুষটির পরিবর্তন চাই—নিজেদিগকে পুনর্গঠিত করতে হবে। স্বামীজী বলেছেন, নিজে তৈরী হও এবং অন্যকে তৈরী কর। এটা মনে করে দেখতে হয় যে, আমি অন্যের স্পর্শে এসে কতটা তৈরী হচ্ছি, আর আমার স্পর্শে এসেই বা অন্যের হৃদয় কতটা পরিবর্তিত হচ্ছে—তারা কি পাচ্ছে। বিচার থাকা দরকার। ঠাকুর বিচারের উপর জোর দিয়েছেন। কথা বলার জন্য কথা বলা, মিশবার জন্য মেশা, গল্প করার জন্য গল্প করা, এতে কি লাভ? এইরূপ স্মরণ করাই বিচার। সময় চলে যাচ্ছে—সংগে কেউ যাবে না, এটা মনে রাখা উচিত অহরহ। স্বামীজীরা পরস্পরকে ভালবাসতেন; কিন্তু সে ভালবাসা তাঁদের সাধন ভজনের অন্তরায় হয় নি। শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহত্যাগের পর তাঁরা যে যার মত দূরে সরে গিয়ে আপন মনে সাধন ভজন করে নিজেদিগকে তৈরী করে ফিরে এলেন; ফিরে এসেও ধ্যানজপ পাঠ আলোচনা নিয়েই রইলেন; কখনো গল্প-গুজব করে কাটাননি। আমাদের সর্বনাশের মূল কারণ, আমরা প্রত্যেকে গল্প-গুজব করে দিন কাটাই, আর অন্যের বিচার করতে সদা প্রস্তুত! তাই যীশুখৃষ্ট বলেছেন, "অন্যকে বিচার কোরো না, তাহলে তোমাকেও কেউ বিচার করবে না।" যে ব্যক্তি আত্মপ্রীতি ও অন্যের ঘৃণাকে জয় করতে পেরেছে সে তো নতুন মানুষে পরিণত হয়েছে। অন্যকে বিচার করা ও অন্য

সম্বন্ধে আলোচনাই হল আত্মপ্রীতি। স্বামীজী বলেছেন, অন্যের দোষ ধরাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় নিষ্ঠুরতা। ভালবাসা নিও। ইতি—

নগেন

পুনঃ—ভুলো না, শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করেছ তাই বেঁচে আছ, নতুবা অনেক দুঃখ কষ্ট পেতে।

২৯

সারদাধাম

২২. ৯. ৪৮

স্নেহের—

তোমার পত্র পেয়েছি। * * * তুমি লিখেছ, নানা অসুবিধার মধ্যে স্মরণ মনন করি। যখন বাধা এসে পথ রুদ্ধ করে তখনই তো অন্তরের ব্যাকুলতা বেশী হয়। বিশ্বাস ভগবানের দান। এটা চেষ্টায় পাওয়া যায় না। বিশ্বাস কেউ নষ্ট করতে পারে না। যা নষ্ট হয় বা যার পরিবর্তন হয়, সেটা আস্থা বা মত, বিশ্বাস নয়। বিশ্বাস ও মতে অনেক পার্থক্য।

বিশ্বাস, ভক্তি, ভালবাসা এসব নিয়েই মানুষ জন্মায়—চেষ্টার দ্বারা এসব হয় না; কাজেই ভয় পাবার কিছুই নেই। আর এক কথা—মন তো তোমার সংগে সংগেই থাকে, মনে মনেই স্মরণ করবে, আর হাতে কাজ করে যাবে। দুঃখ করার কিছুই নেই। তিনি ব্যথার মাঝে, দুঃখের মাঝে, বিচ্ছেদের মাঝে নিজেকে প্রকাশিত করেন। যখন সময় ও সুযোগ পাবে তখন তাঁকে অবহেলা করে হারিও না; যদি সত্যিই অন্তরের টান থাকে, তবে অসুবিধার মধ্যে

অভাবটা বেশী করে বুঝবে, প্রাণ সদাই ব্যাকুল হয়ে থাকবে তাঁকে পাবার জন্য, তাঁকে দেখার জন্য, তাঁকে স্মরণ মনন করার জন্য। সব সুখ সুবিধা পেয়ে তাঁকে স্মরণ করবে, সে তো একেবারে ফাঁকা কথা। ঠিক ঠিক সাধন ভজন করতে না পেরে যদি ব্যথা জাগে, দুঃখ লাগে, তবে তুমি বুঝতে পারবে—

"অন্তরে অলক্ষ্যলোকে তোমার পরম আগমন
লভিলাম চির স্পর্শমণি ;
তোমার শূন্যতা তুমি পরিপূর্ণ করেছ আপনি।
জীবন আঁধার হোল, সেইক্ষণে পাইনু সন্ধান—
সন্ধ্যার দেউলদীপ, অন্তরে রাখিয়া গেছ দান॥"

* * *

"বিচ্ছেদেরি হোমাগ্নি হতে
পূজামূর্ত্তি ধরে
প্রেম দেখা দেয় দুঃখের আলোতে।"

এটা স্থির জেনো, জীবনের কোন ঘটনাই বৃথা নয়, নিরর্থক নয়। দুঃখ-বিপদ, রোগ-শোক-মৃত্যু, মিলন-বিরহ সবই জীবনকে গড়ে তোলে। যার ঘুম ভাঙে তার অন্তর ব্যাকুল হয়ে ওঠে। তখন আর সুখের ইচ্ছা—আরামের ইচ্ছা থাকে না। সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার সময় পায় না, সদাই ব্যস্ত থাকে ইষ্টের চিন্তায়। প্রথম অনুরাগই প্রবল হয়। বাধা পেলে জলের স্রোত জোরে বয়, মনের ব্যাকুলতাও বেশী হয়। তবে সে ব্যাকুলতা মনে রেখে চলতে হয়। "মনোদুঃখ চাপি মনে, হেসে নে

সবার সনে।" নিজেকে প্রকাশ করতে যেও না—"যব্ য্যায়সা তব ত্যায়সা, সদা মগনমে রহনা জী।"

"সবসে উঠিয়ে, সবসে বৈঠিয়ে, সবসে কিজিয়ে কাম,
হাঁজি হাঁজি করকে বৈঠোজি আপনা ঠাম।"

তবে স্মরণটা রেখ, আর খুব সকালে, সন্ধ্যায় ও রাতে শোবার সময়, একটু সময় করে নিয়ে ধ্যান জপ কোরো। তিনি তোমার কাছে কিছুই চান না, কেবল চান তোমার হৃদয়ে এসে বসতে। হৃদয়ে যদি একটু স্থান করতে পার, তবে তোমার অজ্ঞাতে তিনি এসে হাজির হবেন ; আর তখন তুমি নিজেও বুঝতে পারবে, তিনি কিছু নিতে আসেননি, এসেছেন দিতে।

"মোর দ্বারে যবে এলে অন্যমনা
সে কি মোর কিছু নিয়ে পুরাতে কামনা ?
নহে, নহে হে রাজন !
তোমার অনেক ধন আছে
তাই তুমি আস মোর কাছে
দেবার আনন্দ তব পূর্ণ করিবার লাগি।"

তিনি এসে ফিরে না যান, এটাই একমাত্র লক্ষ্য থাকা দরকার। তাঁর বসার স্থান করলে তিনি এসে বসবেনই বসবেন, এটা ঠিক জেনে রেখো। অন্তরের ময়লা পরিষ্কার করে স্থান করতে থাক, তারপর যখন তাঁর ইচ্ছা হবে তখন তিনি এসে উপস্থিত হবেন তোমাকে না বলেই। তিনি বলে আসেন না ; তিনি এসে চলে গেলে তবে জানা যায় যে, তিনি এসে চলে গেছেন। তিনি "অলখ পথে" করেন "যাওয়া আসা।" তাঁর চরণের ধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়, তাঁকে দেখা যায়

না, কারণ তিনি সহজে ধরা দেন না। তবে চরণধ্বনি শুনতে পেলেই মনটা আনন্দে পূর্ণ হয়। তখন বুঝতে পারা যায় যে, তিনি দেখা দেবার জন্য আশেপাশে ঘুরছেন। আর এই তাঁর খেলা! দেখা দিলে, পরিচয় দিলে তো সব শেষ হয়ে গেল। তাই বলতে হয়—

"জেনেছি হৃদয়ে তুমিই অচেনা
কোনদিন ফুরাবে না পরিচয়
তোমারে বুঝিব আমি
করি না সে আশা ॥"

পেয়েও না পাওয়া সাধনার প্রথম অবস্থা। "ধরি ধরি করি ধরিতে না পারি" অবস্থা দ্বিতীয় স্তরের। * * যদি তাঁর বাঁশী শুনতে পাও তবে জানবে যে, দেখা শীঘ্রই হবে। তাঁর বাঁশী শোনার জন্য কানকে প্রস্তুত কর। বাঁশী শুনলে দেখাও পাবে নিশ্চয়।

"এখনও তারে চোখে দেখিনি
শুধু বাঁশী শুনেছি।"

"Blessed is he who heareth the call of the Lord" (যে প্রভুর আহ্বান শুনতে পায় সেই ধন্য)। তোমাকে গড়বার জন্যই তাঁর লুকোচুরি খেলা। একদিন তুমিও বুঝে বলবে—

"হে চিরপুরান, চিরকাল মোরে গড়িছ নতুন করিয়া,
চিরদিন তুমি সাথে ছিলে মোর রবে চিরদিন ধরিয়া।"

আমার স্নেহাশিস্ লও। এখন বিদায়। ইতি—

তোমার জ্যেঠামহাশয়

৩১

সারদাধাম : ভুবনেশ্বর

৫. ৫. ৪৯

স্নেহের—

তোমার পত্র পেলাম। আমি জানি তুমি খুলনায় গিয়েছ। তাই পত্র খুলনায় যাবে এটা ঠিক করেই লিখছি। আমি মনে করি তুমি এখনো খুলনায়ই আছ।

মনটা উচ্চভাবে রাখতে হলে উচ্চ চিন্তা নিয়ে থাকতে হয়। মানুষ যা পায় তা হারিয়ে ফেলে বাজে প্রসংগ ক'রে, বেশী কথা ব'লে, বিনা কারণে কথা ব'লে। একে বলে বিক্ষেপ; ধ্যান-জপ করলে যা লাভ হয় বাজে চিন্তা করলে সেগুলি তো যায়ই, আর যা হবার আশা থাকে তাও নষ্ট হয়ে যায়। অনেকে তো ভাল কথা শোনেই না; যারা শোনে তারাও অনেকেই এক কান দিয়ে শোনে, আর এক কান দিয়ে বা'র করে দেয়। আবার কেউ কেউ কান দিয়ে শোনে মুখ দিয়ে বার করে দেয়। খুব অল্প দু'একজনই পাওয়া যায় যারা কান দিয়ে শুনে মরমে গেঁথে রাখে। তারাই সত্য সত্য আধ্যাত্মিক জগতের অধিকারী। তারাই বলতে পারে—"কেবা শুনাইল শ্যাম নাম, কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো আকুল করিল মোর প্রাণ।" প্রাণে পুরে না রাখলে ব্যাকুলতা হয় না। তোমাদের যেমন সুযোগ সুবিধা ছিল সেটা অনেকটা নষ্ট করেছ অপব্যয় করে। হৈ চৈ করলে ভাব নষ্ট হয়। আমার তো জীবনের অনেক শক্তি ব্যয় হয়েছে বহু লোকের সংগ ক'রে। মাঝে মাঝে মৌন থাকতে ইচ্ছে করে। একবার বলেছিলাম, যদি একদিনও অনুপস্থিত থাক, তবে পাঠ বন্ধ করে দেব; এবার বলছি, যদি

একটি বাজে কথা বল, তবে পাঠ বন্ধ করব—কথা বন্ধ করব। চুপ করে বসে একটা ভাবকে যে স্থায়ী করবে সে ক্ষমতা নেই! এর পরিণাম ভাল নয়, পরে নানা কষ্ট পেতে হবে। একজন তোমাদের জন্য ভাবছে, সে তোমাদের কাছে কিছুই চায় না। তোমাদের কল্যাণের জন্য যেটা বলা সেটার প্রতি শ্রদ্ধা না রাখলে তার জন্য অনেক কষ্ট পেতে হবে। এখন কেউ সে কথা বুঝবে না; যখন দুঃখ কষ্ট আসবে তখন যদি মনে থাকে, তবে বুঝতে পারবে। একটা ভাব স্থায়ী করতে হলে এক চিন্তা, এক ধ্যান, এক আসন চাই। যদি সংগ না মেলে তবে গ্রন্থ আছে। নিজে পড়াশোনা করবে। কাকারা এলে সেই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে একটা আলোচনা হবে; তাতে উভয় পক্ষেরই লাভ। সংসারের সম্বন্ধ যাদের সংগে তাদের সংগে সংসারের গল্প করা চলে। কিন্তু যাদের সংগে ঠাকুর নিয়ে সম্বন্ধ তাদের সংগে ঠাকুরের প্রসংগ নিয়ে না চললে সমূহ ক্ষতি হয়। যীশুখৃষ্টের একটা কথা মনে পড়ছে—"Whosoever shall do the will of God the same is my brother and my sister and mother. My family is here (devotees) and I have no other. (ভগবানের ইচ্ছাই যার ইচ্ছা সে আমার ভাই, আমার বোন আমার মা। এদের (ভক্তদের) নিয়েই আমার সংসার—আমার আর কেউ নেই।) নিজেদের আন্তরিকতা না থাকলে নানা ফাঁকে নানা অসুবিধা প্রবেশ ক'রে মনটাকে নষ্ট ক'রে দেবে। বাধা-বিপত্তি যা আসে তার কারণ নিজে—অন্যে নয়। নিজের মনের গভীরতা হারালে মনটা হবে হাল্‌কা; অমনি মন চাইবে ভেসে উঠতে, আর তখনই বাইরের সুযোগ-সুবিধা সামনে এসে মনকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। অন্যের

দোষ দেয়া অন্যায়। "দোষ কারো নয় গো, আমি স্বখাদ সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।" বুদ্ধও বলেছেন—"Ye suffer for yourself, none else compels thee friend." (বন্ধু, তুমি নিজের দোষেই দুঃখ পাও, অন্য কেউ তোমায় দুঃখ দিতে পারে না।) স্বামীজী বলেছেন—"Thine is the hand that holds the rope that drags thee on." (যে রজ্জু তোমাকে নিরন্তর আকর্ষণ করছে, তা তুমি নিজহাতেই ধরে আছ।) তোমাদের মধ্যে আছে একটা সম্ভাবনা ; ইচ্ছা করলে তোমরা সেটাকে কার্যে পরিণত করতে পার, আর ইচ্ছা করলে নষ্টও করতে পার। আচার্য শংকর বলেছেন—নিজে না করলে অন্যে কিছু করে দিতে পারে না। ঔষধ না খেলে রোগীর রোগ ভাল হয় না কেবল ডাক্তারের কথায়। আমার মনে হয় যে, আমার যা করবার তা করা হয়ে গেছে। এরপর তোমাদের ইচ্ছা। শুনলাম, স্বামী বিরজানন্দ এখনও বেলুড়ে আছেন, আর মে মাসে দীক্ষা দেবেন। বলাই মহারাজ এ কথা বললেন। জানি না এটা ঠিক কি না। আমার বিশ্বাস আমার পালা শেষ হয়ে গেছে। সামনে যে কটা দিন আছে, যেন নীরবে কাটাতে পারি। লোকসংগ, হৈ চৈ, এমন কি পাঠ আলোচনা পর্যন্ত ভাল লাগে না। এখানে এতদিন চুপ করেই ছিলাম। চৈত্র সংক্রান্তি হতে পাঠ আরম্ভ হয়েছে। মনটা বাইরের কোনো কিছুই আর চায় না। সব নির্ভর করে নিজের তীব্র ব্যাকুলতার ওপরে। তাছাড়া আমি জানি, মা সব যোগাযোগ করে দেন। যখন যার যা প্রয়োজন, যতটা প্রয়োজন সে ঠিক তাই পায়, ততটুকুই পায়।

যখনই কথা বলবে একটা ভাব নিয়ে বলবে—আর ঘটনাগুলি

হবে ভাবেরই দৃষ্টান্ত স্বরূপ; নইলে কেবল কথা বললে বা গল্প করলে কোন লাভ নেই। যে কথাই বলবে সেগুলি যেন ভাবকে প্রকাশ করবার জন্যই বলা হয়। মূল তত্ত্বটি যেন প্রকাশ পায়। যে ঘটনার ভাবের সংগে যোগ নেই, সত্যের সংগে সম্পর্ক নেই তার কোন মূল্য নেই। জীবনটাকে বড় করতে হলে অবিরাম চেষ্টা করতে হয়। জীবনটা হল "সংগ্রাম অপার"। কেবলই মনে হয়, "করিতে এ ধূলাখেলা অবসান হল বেলা।" একদিন সকলেরই মনে হবে—

"হারাইয়া লাভে মূলে মরণেরি সিন্ধুকূলে
পথশ্রান্ত দেহখানি টানিয়া এনেছি হায়।"

অবশ্য এ কথার অর্থ এখন বুঝবে না। এখন শুনে যাও, যখন সময় হবে তখন এই কথা স্মরণ কোরো। ঠাকুর বলেছেন, 'ব্যাকুলতাই দীক্ষা।' যদি ব্যাকুলতা না আসে, কেবল নিয়ম রক্ষা করার জন্য ঠাকুরকে স্মরণ করে বিশেষ কিছু লাভ হয় না। গতানুগতিক জীবন আমার ভাল লাগে না। নিজের প্রাণে অভাব জাগলে বাইরের বাধা দূর হয়ে যায়; কিন্তু ভিতরে যদি সে ভাব না থাকে, সুযোগ এসে ফিরে যায়।

তোমরা ভালবাসা নিও। চিঠিপত্র লিখতে ইচ্ছা করে না। এখন বিদায়। ইতি—

নগেন

৩১

সারদাধাম

২৭. ৫. ৪৯

স্নেহাস্পদেষু—

তোমার পত্র পেলাম। যদি কোন লোক এক জীবনে একটি সংস্কার ধ্বংস করতে পারেন ও একটি শুভ সংস্কার গঠন করতে পারেন, তবে তিনি মহাপুরুষ। সংস্কার ধ্বংস করার ক্ষমতা হোক্ বা না হোক্, তাকে তো ভুলতে পারা যায়, তার মোড় তো ফিরিয়ে দেওয়া যায়! কঠোর তপস্যা ও নিরবচ্ছিন্ন সাধনা না করলে কোন ভাব স্থায়ী করা যায় না। স্বেচ্ছাকৃত দুঃখবরণ না করলে মনের জোর বেশী হয় না। আগে মনে আনতে হয় অসীম শক্তি। মনের শক্তি অর্জন করলে তবে তো তা অন্য ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা চলে। জীবনের প্রথমে যে কঠোরতা করা চলে, এখন তা সম্ভব না হলেও মনের দিক দিয়ে অনেক কিছু করা যায়। যার তেজ আছে তাকে বলি, লোকটা খুব তেজস্বী। আত্মাই শক্তি। যে যত আত্মাকে চিন্তা করবে সে তত শক্তিমান হবে। অবতারপুরুষ, ইষ্ট, গুরু এঁরা হলেন আত্মস্বরূপ। যারা জড়কে চিন্তা করবে তাদের মন ও বুদ্ধি সবই ম্লান হয়ে যাবে, তারা শক্তিহীন হয়ে পড়বেই।

একটা নিয়ম করে চললেই শক্তি আসে। অযথা লোকের সংগে মিশলে শক্তিহীন হয়ে যেতে হয়। যদি দশ বার ঘণ্টাও ধ্যান জপে কাটাও; আর তারপরে বাজে কথা বল, মিছিমিছি লোকসংগ কর, তবে তোমার সমস্ত শক্তি নষ্ট হয়ে যাবে; তুমি একটুও এগুতে পারবে না। চিন্তা জাগাতে হয়। তা না পারলে জীবন কখনও চলতে

পারে না। এক ধাক্কায় সব ভেঙে চূর্ণ হয়ে যায়। "মনে অন্য চিন্তা আসতে দেব না" এটা যদি দৃঢ় করে ধরা যায়, তবে অন্য চিন্তা আসতেই পারে না। মনকে যত প্রশ্রয় দেবে ততই মন হয়ে যাবে বেয়াড়া, তখন তাকে আর সংযত করা সম্ভব নয়। চিন্তাকে ঘুরিয়ে দিতে পারলেই জীবনটাও ঘুরে যায়।

"We build our thought by thought
For good or bad we know it not,
Yet so the universe is wrought."

(চিন্তা দিয়ে চিন্তা গড়ি
ভাল মন্দ নাহি জানি ;
তবু এইরূপে হয় বিশ্বের গঠন।)

"Thought is another name for fate.
Choose then thy destiny and wait,
For love brings love and hate brings hate.
Thought like an arrow flies where sent,
Aim well, be sure of thy intent
And make thine own environment."

(চিন্তা অদৃষ্টেরই নামান্তর।
নির্বাচিয়া গন্তব্য আপন, রহ প্রতীক্ষায়,
প্রেম হতে প্রেমের উদয়, ঘৃণায় ঘৃণার উদ্ভব।
তীর বেগে ছোটে চিন্তা যেথা লক্ষ্য তব ;
স্থির করি উদ্দেশ্য আপন, লক্ষ্য করি স্থির
সৃষ্টি কর আপনার যোগ্য পরিবেশ।)

চিন্তাই সব। সুসংবদ্ধ চিন্তা হলেই সুস্পষ্ট দর্শন হয়। সমস্ত সাধনা নির্ভর করে যথাযথ চিন্তার উপর। চিন্তাকে সংযত করতে হয়। সক্রিয় চিন্তা অভ্যাস করলে তবে ধ্যান করা যায়। বুদ্ধ বলেছেন—All that we are is the result of what we have thought in the past; it is founded on our thoughts, it is made of our thoughts. (আমাদের বর্তমান অবস্থা অতীত চিন্তার ফলস্বরূপ; ইহা আমাদের চিন্তার উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহা আমাদের চিন্তা থেকেই উৎপন্ন।)

চিন্তার ধারা পর্যবেক্ষণ করাই সাধনা। মনকে সর্বদা উচ্চ চিন্তায় মগ্ন রাখাই তপস্যা ও কঠোরতা। শরীরের কঠোরতা তো সহজ, মনকে উঁচু সুরে বেঁধে রাখতে পারাই কঠোর তপস্যা। চিন্তাতে যেন ঘৃণা, নিন্দা, ঈর্ষা প্রভৃতি না আসে। বাজে চিন্তা তাড়ানো, আর সৎ চিন্তা ধরে রাখার চেষ্টা একটা ভয়ানক তপস্যা। হৈ চৈ করলে এটা পারা যায় না। উচ্চতর বিষয় নিয়ে পাঠ, লেখা, ভাবা ও কথা বলা, এগুলি হচ্ছে উপায় যা দিয়ে আমরা মনকে সদা ব্যাপৃত রাখতে পারি উচ্চ স্তরে। তাঁর দয়া ছাড়া সাধনজীবন হয় না, এটা অতি সত্য কথা; কিন্তু তাঁর দয়া না থাকলে কি আমরা তাঁর নাম করার অধিকারী হতে পারতাম? তাই তো শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন—"কৃপা বাতাস তো বইছেই, তুই পাল তুলে দে।" পাল তুলে দিতে হবে নিজেকেই, আর এইটাই হল সাধনা। বুদ্ধ বলেছেন—"By oneself evil is done, by oneself one suffers; by oneself evil is left undone and by oneself one is purified. Purity and impurity belong to oneself, no one can purify others." (মানুষ নিজেই

পাপ করে এবং সেজন্য নিজেই দুঃখ পায়; আবার সে নিজেই পাপ থেকে বিরত হয় এবং নিজের চেষ্টাতেই পবিত্রতা লাভ করে। পবিত্রতা ও অপবিত্রতা নিজের মধ্যেই বর্তমান; কেউ অন্যকে পবিত্র করতে পারে না।)

গুরু কেবল জ্ঞাপক, কারক নহে। "You yourself must make an effort; the Buddhas are only preachers." (তোমাকেই চেষ্টা করতে হবে, বুদ্ধগণ প্রচারক মাত্র।)

জীবনে ভয়ানক দুঃখ পেতে হয় গুরুকে অবহেলা করলে, ইষ্টকে ভুললে। একবার নাম লেখালে আর রেহাই নেই। গুরুর আশ্রয় পেলে গুরু টেনে নেবেনই। সহজ পথে না গেলে তবে কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে টেনে নেবেন। ইচ্ছা করে তপস্যা না করলে জোর করে তপস্যা করিয়ে নেবেন। গুরুকে স্মরণ করলে, ইষ্টে বিশ্বাস থাকলে কি আর সামান্য কারণে দুঃখ, দুর্বলতা, মান, অভিমান আসে? এই অভিমান হওয়া উচিত যে, আমি তাঁর সন্তানের আশ্রিত, তবুও তাঁকে পাওয়ার জন্যে কিছু করছি না, গুরুর উপর নির্ভর করে ভেসে যেতে পারছি না। সংসার সংসার যতই কর, যখন সাহায্য দরকার হবে তখন সংসার তোমাকে কোনই সাহায্যই করতে পারবে না। গ্যেটে বলেছেন—"সমাজে ও সংসারে বেশী মেলামেশা ভাল নয়, কারণ সমাজ বা সংসার দেয় কম, নেয় বেশী।" তিনি আরও বলেছেন—"যারা সুরুচিসম্পন্ন ও সুশিক্ষিত তারাই বিনা গোলমালে জীবন কাটিয়ে দিতে পারে।" মনে যখনই গোলমাল উপস্থিত হয়, তখনই বুঝতে হবে কোনও ফাঁকে শয়তান মনে প্রবেশ করেছে। যার মধ্যে দোষ নেই সে মানুষ নয়, সে নিশ্চয়ই কপট বা ভণ্ড।

"Man of genius is but a man." (প্রতিভাবান মানুষ, মানুষ বৈ তো নয়।) মানুষ মাত্রই দুর্বল, কাজেই দুর্বলতা মাপকাঠি নয়। যাদের জীবন নেই বা যারা জীবন গড়তে চেষ্টা করে না, তারা কেবলই অন্যের ত্রুটি দেখে। অন্যের ত্রুটি দেখলে নিজের কোন লাভ হয় না। তাই শ্রীরামকৃষ্ণদেব অন্যের ত্রুটি ধরতে বার বার নিষেধ করেছেন। দেখতে হয়, অপরের গুণ, আর দেখতে হয়, নিজের দোষ। দুঃখ করতে হয় এই বলে যে, জীবনটা আমার বিফলে গেল। স্মরণ করতে হয়, "সংসার বিদেশে বিদেশীর বেশে" অকারণ ঘুরে বেড়াচ্ছি। মানুষ যদি নিজের দিকে চেয়ে দেখে, যদি গুরু ইষ্টের প্রতি বিশ্বাস ও ভালবাসা থাকে, তবে মন কখনও সামান্য বিষয় নিয়ে মেতে থাকতে পারে না। মনটা সহজেই ধায় বাইরের দিকে। কিন্তু গুরু আসেন ঊর্ধ্বমুখ করে দিতে। Be a person, develop your personality. He who works with one purpose is a person. (ব্যক্তিত্বশীল হও, ব্যক্তিত্বকে বাড়াও। একটা স্থির উদ্দেশ্য নিয়ে যে কাজ করে সেই প্রকৃত 'ব্যক্তি'।)

মনোরাজ্যে একটা স্থান করতে হয়, যেখানে সংসারের গঞ্জনা, হর্ষ, কোলাহল, যশ, মান, এমন কি সামান্য শব্দও প্রবেশ করতে পারবে না। সেখানে কেবল স্থান আছে হৃদয়-দেবতার। তিনি সেখানে বসে পূজা গ্রহণ করবেন তাঁর ভক্তের। এই চির আরাধ্য দেবতার পদে সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে ধন্য হও। সময়ের চেয়ে কেউ প্রিয় নয়। সময় চলে গেলে আর ফিরে পাওয়া যায় না। সেই প্রিয় সময়কে নষ্ট কোরো না, গুরুকে স্বীকার ক'রে তাঁর বাক্য

অবহেলা করলে মানুষের অশেষ দুঃখ ভোগ করতে হয়। আলস্য ও দীর্ঘসূত্রতা ত্যাগ করে নিয়মিত স্মরণ-মনন দরকার; তার চেয়ে বেশী দরকার মনের বাজে খরচ যাতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা। সংসারে মনের বাজে খরচ হয়। সংসার এমন সব কথা বলে যা গুরু ইষ্টকে ভুলিয়ে দেয়, যা খোঁজায় সুখ ও স্বার্থ, যা জাগিয়ে তোলে মনের পশুত্বকে। যেখানে ঈশ্বরপ্রসংগ হয় সেখানেই স্বর্গ। বাজে কথা বলার চেয়ে মৌন থাকা অনেক ভাল। বই নিয়ে সংগ করলে সকলেরই লাভ হয়। নিজের মনে এই ভাব থাকা দরকার যে, উচ্চ চিন্তা যদি দিতে বা নিতে না পারি, তবে মিশে লাভ নেই। ঈশ্বরপ্রসংগই কল্পতরুর ছায়া। শান্তি যদি চাও, তবে সেই ছায়ায় গিয়ে বস। নতুবা দুঃখ ভোগ করতেই হবে। দুঃখ দিয়ে তিনি তাঁর দিকে টেনে নেন। ঠাকুরের প্রসংগ শোনা ধ্যান ভজনের চেয়ে অনেক বড়। মাষ্টারমশাই বলতেন, সাধনা না থাকলে, কঠোরতা না করলে কোন ভাব স্থায়ী হয় না। দু'দিনেই সব ভেঙে যায়। তাঁর নাম করা, তাঁর প্রসংগ করা, এগুলি খুব বড় সাধন। তাঁর উপর ভালবাসা এলে সব অভিমান, অহংকার ভেসে যায়। নতুবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপার নিয়ে অভিমান বড় হয়ে ওঠে। তাঁর উপর নির্ভর করলে তিনি সব ঠিক করে দেন—"Heaven tempers the wind to shorn lambs." (ছিন্নলোম মেষশাবকদের জন্য ভগবান বায়ুকে নিয়ন্ত্রিত করেন।) ভালবাসা নিও। ইতি—

নগেন

৩২

সারদাধাম

৯. ৬. ৪৯

স্নেহের—

আজ তোমার পত্র পেলাম। খুকুর আরোগ্য সংবাদে সুখী হলাম। তুমি এ পর্যন্ত ভাল আছ জেনে নিশ্চিন্ত হলাম। আমার কাছে কেউ পত্র লিখলে যদি কোন প্রশ্ন বা সমস্যা থাকে সেই পত্রে, তবে সেটা সম্বন্ধে দীর্ঘকাল ধারাবাহিকরূপে চিন্তা চলে। নেপু একখানা পত্র দিয়েছিল কিছুদিন পূর্বে। আমি তার উত্তর দিই, কিন্তু সে সে-পত্রের কোন উত্তর দেয় নি। এখনও সেই সম্বন্ধে চিন্তা চলছে। দু'চার দিন পূর্বে সেই চিন্তার কতকটা পত্রে ব্যক্ত করেছি। এখনও সেটা শেষ হয় নি। আর সে সম্বন্ধে লিখে কষ্ট দেব না। মনটা বড়ই ব্যাকুল হয়েছে। এখন আমি রোজই এই কথাই মনে করি যে, আমি যদি সত্যই তোমাদের সকলকে ভালবাসতে পারতাম তবে তোমরাও ব্যাকুল হতে, তোমরাও জাগ্রত হতে। পুতুলকে ভালবাসলে পুতুলও জাগ্রত হয়—এটা জাপানী ধারণা; তাই তারা কখনও পুতুল ফেলে দেয় না। তোমাদের বলে কিছু লাভ নেই। আমারই ত্রুটি; তাই এজন্য দুঃখ ভোগ করতে হবে আমাকেই। তবে এটা ঠিক, আমি চলে গেলে তোমাদের গাল দেবার লোক আর থাকবে না। কে আর এমন বেহায়া আছে, বেকুব আছে যে, দায়িত্ব মাথায় নিয়ে কষ্ট পায় সারা জীবন? স্বপ্নের পর থেকেই যেন মনে হয় আমি মরে গেছি। আর যেন দুনিয়ার প্রতি কোন আকর্ষণ নেই। বোধ হয় মৃত্যুই হয়ে গেছে। যে ক'দিন জগতের বাতাস টানতে হচ্ছে ও হবে

ততদিন থাকতেই হবে ও জগতের জন্য ভাবতেই হবে। ভাবার আর শেষ নেই। মরে গিয়েও তোমাদের সকলের কথা চিন্তা করতে হবে, যত দিন না তোমরা রামকৃষ্ণগত-প্রাণ হও, যতদিন না তোমরা সব সুখ ফেলে দিয়ে তাঁকে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হও। সকলে ভালবাসা নিও। ইতি—

নগেন

৩৩

ভুবনেশ্বর

২১. ৬. ৪৯

স্নেহাস্পদেষু—

* * * ঠাকুর-স্বামীজীকে জানতে হলে, তাঁদের ধ্যান করতে হলে সবার আগে করতে হবে নিজেকে নমনীয়। নিজেদের সর্বপ্রকার অনমনীয়তা ছুঁড়ে ফেলে দিতে হবে। সংসারের দিক দিয়ে যত খুসী বিচার বিবেচনা কর ; এ রাজ্যে বিচার করে লাভ নেই। বিচার করা উচিত জীবন আরম্ভ করার আগে। যে মন, যে বুদ্ধি, যে চিন্তা দিয়ে সংসারের দশটা কাজ কর বা সংসারের কোন সমস্যা সমাধান কর, সে বুদ্ধি, সে বিদ্যা, সে মন নিয়ে এখানে কিছুই করতে পারা যায় না। সেগুলি বরং তোমাকে ভুলই করাবে। রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃত একটি কথা মনে হচ্ছে—

"ফুলের বনে কে ঢুকেছে
সোনার জহুরি,
নিকষে ঘষয়ে কমল
আ মরি! আ মরি!"

ফুলের বনে নিকষে কমল ঘষা চলে না। জীবনকে গড়ে তুলতে হলে একটি আদর্শ চাই, এবং তদনুরূপ একটি মডেল চাই। সেই আদর্শ অনুযায়ী গড়ার চেষ্টা থাকা দরকার; তবেই লক্ষ্য ঠিক হয়, জীবনের গতিও ঠিক হয়। একটা আদর্শের ছাঁচে ফেলে জীবন গঠনের চেষ্টা করাই সাধনা। একবার ছাঁচ ঠিক হয়ে গেলে সেই মত চলা, ফেরা, কথা, চিন্তা, বুদ্ধি সব অমনি হয়ে যাবে; আর সেইদিক থেকে যা-কিছু ত্যাজ্য ও গ্রাহ্য তাও ঠিক হবে; নতুবা নিজেদের এই মন, এই বুদ্ধি দিয়ে কি কোন বিচার চলে? কি আছে আমাদের? আর বিচার করেই বা কি লাভ? শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের কথা, "যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি, যার কাছে পারি তার কাছে শিখি।" এইভাবে চল, দেখবে, তোমার দৃষ্টি থাকবে কেবল জ্ঞানের দিকে, আর তাতে তুমি লাভবানই হবে। পরের সমালোচনা তো করতে ইচ্ছাই হবে না, নিজের কর্তৃত্ব করতেও সাধ হবে না। লক্ষ্যে দৃষ্টি থাকলে জীবনের ধারাই বদলে যাবে। এক সাধক বলেছেন, তিরিশ বৎসর কঠোর তপস্যা করলাম হৃদয়কে ভগবানের সংগে যুক্ত রাখতে, কিন্তু হৃদয় কিছুতেই তাতে রাজি হয় না; একটু সুবিধা পেলেই বাইরে চলে আসে, আর সর্বদা বাইরে আসার জন্য কাঁদে। যখন ভগবানের কৃপা আমার উপর বর্ষিত হল তখন চলে গেল এই দ্বন্দ্ব; তখন হৃদয় কেবল ভগবৎ-প্রসংগ করতেই আনন্দ পেতে থাকল। যতক্ষণ অভিমান ততক্ষণ সবই আছে। "বায়েজিদ (বস্তাম নিবাসী একজন মুসলমান সাধু) বলেছিলেন, অভিমান ও সুরাপান, এ দুটোর মধ্যে একটিকে বেছে নিতে বললে আমি অভিমানের চেয়ে সুরাপানকেই গ্রহণ করব।" অভিমানে সব নষ্ট হয়। অভিমানে ভালবাসার কণাও থাকে না। এই জন্যই

তো সত্যিকার ভালবাসা হতে চায় না। গভীর ধ্যান, ত্যাগ, সুখে দুঃখে সমান ভাব, এ সব না থাকলে ভালবাসাকে ধরে রাখা চলে না। ভালবাসার সাধনা অন্য রূপ ; তার প্রথম কথাই নিজত্ব লোপ। তাতে আমি বোধই থাকবে না। যখন ভালবাসা জাগবে তখন সব কিছুই ভাল ও সুন্দর বলে বোধ হবে ; তখন ত্যাজ্য গ্রাহ্য কিছু থাকবে না ; তখন আসবে এমন দীনতা যে, মানুষ মাত্রকেই মহৎ বলে মনে হবে। ভালবাসা হৃদয়ের একটা বৃত্তি, সেটা একটা নিরবচ্ছিন্ন ভাব। ভালবাসাকে পেতে হলে নিজের ভিত্তি তৈরি করতে হবে। তার উপায় হল, (১) উদার দৃষ্টি (২) জীবনকে সমগ্রভাবে দেখা (৩) প্রশান্ত-চিত্ততা (৪) অকপট মনোভাব (৫) সরল সহজ জীবন (৬) সকলের প্রতি সমান ব্যবহার (৭) আমিত্বের বিলোপ ইত্যাদি। অদোষ-দর্শী না হলে ভালবাসা হয় না। অন্যের দোষ দেখতে গেলেই নিজেকে বড় করতে হয়। যে মুহূর্তে নিজেকে বড় মনে করবে সেই মুহূর্তেই ভালবাসা পালিয়ে যাবে। ভালবাসা নিও।

ইতি—নগেন

৩৪

সারদাধাম

২১. ৬. ৪৯

স্নেহের—

তোমার পত্র পেলাম। তুমি রোগমুক্ত হলে, এতেই আমার আনন্দ। Illness is a blessing (রোগ আশীর্বাদস্বরূপ), এটা অতি সত্য কথা। শারীরিক কষ্টে কিছু পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়।

জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে মানুষ কত অন্যায় তো করে। অনেকে বুঝতেই পারে না যে, সে অন্যায় করে। রোগ হলে ন্যায় অন্যায় বোঝবার সুবিধা হয়, কারণ রোগ মনকে অন্তর্মুখ করে। শক্তির অন্তরালে যে একটা বিরাট হৃদয় লুকিয়ে থাকতে পারে তা অনেকেই ধরতে পারে না। নিবেদিতার খুব শক্তি ছিল, তাই তিনি স্বামীজীর হৃদয়টা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। সাধারণত শক্তিমান পুরুষের অতবড় হৃদয় দেখা যায় না। আর ম্যাক্‌লিওডের ছিল খুব দয়া ও করুণা, তাই তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন তাঁর শক্তি দেখে। শক্তি ও প্রেম দুটো প্রায় একত্র থাকে না। যাঁদের থাকে তাঁরা মহাপুরুষ। সবাই শরীরের দাস, খেয়ালেরও দাস। এর মধ্যে যদি একটা লোক দেখতে পাওয়া যায় শরীর মন যার দাস, তার কাছে মাথা নত না করে কি কেউ পারে ?

ভুবনদাকে কাল চিরবিদায় দিয়েছি। বিশ বৎসর পাশাপাশি বাস করেছি, সর্বকাজে তাঁকে ডেকেছি, একদিনও কোন ঝগড়াঝাটি হয় নি। একই ভাবে চলেছিল তাঁর সংগে সম্বন্ধ। কাল তা ছিন্ন হয়ে গেল। তিনি চলে গেলেন। তাঁকে অনুসরণ করবার সাধ্য হল না কারো। যাবার সময় এমনি করেই সব চলে যায়। পূর্বে বাবা, মা বাল্যকাল থেকে শিখাতেন, "স্মর নিত্যমনিত্যতাম্"। এখন শেখান, আসক্তি। বিশ বৎসরের সংগী চলে গেলেন। একাই গেলেন কিছুই সংগে গেল না। "রাম নাম সত্য হ্যায় ঔর সব ঝুটা হ্যায়"। কেউ গেলে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আমাদেরও যেতে হবে। ভালবাসা নিও। ইতি—

নগেন

৩৫

সারদাধাম ঃ ভুবনেশ্বর
৩০. ৬. ৪৯

স্নেহের—

তোমার পত্র পেয়েছি। আমার সময় অত্যন্ত কম, তাই পত্র দিতে পারি নি। সেজন্য দুঃখিত হয়ো না। আমি পত্র না লিখলেও প্রতিদিন পাঠের পর তোমাকে মনে মনে পত্র দিয়ে থাকি। "Silence is the best medium for communication." "Soul speaks to soul in silence." (ভাবের আদান প্রদানে নীরবতাই সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম। আত্মায় আত্মায় কথা হয় নীরবতার মধ্য দিয়ে।) কথা মানুষের কান স্পর্শ করে, অন্তরে পৌঁছায় খুব কম। অকথিত বাণীর প্রভাবই বেশী। অবশ্য খুব কম লোকই তা জানে। "Bees will not work except in darkness, thought will not work except in silence, neither will virtue work except in secrecy." (মৌমাছিরা আঁধার ছাড়া কাজ করে না, নীরবতা ভিন্ন চিন্তা জাগ্রত হয় না, গোপনতা ভিন্ন ধর্ম কার্যকরী হয় না।) যেখানে গভীরতা সেখানেই নীরবতা। যৌবনের গাম্ভীর্যকে হারিয়েই মানুষ হয়েছে বাচাল। ধ্যান অর্থ ভিতরে শান্তভাব আনা হৃদয়ের অশান্ত ভাবকে দমন করবার জন্য। যাক সে কথা। আমি জানি তুমি রাগ করবে না। তবে আমারই ত্রুটি, তাই না ব'লে পারি না।

দুঃখ মানুষের নিত্য সংগী ; কিন্তু যদি কোনও উচ্চ আদর্শের জন্য দুঃখ ভোগ করা যায়, ভালবাসার জন্য বা ভগবানের জন্য দুঃখ স্বীকার

করা যায়, তবে জীবন ধন্য হয়। He who suffers for love does not suffer, for all suffering is forgot.

—Eckhart

(যে ভালবাসার জন্য দুঃখকে বরণ করে সে দুঃখ পায় না ; কারণ তার দুঃখ কষ্ট সব ভুল হয়ে যায়।)

যাদের চিন্তা নেই তারাই হৈ চৈ চায়। যাদের মধ্যে প্রেম নেই তাদের উত্তেজনাই সম্বল।

তুমি লিখেছ দোষ শোধরাবার কথা। কার দোষ নেই বলতে পার? যদি তুলনা করা যায়, তবে তোমার স্থান অনেক উপরে, অন্তত আমার চক্ষে। তোমার মত সব দিকে ভাল মেয়ে আমার চোখে পড়ে নি। তা'ছাড়া জেনো ভুলই মানুষকে মানুষ করে। ব্যক্তি হিসাবে বেঁচে থাকতে হলে কতকগুলি ভুলেরও প্রয়োজন আছে। দুঃখ করবার কিছুই নেই। মানুষের দোষ আছে, তাই সে মানুষ। সে অপূর্ণ বলেই সে মানুষ। যদি সে পূর্ণ হত তবে কোথায় থাকত তার ব্যাকুলতা? মানুষজীবনের মাধুর্য হল ব্যাকুলতায়—পাবার আকাংক্ষায়। "কুঁড়ির ভিতরে কাঁদিছে গন্ধ অন্ধ হ'য়ে।" সে বলে, "বেলা যায়, বেলা যায় গো, ফাগুনের বেলা যায়।"

এই যে বেদনা, এই ব্যাকুলতা, এটাই মানব জীবনকে সার্থক ক'রে তোলে। শুধু মানবজীবন কেন, জীবন মাত্রকেই সার্থক ক'রে তোলে।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"ভালবাসা আপনাকে প্রকাশ করবার ব্যাকুলতায় কেবল সত্যকে নয় অলীককে, সংগতকে নয় অসংগতকে

আশ্রয় ক'রে থাকে।" মানুষ নিজেকে প্রকাশ করতে চায়। ব্যাকুলতাই প্রকাশের বেদনা—তীব্র বেদনা; আর এটাই poetry of life (জীবনের কাব্যরস), অবশ্য যদি কোনও স্বার্থ না থাকে। মানুষ স্বার্থ নিয়েই আছে, তাই তার মন হয়ে যায় ক্ষুদ্র। যে ক্ষুদ্র সে জীবনটাকে উপভোগ করতে পারে না। যার উদারতা আছে, যে নিজেকে একটু পৃথক্ ক'রে রাখতে পারে স্বার্থ হ'তে, সংসার হ'তে সেই পারে জীবন নাট্যের মাধুর্য আস্বাদ করতে।

"আপনা হইতে বাহির হইয়া বাহিরে দাঁড়া।
বুকের মাঝে বিশ্ব লোকের পাবি সাড়া॥"

একটু বাইরে আসতে পারলে—তবেই নিজেকে ও জগৎকে জানবার সুবিধা হয়। নতুবা দেখবার ইচ্ছাই হয় না। আর যদি জানবার ইচ্ছাও হয়, তবু দৃষ্টি সীমাবদ্ধ থাকে—সত্যকে দেখতে পারা যায় না।

"মুক্ত কর মোর সুপ্ত,
মোহমুগ্ধ আত্মার পরাণ।"

মুক্তি পেলে তবে জাগে পিপাসা। যেই পিপাসা জেগে গেল, অমনি এল জীবনের যত তত্ত্ব, যত রস—সুর, সংগীত সব। পিপাসাই রস খোঁজায়। আমরা সবাই শূন্য পাত্র নিয়ে এ জগতে এসেছি। পিপাসা যেই জাগল অমনি মানুষ চলল দুনিয়ার সব কিছু জানতে, পেতে ও নিজের শূন্যতাকে পূর্ণ করতে। পিপাসাই মানুষকে মানুষ থেকে পৃথক করেছে। যার যত পিপাসা সে তত বড়লোক। সুখে মানুষ ভুলে যায় সব, সহজে মোহগ্রস্ত হয়; তাই পিপাসাও তার থাকে না বললেই চলে। কিন্তু দুঃখ তাকে অনেক কিছু খোঁজায়—

সে কেবল অনুসন্ধান করে এমন কিছু যা পেলে তার দুঃখের চির নিবৃত্তি হয়। কিন্তু খোঁজারও শেষ হয় না, আর পাওয়ারও শেষ হয় না। প্রতি পদে পাওয়া ও হারানো একই সংগে চলে। এই ক'রে চলে সে পূর্ণতার দিকে। দুঃখকে কাজে লাগানোই জীবনের সার্থকতা। দুঃখেই তার নূতন চোখ হয়, আর মানস নেত্রে সে বিশ্ব ছেড়ে বিশ্বাতীত ক্ষেত্রে বিচরণ করে।

"চোখের জলের লাগলো জোয়ার
দুখের পারাবারে।
কানায় কানায় হলো কানাকানি
এইপারে ঐ পারে॥
আমার তরী ছিল চেনার কূলে, বাঁধন তাহার গেল খুলে
তারে হাওয়ায় হাওয়ায় নিয়ে গেল
কোন অচেনার ধারে।"

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল, আঁধারের প্রেম তনু-মনকে আবৃত করল। আলো যে দিকে অস্ত যাচ্ছে সেই দুয়ার খোল, আর সান্ধ্য আকাশের মত বিস্তৃত অন্ধকারের প্রেমে নিমগ্ন হও। চিত্ত-শতদল রাত্রির রস পান করুক। মনে লাগুক অতল কালোর প্রেমলহরী। আঁধার সমুদ্রে ফুটে উঠুক অপরূপ রূপ।

যতবার পত্র লিখতে বসেছি ততবারই বাধা প্রাপ্ত হয়েছি; তাই পত্রে কোনও খেই নেই। আমি জানি তুমি আমার দোষ গ্রহণ করবে না। তবে এটা আমার কৈফিয়ৎ নয়। শরীর অসুস্থ। ভালবাসা নিও। ইতি—

নগেন

পুঃ— কাল ছিল ৪ঠা জুলাই—স্বামীজীর মহানির্বাণের দিন। সমস্ত দিনই স্বামীজীর চিন্তা, পাঠ ও আলোচনায় কেটেছে। তখন তোমাদের অভাব খুব অনুভব করেছি। ইতি—

নগেন

৩৬

সারদাধাম

৬. ৭. ৪৯

শ্রীচরণেষু—

প্রণামান্তে নিবেদন এই, আপনার পত্র পেয়েছি। ভুবনদা'র দেহত্যাগে মনটায় খুব আঘাত লেগেছে। মনে হয়, দেহ ও গেহ সবই ছেড়ে যাত্রা করতে হবে একদিন না একদিন। ইচ্ছা না থাকলেও যম ছাড়বে না। সে-লোকে যাবার পাথেয়-সঞ্চয় কতটা করেছি সেটাও ভাবনায় আসে। এ জগতে সবই মিথ্যা—একমাত্র সত্য মৃত্যু। "কৌন লোকসে আয়া হ্যায় হন্‌সা, উতরেগা কৌন ঘাট।" (কোথা হতে আসি মোরা কোথা চলে যাই ?) সেটা কেউ ভাবে না। কার যে কখন সময় হবে তা কেউ জানে না। যেতে হবেই, কাজেই যাবার পাথেয় সংগ্রহ না করলে বড়ই কষ্ট। এ জীবনে দুঃখ তো নিত্যই ভোগ করতে হয়, এর পরও যদি দুঃখভোগ করতে হয়, তবে বড়ই দুঃখের বিষয়। * * * চিরকাল মানুষকে ভালবেসে এসেছি, মানুষের সেবা করে এসেছি। আমার জীবনের আদর্শ ছিল—

"মানুষ আমার ভাই, বড় প্রিয়ধন,
মানুষ-মংগল সদা করি আকিঞ্চন;

জন্মেছি মানুষ অংগে, বেড়েছি মানুষ সংগে,
মানুষের সম্মুখেই হইবে মরণ ;
মানুষেরি খাই পরি, মানুষেরি কর্ম্ম করি
মানুষেরি তরে মোরা ধরেছি জীবন।"

তাই একজন মানুষ চলে গেলে বড় কষ্ট লাগে। যিনি চলে যান, তিনি হয়ত শান্তিতেই থাকেন ; কিন্তু যারা এখানে থাকে, দুঃখ পায় তারাই। ভগবানের চরণে এই প্রার্থনা—

"বীর্য দেহ, তোমার চরণে পাতি শির
অহর্নিশ আপনারে রাখিবারে স্থির।"

সবই মা'র ইচ্ছা। আমরা ক্ষুদ্র মানব। আমাদের তাঁর কাজ বুঝবার কোন ক্ষমতা নেই। তিনিই জানেন তাঁর কি ইচ্ছা। আমরা অন্ধের মত তাঁর ইচ্ছায় উঠি বসি। মানুষ যতই জ্ঞানের বড়াই করুক, যবনিকার অন্তরালে যে কি আছে তা সে কিছুতেই নির্ণয় করতে পারে না। মানুষের সকল দর্প, সকল অহংকার নিমেষে ভেঙে যায় কালের করাল স্পর্শে। যুগ যুগান্তরের সঞ্চিত আশা এক মুহূর্তে লুপ্ত হয়ে যায় বিস্মৃতির অতল তলে। মৃত্যু সকলেরই একদিন আসবে, আর যার যে-ভাবে মৃত্যু হবে তাও নির্ধারিত হয়ে আছে পূর্ব হতেই। তবুও মানুষ মৃত্যু কামনা করে না। কিন্তু মৃত্যুকে বন্ধুভাবে আলিংগন করার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত।

"হে মরণ, তুঁহু মম শ্যাম সমান" একথা বলে মৃত্যুকে আলিংগন করার চেয়ে সুখের কল্পনা আর নেই। মৃত্যুতেই সর্বশান্তি। মৃত্যুর দিকে সকলেই ছুটছে। ইহাই বিশ্বরূপ দর্শনের শিক্ষা।

কবি গেয়েছেন—

"মরণ, আমার মরণ, কও আমারে কথা
যা পেয়েছি, যা হয়েছি, যা কিছু মোর আশা,
না জেনে ধায় তোমার পানে সকল ভালবাসা।"

মানুষ দুনিয়াতে রেখে যায় সবই, কেবল নিয়ে যায় নিজের কর্ম-সংস্কার। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, জীবনে মানুষ এ সত্য ভুলে থাকে।

আর কিছু লিখবার নেই। আমার প্রণাম গ্রহণ করবেন। ইতি—

প্রণত নগেন

৩৭

সারদাধাম ঃ ভুবনেশ্বর
৩. ৯. ৪৯

স্নেহের—

তোমার পত্র পেয়েছি, কিন্তু সময় করে উঠতে পারিনি তোমার চিঠির জবাব দিবার। জানি তুমি দুঃখিত হবে না। তবুও আমার যে অপরাধ হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে একটা কৈফিয়ৎ আছে। সেটা এই যে, তোমাকে মনে মনে অনেক পত্র লিখেছি তোমার পত্রের উত্তরস্বরূপ, যদিও কাগজে কলমে তা হয়ে ওঠে নি।

সংসার কঠিন স্থান। এখানে কেউ কোনদিন সুখে থাকতে পারে নি। যার প্রথম জীবনে দুঃখ কম তাকে শেষ জীবনে দুঃখ পেতে হয়েছে। এখানে নেয় বেশী, দেয় কম। যে কাজ করে তার আর কাজের শেষ নেই, যে কাজ করে না তাকে কেউ কিছুই বলে না। তবে তোমরা মেয়েমানুষ, ভগবানের ধৈর্য ও করুণার মূর্তি—জীবন্ত

বিগ্রহ ; তাই শত দুঃখেও তোমাদের অন্তরের ভালবাসা, স্নেহ, মমতা, সেবা এ সব নষ্ট হয় না বা লুপ্ত হয় না। একটা কথা আছে—"The devil could drive woman out of paradise, but the devil himself could not drive paradise out of a woman." (শয়তান নারীকে স্বর্গরাজ্য হতে বিচ্যুত করতে পেরেছিল, কিন্তু নারীর হৃদয় থেকে স্বর্গকে বিতাড়িত করতে পারে নি।)

তুমি কি তা জানবার আমার সুযোগ হয়েছে। আমি জানি, তুমি মহৎ, তবে তোমার আত্মবিকাশের সুবিধা হচ্ছে না ; তাই লোকে তোমাকে বুঝতে পারে না। সংসার নিজের সুখ, সুবিধা ও স্বার্থ নিয়ে থাকে। 'আমি' হ'ল সংসারের কেন্দ্র। তাই সেখানে আমি ছাড়া কিছুই থাকতে পারে না। "To world wisdom is a folly and to wisdom world is a folly." (দুনিয়ার নিকট 'জ্ঞান' মানেই বোকামী, আর 'জ্ঞানে'র কাছে দুনিয়াটা অসার।)

দান করে যাও, মন শান্ত হবে। দান কি জান? কারো প্রতি দ্রোহ না করা—ধনার্পণ নয়। ধন কি? ধর্মই ধন। সব অবস্থায় ধর্মকে আঁকড়ে ধরে থাকবে, তাকে ছাড়বে না। সে তোমার সংগে মৃত্যুর পরও অনুগমন করবে। অন্য কেউ তা করবে না।

দক্ষিণা না দিলে পূজা হয় না। দক্ষিণা কি জান? দক্ষিণা হল, জ্ঞানোপদেশ ; যে জ্ঞান তুমি লাভ করেছ সেই জ্ঞান তুমি দক্ষিণাস্বরূপ অন্যকে দান কর।

সুখ চাও? সুখ কি জান? সুখ হল, সুখকে অনুসন্ধান

না করা। মূর্খ হয়ো না ; মূর্খ সে যে দেহে ও গৃহে অভিমানী। দারিদ্র্য ত্যাগ কর। দরিদ্র কে? যে অসন্তুষ্ট সেই দরিদ্র। সময় কম, এখন বিদায় নিচ্ছি। আমি তোমার কথা যে চিন্তা করি, সে আমার কৃতিত্ব নয় ; তুমি চিন্তা করিয়ে নাও তাই চিন্তা করতে হয়। তোমরা সকলে ভালবাসা নিও। ইতি—

নগেন

৩৮

সারদাধাম

৪. ১২. ৪৯

স্নেহাস্পদেষু—

তোমার পত্র পেয়েছি। আমার শরীর অসুস্থ ছিল, তাই পত্র দিতে পারি নি। আর পত্র লিখতে ইচ্ছা করে না। ভাল কথা তো অনেক শুনেছ। কাজেই সে সম্বন্ধে আলোচনা মানে বৃথা সময় নষ্ট করা। যা পার করে যাও। টলস্টয় খ্রীষ্টান, সে কথা ভুলো না। কাজেই তাঁর মতে "Man is vile. He is born in sin and inequity" (মানুষ পাপী—পাপ ও অন্যায়ের মধ্যেই তার জন্ম।) টলস্টয় একজন মহাপুরুষ ; কিন্তু তাঁর কথা নিতে পারি না। "Man is not flesh. He is spirit and as such he is divine. He is a spark of that divine fire which illuminates the whole universe." (মানুষ শরীর নয়। সে আত্মা, সুতরাং অমৃতস্বরূপ। সে সেই দিব্য জ্যোতির স্ফুলিংগ যা আলোকিত করে নিখিল বিশ্বকে।) দুর্বল ব্যক্তি কখনও সত্য লাভ করতে পারে না।

দুর্বলতাই সবচেয়ে বড় পাপ। সর্বদা মনে করবে, "আমি কি মার আটাশে ছেলে ?" আমি ব্রহ্মময়ীর পুত্র।

"আমি দুর্গা দুর্গা বলে যদি মরি,
আখেরে এ দীনে না তার কেমনে জানা যাবে গো শংকরী।"

যে দীনতা দেখাচ্ছ, ওটা দীনতা নয়। ওরূপ ভাবলে গুরু, ইষ্ট ও ভগবানকে অবমাননা করা হয়। তুমি মুখে পতিত পতিত বলছ বটে, কিন্তু পতিত বলে ধারণা বস্তুত তোমার নেই। যে মুহূর্তে সে ধারণা হবে, সেই মুহূর্তেই পতিতপাবন কৃপা করবেন। যে দিন নিজেকে দীন মনে করবে, সে দিন দীনবন্ধু তোমাকে বুকে টেনে নেবেন। আশাভংগ হওয়া, আর দীন বা পতিত ভাবা এক কথা নয়। একটা পথ ধর। যদি পতিত ভাবতে চাও তো নিজেকে ছেড়ে দাও— যেখানে টেনে নিয়ে যায়। যে পতিত তার কিছু দাবী আছে কি ? সে জানে যে, সে ঘৃণ্য, তার কিছু নেই, কেউ নেই। আমি ধারণা করতে পারি না, যার দীক্ষা হয়েছে সে এত দুর্বল কি করে হতে পারে ? সে কি করে এক মুহূর্তের তরেও নিজেকে হীন মনে করতে পারে ? পতিত পতিত বললেই পতিত হয় না। ওরূপ বলা মনের একটা রোগ। যখন মানুষের মনে দুর্বলতা আসে, অথচ একটু ধর্ম করবার ইচ্ছাও থাকে, তখন সে ঐরূপ কথা বলে ; নতুবা ঐ কথার কোনও মূল্য নেই। আধ্যাত্মিক জীবন পতিতের পক্ষে নয়। সে যে জন্য নিজেকে পতিত ভাবে, তা থেকে আগে উদ্ধার পাক, আর পবিত্র হোক। আধ্যাত্মিক রাজ্য তার পরের কথা। পতিত পতিত বলে বেশী দূর এগিয়ে যেতে পারবে না। মানুষের মন তাতে কখনও সায় দেয় না। মানুষ মানেই আত্মা। আত্মা কখনও পতিত হয় না। তুমি

জীবনে হতাশ হয়েছ, পতিত হও নি। মনের মধ্যে ঝড় যাচ্ছে নিজের পার্থিব জীবনের ব্যর্থতার জন্য। আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করতে হলে চাই মনের শান্ত অবস্থা। একটা অবস্থা আছে, যাকে বলে সংসার-ক্লান্তি। এটা একপ্রকার মানসিক অবসাদ। এতে মানুষকে দুর্বল করে; আধ্যাত্মিকতা দূরের কথা মনুষ্যত্বই নষ্ট করে দেয়। মনুষ্যত্ব না এলে আধ্যাত্মিকতা অর্থহীন। আগে কামনা বাসনাগুলো কিছু ভোগ করে নাও। জীবন-সংগ্রামে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াও। তারপর আধ্যাত্মিকতার কথা বোলো। তোমার মত আহাম্মক কি আর একজন আছে? আমি তোমার ওপর রাগ করতে বা বিরক্ত হতে পারি কি? তোমার গুরু আছেন; তবুও তুমি আমার কাছে এই সব কথা লেখ! গুরুকে জানাও। এলোমেলো পড়াশোনায় চিন্তার জীবন নষ্ট হয়; আধ্যাত্মিক জীবন তো নষ্ট হয়ই। একটা ধারাবাহিক পড়াশোনা করলে চিন্তাশক্তি জাগে, বুদ্ধিবৃত্তি দৃঢ় হয়, সত্যকে ধারণা করবার ক্ষমতা জন্মে। বন্ধন ও মুক্তি দু'টা একজনেরই দান। তাঁর ইচ্ছা হলে বন্ধনে রাখবেন, ইচ্ছা হলে মুক্তি দেবেন। এতে কিছুই যায় আসে না। যাঁর বন্ধন তাঁরই মুক্তি। দুটোই সমান আমার কাছে। আমি বন্ধনও চাই না, মুক্তিও চাই না। আমি যেন তাঁকে ডেকে যেতে পারি; আর কিছুই চাই না। ক্ষুধা ও তৃষ্ণা যেমন স্বাভাবিক তেমনি যেন আমার ক্ষুধা ও তৃষ্ণা জাগে ভগবানের প্রতি।

পূর্বে যে বলেছি (অনুভূতির কথা) তা এখন ছেলেমানুষি মনে হয়। ওর কোন মূল্যই নেই। সমস্ত মন প্রাণ যেন তাঁর চিন্তায় বিভোর থাকে, সমস্ত কর্ম যেন তাঁরই কর্ম মনে করতে পারি।

সবই তাঁর, আর সবই তিনি—এই বিশ্বাস যেন দৃঢ় হয়; আর কিছু চাই না। কেবল তাঁকে যেন নিয়ত স্মরণ করে যেতে পারি। আমার মন-প্রাণ সবই যেন তাঁর নামসুধা পানে মত্ত থাকে। তাঁরই সেবায় তাঁরই প্রসংগ করতে করতে যেন আমার জীবন শেষ হয়। "Knock and the door will be opened unto you. Ask and you will be given. Seek and you will find it."

—Christ

(আঘাত কর, তবেই তোমার জন্য দ্বার উন্মুক্ত হবে। চাও, তবেই পাবে। অনুসন্ধান কর, অভিলষিত দ্রব্যের সন্ধান মিলবে।) ঠিক ঠিক চাওয়া হলেই পাওয়া যায়। কি চাই সেটা জানা নেই; সুতরাং পাবার কথা আসতেই পারে না। কি চাই আগে ঠিক কর। কি চাও, সে সম্বন্ধে তোমার সুস্পষ্ট ধারণা থাকা চাই। অভাব চিরদিনই পূর্ণ হয়, বাসনা পূর্ণ হয় না। অভাব জাগানোই সাধনা। আর বেশী কিছু লিখবার নেই। কঠোরতা ছাড়া সাধনা হয় না। To be cheerful when circumstances are depressing or when we are tempted to indulge in self-pity, is a real mortification. It is through prayer that man comes to the unitive knowledge of God. The life of prayer is also a life of mortification—of dying to self. (যখন আমরা এমন অবস্থায় পড়ি যে, মন অবসন্ন হয়ে পড়ে, অথবা যখন আমার নিজেকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হয়, সেই অবস্থাতেও প্রফুল্ল থাকা হচ্ছে সত্যিকার কঠোরতা। প্রার্থনা দ্বারাই মানুষ বুঝতে পারে, ভগবান এক। প্রার্থনার জীবনও তিতিক্ষা

ও আত্মবিলোপের জীবন।) একটা ভাবধারা নিয়ে পড়ে থাক। যখন যে বিষয় ইচ্ছা তখনই সেই বিষয় পড়লে জীবন তৈরি হয় না। একটা স্থির ভাব নিয়ে পড়াশুনা করলে তবে পড়া থেকে সাহায্য পাওয়া যায়, আর জীবনপথে চলাও সম্ভব হয়। আর কিছু লিখবার নেই। ভালবাসা নিও। ইতি—

নগেন

৩৯

সারদাধাম

২৯. ১. ৫০

স্নেহের—

তোমার পত্র পেলাম। তোমার প্রেরণা তোমার মধ্যেই ছিল, এখন প্রকাশ পেয়েছে মাত্র। ভিতরে ঠাকুর না থাকলে কি বাইরে থেকে ভিতরে ঢুকান যায়? কথায় আছে, রাধার অন্তরেই শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন। রাধার ইচ্ছা হল শ্রীকৃষ্ণকে বাইরে দেখবার; তাই তিনি শ্রীকৃষ্ণের জন্যে এত উতলা হয়েছিলেন। অন্তরের জিনিষই বাইরে দেখতে পাওয়া যায়। তখন অন্তরে ও বাইরে দুই রূপে দেখা যায়। আরশির সামনে মুখ দেখা নিজেরই প্রতিবিম্ব দেখা—নিজ থেকে ভিন্ন নয়, অথচ একও নয়। ভিতর ও বাইরের এই সম্বন্ধই সমস্ত জাগতিক ব্যাপারের মূলে। যে জানে সে আনন্দ পায়। আর যে জানে না সে আনন্দও পায় (অজ্ঞাতে), দুঃখও পায়, অশান্তিও ভোগ করে। আমার শরীর একটু অসুস্থ হয়েছে বটে,

তবে মনটা সুস্থই আছে। জগন্মাতা নানা রূপ ধরে মানুষকে কৃপা করেন, আশীর্বাদ করেন। রোগ, শোক, দুঃখ প্রভৃতি তাঁরই বিভিন্ন প্রকাশ; আবার তিনিই পিতা, মাতা, বন্ধু, ভগিনী, ভাই, শত্রু, মিত্র প্রভৃতি রূপ ধরে এসে মানুষকে কৃপা করেন। যে ভাবেই আসুন, আর যে রূপেই আসুন না কেন, তিনি সর্ব অবস্থায় করেন মানুষের কল্যাণ। জীবনের লক্ষ্য স্থির থাকলে তবেই এ কথা মানুষ বুঝতে পারে। দেবীমূর্তি ধরে মা কৃপা করেন মাঝে মাঝে। নিশা অবসানে তাঁকে স্মরণ করে যখন ব্যাকুল হয়ে ডাকি তখন মা আমার এক শান্ত মূর্তিতে, প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে, ধীর পদ-বিক্ষেপে এসে উপস্থিত হন আমার সামনে। তখন যেন চিন্তা ও বাস্তবের ভেদ ঘুচে যায়। চিন্তাই দেহ পরিগ্রহ করে সামনে এসে দাঁড়ায়, আবার বাস্তবও বাস্তবতা ছেড়ে মিলিয়ে যায় কল্পনার মধ্যে। সেই যে অপূর্ব আনন্দ, অপার শান্তি, তা ব্যক্ত করবার ভাষা আমার নেই। বহু দিনের অশ্রুপাতের পর বহু দুঃখ দিয়ে আজও মা দেবীমূর্তি ধরে আনন্দ দিয়ে গেলেন। আনন্দসাগরে সব বিলীন হয়ে গেল, রূপ অরূপে মিশে গেল; কিন্তু আনন্দপ্রবাহ চলতেই থাকল। সেই দেবীকে প্রতিদিন স্মরণ করি, প্রতিদিন তাঁর পদে প্রণতি জানাই। ভালবাসা, করুণা, ধৈর্য, সহানুভূতি যেন জমাট হয়ে দেবীমূর্তি ধারণ করে আমার অন্তরকে বিকশিত করবার জন্য। সেই দেবীকে প্রণাম। সেই দেবীর সন্ধান পাও কি নিজের মধ্যে? হৃদয়ের মাঝে তাঁর রূপ দেখে ধন্য কর জীবন। সমস্ত অন্তর দিয়ে সেই দেবীর পায়ে নতি জানাও। তিনি যখন ভিতর থেকে তোমার শরীর মনে বিকশিত হয়ে উঠবেন, তখন তোমারও চরণে

অন্যে নতি জানাবে। তুমি আমার স্নেহ, ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও প্রণাম গ্রহণ কর। তোমার মনের এই অবস্থা যেন ঠিক থাকে। এগিয়ে চল। ইতি—

নগেন

৪০

সারদাধাম ঃ ভুবনেশ্বর
১৮. ২. ৫০

স্নেহাস্পদেষু—

তোমার পত্র পেলাম। শিবরাত্রি বেশ ভালভাবেই কাটল। * * * কি চাই সেটা ঠিক হলে, তবেই বোঝা যায় কি করা উচিত। চাওয়া ঠিক হলে পাওয়াও ঠিক ঠিক হয়। একটা জীবনকে জাগ্রত করতে হলে মনের কঠোর সংগ্রাম চাই। কুড়ি পঁচিশ বৎসর ক্রমাগত লড়াই করে তবে একটি ভাব স্থায়ী করেছিলেন ঠাকুরের সন্তানেরা ; কাজেই আমাদের একটা ভাব পেতে কত না তপস্যার দরকার। মনের বাজে খরচ হলেই শক্তি নষ্ট হয়ে যায়। পথে চলতে চলতে যদি থেমে যাওয়া যায়, তবে আর শেষ পর্যন্ত পৌঁছান যায় না। থেমে গেলেই বড় কষ্ট। শেষে আর যেন পথ পাওয়া যায় না। দার্শনিক হলে তবে সুবিধা হয়। নিজে দার্শনিক না হলে দর্শনশাস্ত্র বোঝা যায় না। দার্শনিক হতে হলে অনেক চিন্তা দরকার। দার্শনিক চিন্তা হলে তবেই মনের অংকট বংকট কেটে যায়, মন সোজা পথে চলতে থাকে ; নতুবা দুঃখ পেতেই হয়। হয়তো এমন দুঃখ পেতে হয় যার কোন প্রতিকার থাকে না ; আর এমন সময় দুঃখ আসে যখন তাকে কাজে

লাগানো চলে না—দুঃখ পাওয়াই সার হয়। দীক্ষার পর হতে ব্যাকুলতা বেড়ে যাওয়া উচিত ; তা না হলে বুঝতে হবে পথে চলা ঠিক ঠিক হচ্ছে না। দীক্ষার পর অনেকেরই মস্ত একটা অবসাদ আসে। লক্ষের মধ্যে দু' একজনই সেই অবসাদ কাটিয়ে উঠতে পারে ; বাকি সব ওখানেই শুয়ে পড়ে। তখন চলে গতানুগতিক জীবন। আগে ধর্মজীবন চাই, তারপর আসে আধ্যাত্মিক জীবন। ধর্মজীবনের জন্যই কারও স্পৃহা নেই, আধ্যাত্মিকতা তো বহু দূরে। নিজের কোন সুখস্পৃহা থাকলে, পার্থিব বস্তুর উপর টান থাকলে মনের গতি বন্ধ হয়ে যায়। ধর্মজীবনের পরিণতি হয় ভালবাসাতে। সে বহু সাধনার ফল। মানুষ মনে করে ভালবাসা সহজ ; প্রকৃতপক্ষে তা নয়। যার হৃদয়ে ভালবাসা আসে সে হয় সমদর্শী। তার আত্মপর থাকে না, অভিমান থাকে না, দুঃখ থাকে না, চাওয়া পাওয়া থাকে না। সে থাকে বিভোর। এ ভালবাসা সংসারে একমাত্র সম্ভব মায়ের—মায়ের সন্তানের প্রতি ভালবাসা। সন্তান বড় হলে আবার বাসনা এসে, আশা এসে সে ভালবাসাকে আবৃত করে। উচ্চ আদর্শকে শক্ত করে ধরলে, তপস্যা থাকলে, আর বিশেষ কৃপা প্রাপ্ত হলে, তবে অন্যের প্রতি ভালবাসা হতে পারে। তারপর আধ্যাত্মিকতা যখন আসে তখন হয় প্রেম। সমস্ত অর্পণ করলে তবে প্রেম লাভ হয়। জীবন চালান বড় শক্ত। একটু চলেই সব চলা বন্ধ হয়ে যায় ; তাই "অধীনতা" দরকার। পুরুষ একটু চলেই আর চলতে পারে না। সে নানাদিকে মনকে বিক্ষিপ্ত করে ফেলে। মেয়েরা দু' চারদিন চলে, তারপর স্থাণুর মত অচল হয়ে বসে থাকে। আর চলার নামটি পর্যন্ত মনে হয় না। সংসার-ভাব সম্পূর্ণ ত্যাগ করতে পারলে তবে হৃদয়ে ভালবাসা আসে ; নতুবা

আসে আসক্তি, ভালবাসা নয়। তাই সংসারে কষ্ট পেতে হয়। ভালবাসায় মানুষ হয়ে যায় নীরব। ভালবাসার প্রকাশ যেখানে যত বেশী সেখানে ভালবাসা তত কম। একজন বলতেন, ভালবাসা যদি মানুষ টের পেল, তবে আর ভালবাসলাম কি? ভালবাসা নিজেও টের পাব না, যাকে ভালবাসি সেও টের পাবে না, অন্যেও টের পাবে না। ভালবাসা সম্ভব কেবল ইষ্টের প্রতি, মানুষের প্রতি ভালবাসা হয় না; তাই নিজেকে অনেকটা গুটিয়ে নিতে হয় নিজের মনে ভালবাসা জাগাতে হলে। মানুষের নীরব প্রভাব বড় ভয়ানক। কেউ যদি নানা লোকের সংগে মেশে, তবে তাদের অভ্যন্তরীণ স্বভাবের প্রভাব তার মনের মধ্যে ছাপ দিয়ে যায় ও অজ্ঞাতসারে একটা tendency create (প্রবণতা সৃষ্টি) করে; সে আবার যার সংগে মেশে তার মনে অজ্ঞাতসারে (জ্ঞাতসারে যেটা হয় সেটা তো জানাই যায়) অনুরূপ প্রবণতা জাগিয়ে তোলে। এই করে সংগগুণে মানুষের জীবনে ইষ্ট অনিষ্ট দুই-ই হয়। সংসারের প্রভাব, বাবা মার প্রভাব, চারিদিকের প্রভাব, সংগের প্রভাব ও নিজের কর্ম, এইসব ঠেলে জীবনকে গড়ে তোলা যে কি শক্ত তা যে চেষ্টা করে সেই বোঝে। আধ্যাত্মিক জীবনে আড্ডা ভয়ানক জিনিষ। একজন মহাপুরুষ তাই বলেছেন, বরং ঘুমিয়ে কাটাবি, তবুও আড্ডা দিবি না। আধ্যাত্মিক জীবন নিয়ে থাকতে হলে প্রথমেই চাই দীর্ঘদিন কঠোর তপস্যা, মুখ বন্ধ করা ও লোকসংগ থেকে দূরে থাকা। সংগে যে ছাপ মনে আসে তা আর যেতে চায় না। দয়া মায়া, ভক্তি শ্রদ্ধা সবই মুখোস; মানুষের প্রভাবই প্রবল, তাই একাকী চলতে হবে। যেখানে গেলে একটা উচ্চ জীবনের প্রেরণা পাওয়া

সম্ভব সেখানেই যেতে হয়। যেখানে গেলে বা যার সংগে মিশলে মনটা বিক্ষিপ্ত হয়ে যায় সেখান থেকে দূরে থাকতে হয়। যীশু খৃষ্টের কথা স্মরণ কর, "You are to answer for every word you speak." (তোমাকে তোমার প্রত্যেক কথাটির জন্য কৈফিয়ৎ দিতে হবে)। অভিমান মুছে ফেললে তবে মনে শান্তি আসবে। জগৎ তোমার মত হবে না। জগৎকে ছেড়ে দিতে হবে তার মত চলতে। ভালবাসার একটি কণা যদি হৃদয়ে আসে তবে মান, অভিমান, দুঃখ, ঈর্ষা সব ভেসে যায়। এইটাই পরীক্ষা। নিজেকে পরীক্ষা করে দেখ, নিজের মনকে বিশ্লেষণ কর, আর সদা স্মরণ কর, "কি চাই? যা চাই তার জন্যে কি করি? যার সংগে বিনা প্রয়োজনে মিশি তার কাছে কি পাই? তা কি তোমাকে জীবনের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়?" মান অভিমান প্রভৃতি যদি দুঃখরূপে, শত্রুরূপে, বেদনারূপে আসে, তবে বেশী ক্ষতি করতে পারে না। বন্ধুরূপে, সুখরূপে এলেই বেশী অনিষ্ট করতে পারে; কারণ তখন আর বিচার বুদ্ধি থাকে না। তখন মানুষ হয়ে যায় বুদ্ধিহীন, বিচারহীন। দুঃখ করে কোন লাভ নেই। "Thine is the hand that holds the rope that drags thee on." (তুমি নিজের হাতেই ধরে আছ সেই রজ্জু যা তোমাকে আকর্ষণ করছে।) যা চাও তা শক্ত করে ধর, তবেই সংসার ও আসক্তি ছুটে যাবে, নতুবা খুবই কষ্ট পেতে হবে।

"ঈশ্বর-প্রত্যয় একমাত্র আশ্রয় সংসারে;
সে প্রত্যয় জীবনের ধ্রুবতারা যার,
কূল পায় এ দুস্তরে লক্ষ্য রাখি তাঁয়॥"

মনের ছলনা ধরতে পারলে তবেই দুঃখ থেকে রেহাই পাবে। আর যদি মনের ছলনার সংগে সায় দাও, তবে দুঃখ বেশী হবে, বিপদ বেশী হবে; মায়ামৃগের মত তোমাকে টেনে এমন স্থানে নিয়ে যাবে যে, তোমার সব যাবে; তুমি দুঃখে দুঃখে সারা হবে। নিজের মনকে বিশ্লেষণ কর, নিজের জীবনের গতি লক্ষ্য কর, নিজের মনকে শিক্ষিত কর, নিজেকে আগে বুঝতে চেষ্টা কর, তবেই চলা সহজ হবে। তখন দুনিয়াতে তামাসা দেখার মত আনন্দ করতে করতে চলতে পারবে। আর কিছু লেখবার নেই। ভালবাসা নিও। ইতি—

নগেন

৪১

সারদাধাম : ভুবনেশ্বর
২৩. ২. ৫০

স্নেহের—

আমার জীবনের এক অধ্যায় শেষ হল। তোমার বড়মা তোমাদের টেনে ছিল। তার কাজ আমি করে গেলাম। আমি নিজে কিছু করি এমন শক্তি ছিল না। তোমার বড়মার ইচ্ছাই পূর্ণ হল। বাইরে কিছু প্রকাশ না থাকলেও মনে রেখো তার শক্তিতেই সব হল। তোমার মার কথা তোমার বড়মা আমার কাছে বলে। নতুবা হয়তো তাঁর কথা চিন্তাই করতাম না। তোমার বড়মা না টানলে হয়তো আমিও তোমাকে টানতাম না। নীরবতাই শক্তি। ফুল ফোটে নীরবে। যখন নদী প্রবেশ করে সাগরগর্ভে তখন ভাষা

তার নীরবতা। মৌমাছি নীরবে লোকচক্ষুর অন্তরালেই মধুচক্র নির্মাণ করে, কেউ তা দেখতে পায় না। যাদের দেখতে পাওয়া যায় তারা মধু সংগ্রহ করে না, মধু খেয়ে বেড়ায়। তোমার অন্তর তোমার বড়মার চরণে নিবেদিত হোক, এই প্রার্থনা। আমি তো চণ্ডাল, আমার কাজ পাগলামী করা, তাতো জানাই আছে। কাজেই সেজন্যও প্রস্তুত থাক। আগে পুড়িয়ে নিয়েছি, এবার আঘাতে আঘাতে গড়ে তুলতে হবে। হয় গড়ে উঠবে, না হয় ভেঙে যাবে। এই সময়ই তোমাদের জীবনের সন্ধিক্ষণ। তোমরা অবসর করে (অবশ্য পরীক্ষার পরে) সকলে কখনও তোমাদের বাড়ীতে, কখনও ছেনুদের বাড়িতে, কখনও মঞ্জুদের বাড়ীতে একত্র মিলিত হয়ে পাঠ আলোচনা করে সংঘবদ্ধ হও। পরস্পরকে ভালবেসে এক হও। সবার মিলিত শক্তিতে তোমাদের ভিতরের শক্তি জাগ্রত হয়ে উঠুক। মঞ্জু, বাণী, ছেনু, বেনু, ছবু সকলকেই প্রণাম কোরো, কারণ তারা তোমাদের পূর্বে ঠাকুরের রাজ্যে প্রবেশ করেছে। স্বামী সারদানন্দ লাটু মহারাজকে প্রণাম করতেন, কারণ লাটু মহারাজ ঠাকুরের কাছে আগে গিয়েছিলেন। গুরুকে নিয়ে সম্বন্ধ নূতন করে গ'ড়ে উঠুক। আমি আজ তোমাদের প্রণাম করছি, কারণ আমার ব্রত পূর্ণ হল। ইতি—

নগেন

৪২

সারদাধাম ঃ ভুবনেশ্বর
২৭. ২. ৫০

স্নেহাস্পদেষু—

তোমাকে উমেশের পত্রের সংগে একখানা পত্র দিয়েছি। বোধ হয় পেয়েছ। ছবু, ছেনু, বেনুর পত্র পেয়েছি অনেকদিন। শরীরটা ভাল ছিল না বা অন্য কারণে (এখন তা মনে নেই) পত্রের উত্তর দেওয়া হয় নি। তোমার নিকট পত্র দিতে হলে প্রত্যেকের নিকট দীর্ঘ পত্র দিতে হয়, অথচ কি লিখব তা মনে আসে না ; তাই লেখা হয় নি। এবার ঠাকুরের সম্বন্ধে লিখেছ, এবার পত্র দেওয়া যাবে। শিবরাত্রি থেকে তোমাদের জন্য মনটা ব্যাকুল হয়েছে খুব। তোমাদের জন্য কিছুই করতে পারছি না। আর তোমাদের মনও অন্তর্মুখ হচ্ছে না, তাই কষ্ট। লিখেছ, সংসারের সব চুকিয়ে আর যেন আবদ্ধ না হই। সংসারের কথা, ভালবাসার কথা লিখেছি পূর্ব পত্রে। এবারও লিখছি, আত্মচৈতন্য লাভের প্রকৃষ্ট উপায় হচ্ছে, ভগবৎজ্ঞান ও ভগবৎ-প্রেম। ভগবান ছাড়া আর কাউকে ভালবেসে আত্মহারা হলে আত্মার বিনাশ ঘটে।

Unless a man maintains the strictest watch, he is certain to be fascinated and entangled by the world which is the most potent sorcerer. (সংসার একটি মহা-শক্তিশালী যাদুকর। নিরন্তর দৃঢ়ভাবে সতর্ক দৃষ্টি না রাখলে সে যে মানুষকে মোহগ্রস্ত ক'রে শত পাকে আবদ্ধ করবে, এতে সন্দেহ নেই।)

(1) It pretends that it will remain with you while as a matter of fact it is slipping away from you moment by moment and bidding you farewell.

(2) It pretends itself under the guise of a radiant but immoral sorcerer, pretends to be in love with you, fondles you, and then goes off to your enemies, leaving you to die of chagrin and despair. (সংসার এমনি ভাব দেখায় যে, সে সর্বদা তোমার সংগে সংগে থাকবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে ক্ষণে ক্ষণে তোমাকে পরিত্যাগ করে পালিয়ে যায়।

সংসার জাঁকজমকশীল দুর্নীতিপরায়ণ ঐন্দ্রজালিকের ছদ্মবেশে ছলনা করে, সোহাগ করে, এমন ভাব দেখায় যেন কতই ভালবাসে, তারপর হতাশাময় মৃত্যুর মুখে ফেলে দিয়ে শত্রুপক্ষে গিয়ে যোগ দেয়।)

"যীশুখৃষ্ট এই সংসারকে দেখতে পেয়েছিলেন এক কুরূপা ডাইনীরূপে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার স্বামী ক'জন?" উত্তর হোল, "অসংখ্য"। তিনি বললেন, "তারা সব মরে গেছে, না তুমি তাদের তালাক দিয়েছ?" উত্তর হোল, "না আমি তাদের সবাইকে হত্যা করেছি।" এতে যীশু বল্লেন, "আমি সেই বেকুবদের দেখে অবাক হই যারা তুমি অপরের প্রতি কি ব্যবহার করছ জেনেও তোমাকেই চায়।" সংসারের এমনি মায়া যে, লোকে সংসারকে খুশী করতে কত চেষ্টা, কত কষ্টই না করে, সংসারকে ভালবেসে নিজের জীবন নষ্ট করে, আর মনে করে, আমি কত বড় প্রেমিক। কিন্তু যাবার সময় যেতে হবে রিক্ত ও একা। কেবলমাত্র আধ্যাত্মিকতার

জ্ঞান ও সেই সংগে অহেতুক ভালবাসা ভবিষ্যতের অন্ধকারে একমাত্র আলো। অন্য সব আঁধার থেকে আঁধারে টেনে নিয়ে যায়। এখন যাদের আপনার বলে মনে হচ্ছে শেষে তারাই হবে সব চেয়ে পর। অসময়ে তারা কেউ সাহায্য করবে না। সংসারের স্পর্শে এলে মলিনতা আসবেই মনে, যত সাবধানেই কেন মেশ না। মহম্মদ বলেছেন, না ভিজে যেমন জলে ডুব দেওয়া যায় না তেমনি কলুষিত না হয়ে সংসারে বিচরণ করা যায় না।

"কাজলের ঘরে ঢুকলে কালি লাগবেই"—রামকৃষ্ণ

একমাত্র উপায়—

"এবার আমি ভাল ভেবেছি।
ভাল ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি ॥
যে দেশে রজনী নাই মা, সেই দেশের এক লোক পেয়েছি;
আমি কিবা দিবা কিবা সন্ধ্যা, সন্ধ্যারে বন্ধ্যা করেছি ॥"

আমার নিজের মধ্যে যদি ব্যাকুলতা থাকত, তবে অবশ্য তোমাদের মধ্যেও ব্যাকুলতা জাগত। তবুও মনে হয় আমার তো কিছুই নেই যে কিছু করি। ঠাকুর এবার গাল দিতেই পাঠিয়েছেন, তাই কেবল গালই দিচ্ছি। অবশ্য এটাও ঠিক যে, আমি চলে গেলে আর গাল দেবার লোকও পাবে না। স্বামীজী বলেছেন, "I wish to be milk and honey, but my nature rebels" (আমি তো মিষ্টভাষীই হতে চাই, কিন্তু আমার প্রকৃতি যে বিদ্রোহ করে।) আমার নিজেরও প্রকৃতি এমন ছিল যে, কিছুতেই মধুর মত মিষ্টি হতে পারিনি, কারণ আমি শক্তির উপাসক। শিরায় শিরায় সাহস ও শক্তি জাগ্রত করার চেষ্টাই

আমি করে এসেছি জীবনভর ; কিন্তু না চাইলে যে অন্যের ভিতরে শক্তি জাগ্রত করা যায় না, তা বুঝেও বুঝি না। কেবলই মনে হয়, তোমাদের শিরায় শিরায় এমন চিন্তা প্রবাহিত করে দি যে, তোমাদের পাগল করে দেয়, তোমরা ব্যাকুল হয়ে ছটফট কর—লক্ষ্যকে শক্ত করে ধরে ছুটে যাও সেই দিকে। এগিয়ে চল, এগিয়ে চল, অন্য কোন দিকে দৃষ্টি না রেখে এগিয়ে চল। ঠাকুরের চিন্তায় মন ডুবছে না জন্য যেন একটা তীব্র ব্যাকুলতা চলে মনের মধ্যে দিনরাত। যুগচক্র ঘুরে চলেছে—এ সুযোগ ছেড়ে দিও না। "বিষয় পঞ্চক আর ভূতগণ, সব তোর পর কেহ নয় আপন।" এই ভাবটা দৃঢ়ভাবে মনে এঁকে নাও। এপথে চলা একা সম্ভব নয়। তোমরা ছেলেরা পরস্পর সংগ কর। নিজেরা একস্থানে মিলিত হয়ে ধারাবাহিক ভাবে পাঠ আলোচনা কর। জিতেন, যতীন, বিনয়, উমেশ ও তুমি সকলে মিলে যদি একটা স্থান ও সময় ঠিক করে পাঠ আলোচনা কর, তবেই উপায় হবে ; নতুবা বড় কষ্ট পাবে। একা একা একটু বসে কিছু হবে না। মনে একটুও ফাঁকি রেখো না, তবেই একটা স্থায়ী ছাপ পাবে। তখন অনেকটা সুবিধা হবে চলবার। ভালবাসা নিও। উমেশ ও যতীনকে ভালবাসা দিও। ইতি—

নগেন

পুঃ—"সাধ কখনো মেটে না, তাই সাধে পড়ুক বাজ
বেলাবেলি চলরে চলি সাধি আপন কাজ। ইতি—

নগেন

৪৩

সারদাধাম

৩০. ৪. ৫০

প্রিয়—

তোমার পত্র পেলাম। এবার অক্ষয় তৃতীয়া উৎসব করব না ভেবেছিলাম, কিন্তু এমনি ঠাকুর ও মার কৃপা যে, একজন /৫ সের চিনি ও /৫ সের ময়দা, আর একজন /৬ সের চিনি এনে হাজির। তারপর এই উৎসবের জন্য ৭০৲ টাকা পাওয়া গেল, তার সংগেই তোমার ১০৲ টাকা, কাজেই সমস্তদিন লোকজন খাওয়ান, পাঠ আলোচনা ইত্যাদি হল।

আমাদের গাল দেবে না তো কি করবে? তবে ঠাকুরকে গাল দিলে বুঝতে হবে আমাদের পাপে ঠাকুর গাল খাচ্ছেন। ছেলেটির ব্যবহার খুব ভাল। ছেলে মানুষ, ওকে কি করে তাড়াব? কোথায় দাঁড়াবে? তবে খেয়ালে কাজ করা আমি কোন দিনই পছন্দ করি না। সে তোমার কাছে চিঠিপত্র দিয়ে জানিয়ে আসতে পারত। ভাল হলেই হয় না। আদর্শহীন ভালমানুষির কোন অর্থ হয় না। তাতে মানুষ এগুতে পারে না। প্রত্যেক সৎগুণের সংগে আদর্শ যুক্ত থাকা চাই। প্রত্যেক কাজে যার আদর্শ ব্যক্ত হবে, সেই আদর্শযুক্ত। প্রত্যেক কাজে আদর্শ ব্যক্ত হবে, তবেই ভালমানুষির মূল্য। ও ছেলে ভাল, কিন্তু খেয়ালে চলে; তাই জীবনে ওর জন্য অন্যে কষ্ট পায়। জীবনটা গড়ে তুলতে না পারলে কেবল কতকগুলি সৎ কর্মের দ্বারা জীবনকে বেশী দূর নিয়ে যাওয়া যায় না। আগে সাধনা করে সঞ্চয় করতে হয়, তবে

লোকের সংগে মিশতে হয়। ভবঘুরে হয়ে তো লাভ নেই। সমস্ত শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে ঊর্ধ্বমুখী করতে চেষ্টা না করলে কেবল বিপন্নের সাহায্য, সেবা, লাঠিখেলা ও নৈশবিদ্যালয় প্রভৃতি দ্বারা জীবন সার্থক হয় না। এসব দিয়ে জীবনকে বেশীদূর চালানোও যায় না। চাই একটা শক্তি, একটা ভিত্তি, আর চাই জীবনের উৎস খুলে দেওয়া। তোমার দুঃখের কিছুই নেই। মানুষ চলে নিজের প্রকৃতির বশে। যতক্ষণ সে পরাধীন, ততক্ষণ তাকে দিয়ে কোন বিশ্বাস নেই। ভালবাসা নিও। ইতি—

নগেন

৪৪

সারদাধাম ঃ ভুবনেশ্বর
১৫. ৫. ৫০

প্রিয়—

আপনার পত্র পেলাম। যতক্ষণ 'আমি আমি' বোধ থাকে ততক্ষণ তো বলতে পারি না—"সবই তাঁর ইচ্ছা।" জীব আর শিবের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করেছে এই 'আমি-জ্ঞান'। যতক্ষণ এই 'আমি' আছে ততক্ষণ দায়িত্ব আছে। যদি 'আমি' চলে যায়, তবে কোন ন্যায় অন্যায় থাকে না। 'আমি' জ্ঞান থাকলে 'তুমি' জ্ঞান থাকবেই। দেশ-কাল, কার্য-কারণ আমারই সৃষ্টি; আবার আমি ওতেই বদ্ধ থাকি। গুটিপোকার মত নিজের নালে নিজেই বদ্ধ।

একজন সাধু বলেছেন, জলের সংগে বাতাসের সম্বন্ধ আছে। জলকে একটা কলসীতে রেখে, একটা পাত্র দিয়ে তার মুখ বন্ধ ক'রে,

চারিদিকে মাটি দিয়ে আট্‌কে যদি একটা ঘরের মধ্যে অন্ধকারে রাখা যায়, তবে কিছুকাল পরে দেখা যাবে যে, কলসীতে একবিন্দু জল নেই। হাওয়া তার মধ্যে প্রবেশ ক'রে কেমন ক'রে তাকে বার করে নিয়েছে। কাজেই বন্ধন-মুক্তির কথা ভাববার কোন দরকার নেই। যিনি বেঁধেছেন তিনিই খুলবেন। মানুষ যে চেষ্টা করবে সেও তাঁরই ইচ্ছা; নতুবা চেষ্টা করবার ইচ্ছাই জাগবে না।

আমাদের কাজ তাঁকে স্মরণ করা। তারপর যা, তিনিই জানেন। আমার নির্দেশে সৃষ্টি হয়নি, কাজেই সৃষ্টির নির্দেশ আমি বুঝি না। আর আমি ইচ্ছা ক'রে সৃষ্টির পারেও যেতে পারি না। এই বিশ্ব-পরিকল্পনা তাঁরই, আর তিনিই সব জানেন।

"প্রসাদ বলে ভবার্ণবে ভাসিয়ে দিলেম ভেলা
জোয়ার এলে উজিয়ে যাব
ভাটিয়ে যাব ভাটার বেলা।"

ভালবাসা নেবেন। কেমন আছেন? ইতি—

নগেন

৪৫

সারদাধাম ঃ ভুবনেশ্বর
১৭. ৫. ৫০

কল্যাণীয়াসু—

তোমার পত্র পেলাম। "No man can bathe twice in the same stream." (কেউই একই স্রোতে দু'বার স্নান করতে পারে না।) দিন আসে দিন যায়, সংগে সংগে অনেক কিছু নিয়ে

যায়, আর অনেক কিছু নিয়েও আসে। স্মৃতির চেয়েও উপরের একটা অনুভূতি আছে যেটা স্মৃতি নয়, বাস্তব বা বাস্তবের চেয়েও বেশী। আমার আরাধ্যকে আমি বাইরে দেখতে পাই যখন বাইরে তাকাই, আবার যখন চোখ বুঁজি তখন দেখি হৃদয়মাঝে। যিনি বাইরে তিনিই ভিতরে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সবই আমার মধ্যে, বাইরে কিছুই নেই। বাইরের উপর যারা নির্ভর করে তারা ইন্দ্রিয়রূপ বঞ্চকদের দ্বারা প্রতারিত হয়।

মনটা আমার বাইরে থাকতে চায় না। সে যা-কিছু খোঁজে ভিতরেই খোঁজে, আর যা-কিছু পায় ভিতরেই পায়। এটা ঠিক যে, প্রথম অবস্থায় যা পাবার তার কিছু কিছু, অনায়াসেই পাওয়া যায়। সেটার জন্যে প্রকৃতি নিজে চেষ্টা ক'রে যোগসূত্র স্থাপন ক'রে দেয়। তারপর যা-কিছু পাওয়া যায় তাতে থাকে নিজের চেষ্টা ও ব্যাকুলতা। যতক্ষণ মানুষ বাইরের কিছুতে খুসী ততক্ষণ তাকে বাইরেই থাকতে হয়, বাইরেই ঘুরতে হয়। যখনই মন ব্যাকুল হয় অন্তরের জিনিষ পাবার জন্যে তখনই চাই, তীব্র ব্যাকুলতা ও চেষ্টা। যে বাইরের কোন বস্তুতে বা ব্যক্তিতে সুখী হয়, তাকে বাইরেই থাকতে হয়। যে-ভালবাসা ভিতরে ও বাইরে আগুন জ্বালাতে পারে, এ রাজ্যে চাই সেই ভালবাসা। যে জীবনের সব ক্ষেত্রেই নির্ভর করতে পারে, সেইই মাত্র এ-ক্ষেত্রেও চুপ করে বসে থাকতে পারে। নতুবা বুঝতে হবে যে, মনের ক্ষুধা মিটেছে, তাই আর ব্যাকুলতা নেই, যোগাযোগও নেই। তোমরা সকলে আশীর্বাদ কর যেন ডুবে যেতে পারি, আর যেন বাইরের কোন আকর্ষণ না থাকে। যেন এক চিন্তা, এক উদ্দেশ্য, এক ভাবনা হয় ; আর যেন কিছুই না চাই। 'বন্ধু'কে বোলো,

মন যখন বাইরে যায় সে দিকে ছুটতে হয় না ; যে চিন্তা অন্তর্জীবনের সংগে যুক্ত সেই চিন্তা করতে হয় ; কিংবা মন কি চিন্তা করছে সেটা দেখতে চেষ্টা করতে হয় ; তবেই মন আবার ঘুরে ফিরে ঠিক জায়গায় এসে উপস্থিত হয়।

তোমরা বয়সে ছোট হলেও অন্তরে বড়। তাই তোমাদের প্রণাম জানাচ্ছি। বুদ্ধ সুজাতাকে প্রণাম করেছিলেন, গোপাকেও প্রণাম করেছিলেন। সুজাতাকে বলেছিলেন—"I whom thou worshipeth worship thee." (যাকে তুমি পূজা কর, সেই আমি তোমাকে পূজা করি।)

এ পথে চলতে হলে সব সুখ ছেড়ে দিতে হয়। "তুম্‌হারি কারণ সব সুখ ছোড়া।" সবার শুভ ইচ্ছা ও আশীর্বাদ চাই, নতুবা এ পথে চলতে পারে না কেউ। একটু গিয়েই থেমে যায়। কি আর করা যাবে ? মানুষের সংগে মিশলেই মানুষের গতি রুদ্ধ হয়। এগিয়ে যেতে হলে তীব্র সাধনা চাই। আমি আমার দেবীর চিন্তায়, আমার আরাধ্যের চিন্তায় ভেসে চলেছি। মনটা আর কিছুতে আবদ্ধ থাকতে চাচ্ছে না। ভালবাসা নিও। ইতি—

নগেন

৪৬

সারদাধাম

১২. ৭. ৫০

স্নেহাস্পদেষু—

এই মাত্র তোমার পত্র পেলাম। শরীরটা এখনো সারেনি, তবে বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে না যে, শরীর অসুস্থ। কিছুদিন হল

তোমার কথা খুবই মনে হচ্ছে। প্রতিদিনই ভাবি, তুমি এখানে আসবে। কবে আসবে লিখো।

মনকে বশে আনতে পারছ না লিখেছ। মনটাকে কি সহজে বশে আনা যায় ? সংসারের যত কাছে থাকা যায় তত বেশী তার আঁচ লাগে। এত রকমের অজ্ঞাত প্রভাব মনের উপর কাজ করে যে, মনের পরতে পরতে সংসার ঢুকে যায়। সে প্রভাবের সংগে সংগ্রাম করাও চলে না। প্রথম আসে ভাবের দ্বন্দ্ব, তারপর এসে উপস্থিত হয় কর্তব্যের দ্বন্দ্ব। ভিন্ন আদর্শের মধ্যে থাকলে মনের তেজ ও শক্তি নষ্ট হয়ে যায়। এখনো সময় আছে। তোমার তো সংসার নেই ; তুমি কেন সংসারের ঝামেলায় আছ ? এখনই তো টের পাচ্ছ। আর কিছুদিন পর আরো বেশি করে টের পাবে যে, ভিন্ন আদর্শের মধ্যে থেকে কোন লাভ হয় না। মন কখনো সুখ ভোগ করে, কখনো দুঃখ ভোগ করে। মন চঞ্চল, তাই মনের স্তরে কোন স্থায়ী আনন্দ হতে পারে না। শ্রীগুরু আর ইষ্ট এক। ইষ্ট পিছনে থাকেন, আর সামনে থাকেন শ্রীগুরু, তাই তোমার ঐ চিন্তা ভুল হয় নি। শ্রীগুরুর ভিতর দিয়েই শ্রীকৃষ্ণের বাণী প্রচারিত হয়। যিনি গুরু তিনিই ইষ্ট ; তবে গুরু সব সময় থাকেন সামনে, আর তাঁর আড়ালে থাকেন ইষ্ট। আর কিছু লিখবার নেই। তুমি আমার ভালবাসা লও। ইতি—

নগেন

৪৭

সারদাধাম
১২. ২. ৫১

স্নেহের—

তোমার পত্র পেয়েছি অনেকদিন হল। মাঝে শরীর অসুস্থ হয়েছিল, সেজন্য ঠিক সময়ে পত্র দিতে পারি নি। আমরা কি আশীর্বাদ করতে পারি? আমাদের কোন শক্তিই নেই। আমরা কাকেও ভুলি নি। নিজের মধ্যে যদি ব্যাকুলতা আনতে পার, তা হলে দেখবে সব যোগাযোগ হয়ে যাবে। তাঁকে ভাবলে সব ভাবনা দূরে যাবে। যত ইষ্টচিন্তা করবে তত শক্তি পাবে। প্রতিদিন নিয়মিত ভাবে ডেকে যাও, নিশ্চয় ফল পাবে।

* * * *

মাঝে আমার জ্বর হয়েছিল; তাছাড়া অবসরও কম পাই; তাই পত্র দিতে দেরি হল। অনুকূলের পত্র পেয়েছিলাম, মনে নেই উত্তর দিয়েছি কিনা; তাকে জিজ্ঞাসা কোরো। তুমি অনুকূলের সংগে খুব মিশবে। সে অতি মহৎ লোক—আমার চেয়ে অনেক বড়, আমি কেবল বয়সে বড়। তার কাছে থাকলেই অনেক উন্নতি হবে। রামকৃষ্ণ-পুঁথি খুব পড়বে। আমরা তোমাকে ভুলব কেন? আমরা বাড়ী-ঘর ছেড়েছি সকলের সংগে মেশবার জন্য, সকলকে আপন করবার জন্য।

সব মানুষই ভগবানের দিকে চলেছে, তবে না জেনে চলেছে। সকলেই পথিক। পথে যার সাহায্য প্রয়োজন সে সাহায্য পাবে।

তিনি জানেন কার কি প্রয়োজন। তিনি প্রত্যেককে পথ দেখিয়ে নিয়ে যান।

আমার নিজের কি ভক্তি আছে যে আমি তোমাকে ভক্তি দেব? তুমি নিজে ব্যাকুল হয়ে কাঁদ ঠাকুরের কাছে, তোমার ইষ্টের কাছে, তবেই তুমি ভক্তি পাবে। ভক্তি কি কেউ কাউকে দিতে পারে? সদ্‌গ্রন্থ পাঠ, সৎ-সংগ, নাম করা, স্মরণ করা ইত্যাদিতে ভক্তি হয়।

রামকৃষ্ণ-পুঁথি পড়ছ জেনে খুবই আনন্দিত হলাম। এতেই তাঁর জীবনের সব ঘটনা আছে। যিনি লিখেছেন তিনি খুব লেখাপড়া জানতেন না, তবুও ঠাকুর তাঁর ঘাড়ে চেপে ঐ পুস্তক লিখিয়ে নিয়েছেন। যতটা পার নিয়ম করে প্রতিদিন পড়বে। আর ছুটির দিনে একটু বেশী করে পড়বে। সব ঘটনাগুলি যেন মুখস্থ থাকে। ভাষা মুখস্থ করতে বলছি না, ঘটনাগুলি স্মরণে রেখো। ইতি—

নগেন

৪৮

সারদাধাম

১৯. ৪. ৫১

স্নেহের—

তুমি আমার নববর্ষের শুভেচ্ছা ও ভালবাসা নিও। আমার নিজের কোন 'আদেশ' নেই। আমি গুরু নই, আমি সহযাত্রী। পথে যেতে যেতে পথের অন্তরায় যা জানা আছে সেগুলি বলি, আর নিজের যতটা অভিজ্ঞতা আছে তাই বলি। স্বামীজীর বই পড়ে

মনের জোর বাড়াও, মনের শক্তি না জাগলে, ব্যক্তিত্ব না থাকলে ধর্মের কোন মূল্য নেই। নিজের মনের দৃঢ়তা চাই। ধর্ম দুর্বলচেতা লোকদের জন্য নয়। ধর্মজীবন যাপন করলে দুর্বল সবল হয়; আর যে সবল (অর্থাৎ বলাভিমানী) সে হয় দুর্বল। সব সময় মনের গতি লক্ষ্য করবে। সজাগ থাকবার চেষ্টা করবে। মন যেন ফাঁকি না দেয়। দেশপ্রেম, মানবপ্রেম ও ভগবৎপ্রেম এই তিনটি একত্র চাই। তা না হলে জীবন গড়ে উঠবে না। শরীর, মন ও আত্মা এই তিনটি নিয়ে মানুষ, এই তিনটির খোরাক দিতে হয়। শরীরের খোরাক সবাই দেয়। কেউ কেউ মনের খোরাক দেয় নানা বই প'ড়ে। আর ধ্যান ধারণা, জপ ও স্মরণ-মনন হল আত্মার খোরাক। মনটাকে চাংগা করে না রাখলে মন দুর্বল হয়ে পড়ে।

আর কিছু লিখবার নেই। তোমরা সকলে ভালবাসা নিও। ইতি—

নগেন

৪৯

সারদাধাম ঃ ভুবনেশ্বর

৬. ৬. ৫১

স্নেহের—

তুমি গুরুদেবকে শেষ দর্শন করতে পার নি, সেজন্য দুঃখ করেছ। তোমার দুঃখের কথা জেনে আমি খুব সুখী হয়েছি। কাঁদলে অন্তর পরিষ্কার হয়। শেষবার দেখে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে আসতে, ঐ খানেই

সব শেষ হত। এখন ব্যথাটা কিছুদিন থেকে যাবে। দুঃখই জীবনের ভিত্তি।

"দুঃখ দিয়ে রাখেন তোমার মান,
তোমার লাগি জাগেন ভগবান।"

ধূপ না পোড়লে গন্ধ দেয় না। এমন দুঃখ আছে, যে দুঃখ ভুলে যাওয়ার মত দুঃখ .আর নেই। "আমার হিয়া বিরাম পায় না কো ওগো দুখ জাগানিয়া।" রবীন্দ্রনাথও ঐ সব কথা লিখেছেন। দুঃখকে মনে রাখলে তবে মানুষ মানুষ হয়। সর্বশ্রেষ্ঠ গুরু হল দুঃখ, স্বামীজী বলেছেন। ঠাকুরের সন্তানগণ ঠাকুর চলে যাবার পর কত দুঃখ করেছেন, তীর্থে তীর্থে কেঁদে কেঁদে বেড়িয়েছেন যতদিন না আনন্দের অধিকারী হতে পেরেছিলেন। বেদ, সাংখ্য প্রভৃতি শাস্ত্র ও বুদ্ধ, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি মহামানবগণ কত দুঃখের কথা বলেছেন। দুঃখ মনে রাখা বড় শক্ত; মানুষ দুঃখকে ভুলে যায়, কিন্তু এমন মানুষও আছেন যিনি দুঃখকে ভুলেন না। দুঃখকে ধরে রাখতে পারলে তবে আধ্যাত্মিক জীবন হয়, তবেই আনন্দের সন্ধান পাওয়া যায়। সুখ সবাই খোঁজে সেটা হল পশুত্ব, প্রতিদিনের ক্ষুধা পিপাসা নিবৃত্তির মত। যার জীবনের যত বড় আদর্শ, যত বড় লক্ষ্য তার জীবন তত বড় দুঃখের। মান অপমান, ভাল মন্দ, সুখ দুঃখ, রোগ শোক, জীবন মৃত্যুর পারে আনন্দ। সে আনন্দ-অবস্থা লাভ না করা পর্যন্ত মানুষকে দুঃখের কষাঘাত খেতেই হয়। তাই জীবন যে দুঃখের সেটা প্রথম থেকে জেনে রাখা উচিত। রোগ না জানলে ঔষধ দেবে কি ক'রে? মোহ, আসক্তি, প্রলোভন, সুখ ও ভোগস্পৃহা যার মন থেকে যতটা চলে গিয়েছে, সে জীবনকে ততটা ভাল করে চিনেছে। স্বামীজী তাই

বলেছেন, "শরীর ধারণ বিড়ম্বন"। জগদানন্দ স্বামী আমায় অন্তত তিন চারবার বলেছেন, "এ জগৎ অত্যন্ত জঘন্য স্থান, এখানে কি থাকতে আছে"? যার যে বিষয়ে দুঃখবোধ তার সে বিষয় প্রাপ্তি হয়। যে অর্থের জন্য দুঃখী সে অর্থ পায়, যে স্ত্রীর জন্য দুঃখী সে স্ত্রী পায়, যে ভোগের জন্য কেঁদে আকুল সে ভোগ পায়। যে যার জন্য কাঁদে সে তাকে পায়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব বল্‌তেন, "মানুষ টাকার জন্য এক ঘটি কাঁদে, মাগের জন্য কেঁদে ভাসিয়ে দেয়, ভগবানের জন্য কে কাঁদছে?" গুরু তো আমাদের জীবনের কেন্দ্র নয়—দীক্ষা নেওয়া পর্যন্ত! কে গুরুর জন্য কাঁদছে? সকাল থেকে শোবার সময় পর্যন্ত লোকে কি চিন্তা করে? ক'বার গুরু ইষ্টের কথা ভাবে? মন শুদ্ধ যত হবে, তত গুরু ইষ্টের কথা মনে হবে ও জগতের প্রতি, জীবনের প্রতি বিরক্তি আসবে। ঠাকুর ব্যাকুল হয়ে জীবন নাশ করতে গেলেন। শুদ্ধ মন হলে ধারণা হয়, "জন্ম দুঃখ, জীবন দুঃখ, মৃত্যু দুঃখ"। যার যত ভোগ-বাসনা প্রবল সে তত দুঃখকে ভয় পায়। স্থূল ভোগের পর আসে সূক্ষ্ম ভোগ-বাসনা। সেটা যতটা পার হওয়া যায় ততটা জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়, আর ততটা গুরু ইষ্টের প্রতি টান হয়। জীবন দুঃখের, "নাহি মাত্র সুখের লেশ"। তা না হোলে ত্যাগের কি প্রয়োজন, সাধনারই বা কি প্রয়োজন? দুঃখ পাওয়া আর দুঃখ স্থায়ী হওয়া ভাল। ভালবাসা নিও। ইতি—

নগেন

৫

সারদাধাম ঃ ভুবনেশ্বর

১৮. ৬. ৫১

কল্যাণীয়াসু—

মায়ী, তোমার পত্র পেলাম। দুঃখ থেকে দূরে থাকা যায় না। দূরে যাবার চেষ্টা করলে দুঃখ আরও বেশী ভোগ করতে হয়। মানুষের যে কত রকম দুঃখ আছে তার ঠিক নেই। (১) নিজ ইচ্ছাকৃত (২) পর-ইচ্ছাকৃত (৩) অনিচ্ছাকৃত। আমরা কি কম দুঃখ ভোগ করি? অনেক সময় পর-ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত দুঃখও ভোগ করতে হয়। মানুষকে স্নেহ করলে অনেক বেশী দুঃখ ভোগ করতে হয়। এটা নিজ ইচ্ছাকৃতের মধ্যে পড়ে। দুঃখের আঘাত এলে নীরবে সহ্য করতে হয়। যখন সেই আঘাত আসে নিজের লোক থেকে তখন দুঃখটা বেশী লাগে এবং মনে কিছুকাল বেশী স্থায়ী হয়; অবশ্য একথা ঠিক, যারা দুঃখ দেয় তারাও দুঃখ থেকে রেহাই পায় না। দুঃখের সংগে পরিচিত না হলে দুঃখ পাওয়াই সার হয়—দুঃখকে কাজে লাগান চলে না। দুঃখের সময় আত্মার বাণী শোনা যায় অন্তরে।

"Language of the soul is spoken
Without a tongue;
Its soundless symphony is heard
Not by keenness of ear
But only by those who are deaf
To the noise of the world."

(আত্মার বাণী জিহ্বা ছাড়াই বলা যায়। এর ভাষাহীন ঐকতান সুতীক্ষ্ণ শ্রুতিশক্তিরও অনধিগম্য। সংসারের কোলাহল সম্বন্ধে যারা বধির তাদেরই কানে ধ্বনিত হয় এই বাণী।) মানুষ হলেই তাকে দুঃখ সহ্য করতে হয়। পশুস্তরের লোকের কোন দুঃখ নেই, অথবা কম দুঃখ আছে। আমাদের তো দুঃখের অন্ত নেই, তবুও যে বেঁচে আছি তার কারণ শ্রীমার আশীর্বাদ, আমাদের কি আছে বল? হাওয়ায় ফাঁদ পেতে বসে আছি, হাওয়াতে যা এনে ফেলে তাই আমাদের প্রাপ্য। কেউ সম্মান দেবে, কেউ গাল দেবে, কেউ মালা পরাবে, আবার কেউ বা লাথি দেবে—সবই নিতে হবে নীরবে। বেশী দুঃখ, বেশী ব্যথা পেলে নীরবে কেঁদে জানাতে হয় ব্যথাহারীর কাছে। এছাড়া আর কোন উপায় আছে কি? থাক্ সে কথা, ভালবাসা নিও। ইতি—

নগেন

৫১

সারদাধাম

২. ৮. ৫১

প্রিয়—

আপনাকে পূর্বে পত্র দিয়েছি, তা বোধ হয় পেয়েছেন। বর্ষাকাল, শরীরটা ভাল যাচ্ছিল না। এখনও একেবারে ভাল হয় নি। আপনি যা প্রশ্ন করেছেন তার উত্তর আপনাকে দিলাম। পত্র লিখে আলোচনা করা সম্ভব নয়। অন্যের পত্র হলে হয় জবাব দিতাম না, না হয় অন্যরূপ উত্তর দিতাম। আপনার সংগে অন্যরূপ সম্বন্ধ, তাই

একটা কিছু লিখলাম নিজের ভাব অনুযায়ী। নেপুর ভাইপো ম্যাট্রিক দিয়ে এখানে এসেছে। আমি বলে গিয়েছি সে লিখেছে।

আপনার প্রশ্ন ছিল—(১) বিশ্বাস ও আত্মসমর্পণ আমাদের ঠিক ঠিক হয় না কেন? (২) কর্তব্য বলে আমরা যেটা বলি সেটা কি? (৩) 'পুরুষকার' বলে যেটাকে সামনে রেখে আমরা কাজ করে চলেছি আত্মসমর্পণের সংগে সেটা কি ভাবে খাপ খায়? (৪) কর্তা, করণ ও ক্রিয়া এই তিন থাকবে, না একেবারে লোপ পেয়ে যাবে?

আপনার প্রশ্নের দীর্ঘ আলোচনা পত্রে সম্ভব নয়। তাই সবগুলি প্রশ্নের মোটামুটি একটা উত্তর দিলাম—

একটা কথা মনে রাখা উচিত, ধর্ম (আধ্যাত্মিকতা) সবার জন্য নয়। প্রকৃত গান বাজনা যেমন সবার হয় না, বিদ্যা বুদ্ধির বিকাশও যেমন সকলের ভাগ্যে ঘটে ওঠে না, ধর্ম (আধ্যাত্মিকতা) সম্বন্ধেও তাই।

গীতায় ভগবান বলেছেন, হাজার হাজার লোকের মধ্যে দু' একজনই সিদ্ধিলাভ করে—অর্থাৎ প্রকৃত ধার্মিক হয়, ও ভক্তি বিশ্বাস লাভ করে। আমরা শাস্ত্রচর্চা করতে পারি, ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে কথা বলতে পারি বা লিখতে পারি, কিন্তু সত্যিকার ধর্ম বা ভক্তি-বিশ্বাস লাভ করতে পারি না কেবল ঐ সব ক'রে।

আচারনিষ্ঠ হয়ে নিয়ম পালন, ভজন, কীর্তন প্রভৃতি হয় তো করা যেতে পারে, কিন্তু ভক্তিলাভ বা ঈশ্বরে বিশ্বাস অতীব কঠিন। ভেবে দেখেছি, আমরা ঈশ্বর চাই না, ঈশ্বর ছাড়া আর সবই চাই। কাজেই—"Ask and ye shall be given." (চাও,

নিশ্চয়ই পাবে।) "ডাক দেখি মন ডাকার মতন, কেমন শ্যামা থাকতে পারে?"—এ কথার অর্থ হৃদয়ংগম করতে পারি না।

আমরা চাইও না, ডাকতেও পারি না। আমাদের ধর্ম, কর্ম সবই মুখস্থ, অন্তরস্থ হয় নি।

"হরি তোমায় ভালবাসি কই,
আমার লোক দেখানো ভালবাসা, মুখে হরি হরি কই।

* * *

নয়নের অশ্রুবিন্দু, প্রেম নাই তায় একবিন্দু,
আমি যদি বাসতাম ভাল—জানতাম নাক তোমা বই।"

যে যেটা বা যাকে ভালবাসে, সে তার জন্যে শক্তি, সামর্থ্য, অর্থ, চিন্তা সবই নিয়োগ করে। সে সেই এক চিন্তায় পাগল হয়। তার ধারণা হয়—

"His name, his association, his place, the persons he talked with, the things he touched are all sacred to me as they belonged to my beloved." (প্রেমাস্পদের নাম, তাঁর আবাস, তাঁর সংগ, যাদের সংগে তিনি কথা বলেন, যে সব জিনিষ তিনি স্পর্শ করেন সবই আমার কাছে পবিত্র, কারণ এ সবই আমার প্রিয়তমের।)

উন্মাদ না হলে আত্মত্যাগ বা আত্মসমর্পণ হয় না। ...সখীরা রাধাকে বলছে—"তুই কালা, কালা বলে যে কালা-ই হয়ে গেলি। রাধা তার উত্তরে বলছেন,—"হাঁ সখি, আমি কালাই হয়েছি, কৃষ্ণ ছাড়া আর কোন কথা শুনতে পাই না।"

...আর এক সখী ঠাট্টা করে বলছে,—"সখি, কানাই কানাই

ক'রে তুই কানাই হয়ে গেলি।" উত্তরে রাধা বলছেন,—"সত্যই সখী, আমি কাণা-ই হয়ে গেছি, কৃষ্ণ ছাড়া আর কিছু দেখতে পাই না।"

আমাদের জীবনের সব কিছু নির্ভর করে জগৎ-সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিভংগির উপর। যতক্ষণ জগৎ থেকে কিছু পাবার আশা রাখি, ততক্ষণ পর্যন্ত ধারণা হয়, জগৎ সত্য, এবং সব আনন্দ এই জগৎ থেকেই পাব; ততক্ষণ পর্যন্ত মন উপরে উঠতে চায় না, পারেও না। রাধা কৃষ্ণ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় না—কিছু শুনতেও পায় না। তার কাছে কৃষ্ণই জগৎ—কৃষ্ণ ছাড়া আর জগৎ নেই। মহাপ্রভুর কথা—"যাঁহা যাঁহা আঁখি পড়ে তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে।" পরমহংসদেব বলতেন—"কোশা-কুশি, চৌকাঠ, মূর্তি, মন্দির সবই চেতন।" আর এক ভক্ত বলেছেন—"চেতন যমুনা, চেতন রেণু।"

নিজের মন যে স্তরে থাকবে, দুনিয়াটা সেই ভাবে সামনে আসবে। যখন মন শরীরে বদ্ধ, শারীরিক সুখই যখন কাম্য, তখনই দুনিয়া সত্য। তখন দুনিয়া থেকে সমস্ত অভাব পূর্ণ করতে মানুষ চেষ্টা করে। কাজেই সে আর অতিরিক্ত কিছুরই অভাব বোধ করে না। যখন বিষয়ের নেশায় ভরপুর, তখন টাকাই কাম্য, এবং সমস্ত মন থাকে ঐ দিকে। কাজেই অন্য কোন্ কথা শুনতে চায় না বা শুনলেও অন্তরে প্রবেশ করে না। যারা এদের মধ্যে ভাগ্যবান তারা অন্তত মনের সুখ চায়, কেবল স্থূল সুখে সুখী হয় না। তবে শরীরের সুখই চা'ক, আর মনের আনন্দই খুঁজুক, প্রায় সকলেই জীবনের প্রত্যেক ক্ষণের আনন্দই খোঁজে; সমগ্র জীবনের দিকে দৃষ্টি রেখে কিছু করে না

বা চায় না। এদের জন্য আধ্যাত্মিক রাজ্য নয়। যারা সমগ্র জীবনের দিকে লক্ষ্য রেখে আত্মবিকাশের চেষ্টা করে তারাই আধ্যাত্মিক রাজ্যের পথ পায়।

মানুষ যখনই পথের সন্ধান পায়, তখনই তার কাছে আর সব আলুনি বোধ হয়। তখন মনটা তার থেকে থেকে কেঁদে ওঠে; সে একটা কিছু পাবার জন্য ব্যাকুল হয়, যদিও জানে না সে কি চায়। সে বর্তমানের সংগে খাপ খাইয়ে, জগতের সংগে যোগ রেখে আর দশ জনের মতন চলতে পারে না। মনের সেই অবস্থায় বোধ হয় সবই আছে, অথচ কিছুই নেই। জীবন তার দুর্বিষহ হয়ে পড়ে, আর মনে হয় জীবনটা বৃথাই গেল। তখন সে কাঁদে আর বলে—

"কে আছ চেতন, কর হে চেতন।"

অথবা— "যাবে কিহে দিন আমার বিফলে চলিয়ে।"

মনের এই অবস্থায় সে গুরু বা এমন একজন লোককে চায়, যিনি পথ দেখিয়ে দিতে পারেন। গুরু বা সাধুসংগ হলে বুঝতে পারে যে, এই 'সংসার বিদেশে' থাকা কষ্টকর। তাই মনকে বলে—

"মন চল নিজ নিকেতনে
সংসার বিদেশে বিদেশীর বেশে ভ্রম কেন অকারণে।
বিষয় পঞ্চক আর ভূতগণ সব তোর পর
কেউ নয় আপন।"

আর দৃঢ় ধারণা হয়—"একাকী এসেছি একাকী যেতে হবে, সংগে কেউ তো যাবে না।" মনের এইরূপ অবস্থা হলে সে দেহ-মন-প্রাণ সব সপে দিতে পারে গুরু বা ইষ্টের চরণে। অবশ্য নিজের চেষ্টায় আত্মসমর্পণ হয় না। মহাপুরুষ আত্মনিবেদন করিয়ে নেন,

যেমন রামকৃষ্ণদেব ব'কলমা নিয়েছিলেন ভক্তদের। গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন—

"অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।" (১)

তিনি অভয় দেন ও তিনিই আত্মসমর্পণ করিয়ে নেন।

"মৎপ্রসাদাৎ অবাপ্নোষি শাশ্বতং পদমব্যয়ম।" (২)

অথবা, "মচ্চিত্তঃ সর্ব দুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি"··· (৩)

মানুষ নিজ নিজ প্রকৃতির বশেই কর্ম করে থাকে। কাজেই অন্য কোন কথা তার অন্তর স্পর্শ করে না। জগদ্‌গুরু বা মহাপুরুষ তাকে প্রকৃতির পারে নিয়ে গিয়ে, আত্মসমর্পণ করিয়ে পরম পদ প্রাপ্তির অধিকারী করেন। পূর্বোক্ত (১) (২) ও (৩) শ্লোক দ্রষ্টব্য।

মানুষ প্রকৃতির বশেই চলে; তাই শ্রীভগবান গীতায় অর্জুনকে বলেছেন—"স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্মণা।" তাই তাঁকে প্রকৃতির পারে নিয়ে বললেন,—

"তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥"

মানুষের মধ্যে মুক্ত ও বদ্ধ দুই ভাবই বিদ্যমান। শরীর মন ও বুদ্ধিতে মানুষ বদ্ধ, আর আত্মাতে মুক্ত।

"Thought is the slave of life
Life is time's fool,
And time that takes survey of all the world
Must have a stop."

—Shakespeare

(চিন্তা জীবনের দাস,
জীবন কালের ক্রীড়নক,
কাল যাহা এ নিখিল বিশ্ব-নিয়ামক
তার'ও শেষ হবে একদিন।")

আধ্যাত্মিক জীবনের আরম্ভ সময়ের পারে, এবং চিন্তারও পারে। জীবনকে আঁকড়ে ধরে থাকাই মায়া।

মানুষের বুদ্ধি জীবনের সংগে এমন ভাবে যুক্ত যে আমাদের সকল কর্ম, চেষ্টা ও সাধনা বা ভাল-মন্দ বিচার, অর্থাৎ সব কিছুই অজ্ঞাতসারে জীবনকে ভিত্তি করেই সম্পন্ন হয়ে থাকে। আর জীবনের প্রতি তৃষ্ণাই মানুষের সমস্ত প্রেরণার মূলে।

মানুষের মধ্যে যে দেবতা—যে মুক্ত পুরুষ সুপ্ত আছে, সাধনার দ্বারা তাকে জাগ্রত করতে হয়। সেই জাগ্রত পুরুষই হচ্ছে একান্ত স্বতন্ত্র ব্যক্তি-পুরুষ।

এই ব্যক্তিত্ব ঠিক ঠিক পূর্ণতা লাভ করলে তবেই তাকে ভগবানের পায়ে নিবেদন করা যায়। যার ব্যক্তিত্ব নেই সে আত্মসমর্পণ করতে পারে না। আত্মসমর্পণ মানেই ব্যক্তিত্বের বিসর্জন। সদ্‌গুরু বা মহাপুরুষের আশ্রয় লাভ ক'রে পুরুষকার দ্বারা ব্যক্তিত্বের বৃদ্ধি করা চলে। আবার পুরুষকারের দ্বারাই মানুষ হতে পারে, "নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্।" এই অবস্থা প্রাপ্ত হলেই দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি সবই নিজের আয়ত্তে আসে, আর তখনই মানুষ আত্মসমর্পণ-সাধনার উপযোগী বা অধিকারী হয়। তারপর ভগবান সদ্‌গুরুর আশ্রয় দিয়ে তাকে আত্মসমর্পণ করিয়ে নেন। হনুমানের অবস্থার কথা স্মরণ করুন। হনুমান হল "কৃতকার্যং নিরাকাংক্ষং

জ্ঞানাপেক্ষং মহামতিম্” এই অবস্থার প্রতীক। তারপর রামচন্দ্র তাকে আত্মনিবেদন করিয়ে পূর্ণ জ্ঞান প্রদান করলেন।

“When man asserts himself in man, he commits atrocities and all other crimes. But when God asserts himself in man, the man is good, pure and virtuous.” (মানুষের মধ্যে যখন অহংভাব প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তখন সে হয় দুর্বৃত্ত—সে করে বহুবিধ ভয়াবহ অপরাধ। আর ভগবান যখন মানুষের মধ্যে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হন, তখন সে হয় সৎ পবিত্র ও ধর্মপ্রাণ।)

নিজের মধ্যে যে শক্তি আছে সেটাকে নিঃশেষ না করলে অন্য শক্তি আসে না। যেমন রামকৃষ্ণদেব বলতেন,—“কর্ত্তাকে একজন অনুরোধ করলে, ভাঁড়ার থেকে কিছু এনে দিন। কর্তা গিয়ে দেখেন, ভাঁড়ারে লোক আছে। তখন তিনি বললেন, “ভাঁড়ারে লোক আছে, আমি গিয়ে কি করব?”

মানুষ যেমন মুক্ত তেমনি বদ্ধ। মানুষ যখন চেষ্টা করে, পুরুষকার খাটায়, তখন তার পিছনে থাকেন সেই মহাশক্তি যাঁকে নিয়ন্ত্রিত করেন সেই পরম পুরুষ।

মানুষ কি, আর আমি কি, এটা ঠিক ঠিক ধারণা নেই বলেই আমরা দৈব ও পুরুষকার এবং পুরুষকার ও আত্মনিবেদনের মধ্যে একটা বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি করি। আমাদের মনে রাখা উচিত, আমি দেহ নই, মন নই, বা এ দু'য়ের সমষ্টিও নই। এ কথাও মনে রাখতে হবে যে মানুষের যে স্বরূপ তা এ দেহের মধ্যে আবদ্ধ নয়। তবেই দৈব, পুরুষকার ও আত্মনিবেদনের মধ্যে সামঞ্জস্য খুঁজে পাবেন।

আমাদের জীবনের সফলতা আসে তখনই যখন দৈব, পুরুষকার ও সময় বা সুযোগ তিনটি একত্র হয়। যেমন পাখির ডিম ফোটানোর ব্যাপারে—

(১) দৈব অনুগ্রহে যদি ডিমটি ঝড় বৃষ্টিতে নষ্ট হয়ে না যায়। (২) পুরুষকার বা চেষ্টাদ্বারা যদি ডিমে ঠিক ঠিক তা দেওয়া হয়। (৩) যথোপযুক্ত সময়ে যদি পাখি ডিম ফুটো করে, তবেই ডিম থেকে বাচ্চা বেরিয়ে আসে। এর কোনটির বিপর্যয় ঘটলে ডিম নষ্ট হয়ে যায়।

একটু গভীর ভাবে চিন্তা করলে ধারণা হবে যে, তিনিই কর্তা, করণ ও ক্রিয়া। (তিনি=ঈশ্বর) তিনিই তাঁর সৃষ্টির মধ্যে আত্মপ্রকাশ করছেন। একজন মনীষী বলেছেন—

"God buried himself in the world and again revived in man, in the form of self-conciousness." (ভগবান এই সংসাররূপ গোরস্থানে নিজেকে প্রোথিত করলেন, তারপর পুনর্জীবন লাভ করলেন মানুষের মধ্যে 'আত্মজ্ঞান' রূপে।)

পরমহংসদেব বলতেন, মানুষ=মন+হুঁস, অর্থাৎ যার আত্মজ্ঞান জেগেছে। তিনি আরও বলতেন, 'আমি'কে খুঁজতে গেলে সব 'তিনি'ই হয়ে যান। আর একজন পাশ্চাত্য মনীষী বলেছেন— "God sleeps in stones, breathes in plants, moves in animals and wakes up in man." (ভগবান ঘুমিয়ে থাকেন পাথরে, তরুলতায় চলে তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস, ভ্রমণ করেন পশুপাখির মধ্য দিয়ে, আর জাগ্রত হন মানুষে।)

তবেই বুঝুন, "আমি কে? মানুষ কে? ভগবান কে?" মানুষের যে স্বাধীনতা কতটা, তার একটা উদাহরণ দিচ্ছি রামকৃষ্ণদেবের কথা দিয়ে—

"একটা গরু দশ হাত দড়ি দিয়ে খুঁটিতে বাঁধা আছে। গরু ইচ্ছা করলে দশ হাতের মধ্যে খেতে পারে, অথবা দু'এক হাতের মধ্যেও থাকতে পারে। কিন্তু দশহাতের বেশী যাবার উপায় নেই।" মানুষের স্বাধীনতা ঐরূপ। যত বড় লোকই হ'ন না কেন, আর তাঁর দড়ি যত লম্বাই হোক, তবু তিনি যখনই তাঁর সীমা লংঘন করতে চেষ্টা করেন তখনই ব্যর্থ হন।

আলেকজাণ্ডার, জুলিয়াস সিজার, নেপোলিয়ন, গান্ধীজী প্রভৃতি কেউই নিজের ইচ্ছামত কাজ করতে পারেন নি। কেউই নিজ নিজ সীমা লংঘন করতে পারেন নি। তাঁদেরও ব্যর্থতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তফাৎ এই যে, আমাদের চেয়ে তাঁদের কর্মক্ষেত্র অনেক বিস্তৃত, কিন্তু তাঁরাও বদ্ধ; তাঁদের শক্তির প্রকাশ ততটুকু হয়েছে, যতটুকু ভগবানের নিজের ইচ্ছা পূর্ণ করতে প্রয়োজন। (অবশ্য তাঁরা এ কথা জানতেন না যে, অজ্ঞাতসারে ভগবানই কাজ করাচ্ছেন।) তাঁদের ব্যর্থতায় এইটা প্রমাণিত হয়েছে যে, তাঁরা মানুষ এবং তাঁরা যথেষ্ট ক্ষমতা সত্ত্বেও অতি দুর্বল।

পুরুষকার ও আত্মসমর্পণের মধ্যে কি সম্পর্ক তার একটা উদাহরণ দিচ্ছি—

একটা পাখি একটি জাহাজের মাস্তুলে বসেছিল, জাহাজ যে কবে সমুদ্রে চলে গিয়েছে তা টের পায় নি। যখন তার খেয়াল হল, তখন সে নিজে কূলে ফিরে যাবার জন্য উড়তে আরম্ভ করল। পূর্বদিকে

গিয়ে আর কূল না পেয়ে ক্লান্ত হয়ে মাস্তুলে ফিরে এল। আবার সে পশ্চিমে উড়ে গেল, কিন্তু আর পথের শেষ হয় না, তাই আবার মাস্তুলে ফিরে আসতে বাধ্য হল। এইরূপে সে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ সব দিক হতে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসে মাস্তুলে বসল, আর উড়বার চেষ্টা করল না। সে তখন মনে মনে ভাবল, জাহাজ তাকে যেখানে নিয়ে যাবে সে সেইখানেই যাবে। তার সব চেষ্টার অবসান হল। পুরুষকারই তাকে আত্মনিবেদন করাল।

পরমহংসদেবকে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়, সবাই কেন ভগবানের দিকে যায় না? উত্তরে তিনি বলেন—ছেলেকে মা চুষি দিয়ে ভুলিয়ে রেখেছেন; তাই সে চুষি ছাড়া আর কিছুই জানে না। কিন্তু যে ছেলে চুষি ফেলে কাঁদতে থাকে, মা ছুটে এসে তাকে কোলে করেন। যে দুনিয়ার সম্ভোগ ছেড়ে মার জন্যে ব্যাকুল হয়ে কাঁদে, মা তাকে আপনার করে নেন; তার ভাবনা দূর করে নিজেই তার ভাবনা ভাবেন। গীতায় ভগবান বলেছেন, "যোগক্ষেমং বহাম্যহম্"। এক সময় ঠাকুর দেখলেন, কয়েকটি গরু গংগায় জল খাচ্ছে। কিন্তু গংগার তীরে খুঁটিতে বাঁধা অন্য কয়েকটি গরু চেষ্টা করেও জল খেতে পারছে না। তিনি বলেন, যার গলা খুঁটিতে বাঁধা সে জলের নিকটে থেকেও জল খেতে পারে না। আর যার গলায় দড়ি নেই সে দূর দূরান্তর থেকে এসে জল খেতে পারে। যাদের গলায় দড়ি আছে তারা শত বন্ধনে বাঁধা, তাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। বাইরে চেষ্টা থাকলেও অন্তরে অন্তরে তাদের মন আসক্তি বা বন্ধনে আবদ্ধ। কিন্তু অধিকাংশ লোকই নিজের বন্ধন বা আসক্তিকে স্বীকার করে না, পরন্তু মরাকে সোনার পাতে মুড়ে রাখার

মতন নানা কথায় ও বড় বড় আদর্শের ধুয়া ধরে ঢেকে রাখতে চেষ্টা করে। কিন্তু সোনার পাতে মোড়া থাকা সত্ত্বেও মৃতদেহ গলিত হয়ে দুর্গন্ধ বিস্তার করতে থাকে। তখন নিজের জীবন নিজের কাছেই উপস্থিত হয় সর্বপ্রকার বীভৎসতা নিয়ে।

কর্তব্য সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, কর্তব্যবোধটা আগে আসে না, এটা একটা পরবর্তী চিন্তা; কারণ যে ক্রীতদাস সে তো সব কাজ করতে বাধ্য; তার আবার কাজ বেছে নেবার স্বাধীনতা কোথায়? স্বাধীনতা ও বেছে নেবার ক্ষমতা না থাকলে কর্তব্য শব্দটির কোন অর্থই হয় না। যখন বলি, আমাদের এই কাজটা করা উচিত, তখন সেই কর্ম করা কি না করা, সেটা বেছে নেবার স্বাধীনতা থাকা উচিত। কিন্তু আমরা তো ক্রীতদাস; আমাদের করা না করার স্বাধীনতা কোথায়? আমরা দেহের দাস, ইন্দ্রিয়ের দাস, অন্নের দাস। আমরা খ্যাতি, প্রতিপত্তি, প্রভাব, প্রতিষ্ঠা, ক্ষমতা ও ঐশ্বর্যের দাস। আমরা রাষ্ট্র, সমাজ ও দেশের দাস। কিন্তু আমরা সেটাকে ঢেকে রাখি ভালবাসা, দেশাত্মবোধ প্রভৃতির জমকালো রঙ চড়িয়ে। আসল কথা হচ্ছে, "We create disease and then seek for its remedy and call it duty." (আমরা রোগ সৃষ্টি করি তারপর তার প্রতিকারের চেষ্টা করি এবং তার নাম দিই "কর্তব্য"।) যে অন্তরে বাইরে দাস, তার মুক্তি কোথায়?

মহামায়া পথ না ছেড়ে দিলে কারও পালাবার উপায় নেই। "সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে।" দু'নৌকায় পা দিলে কিছু হয় না, একদিকে ঝুঁকতে হয়। পথে বের হলেই পথের সন্ধান মেলে।

ধর্ম একটা পথ এবং পথ কখনই ঘর নয়। পশু চায় আশ্রয়, মানুষ খোঁজে পথ। অবশ্য এ আমার কথা বলছি না। যাঁরা সত্যিকার জিজ্ঞাসু, যাঁরা দৈব অনুগ্রহ লাভ ক'রে মনুষ্যত্ব ও মুমুক্ষুত্ব লাভ করেছেন তাঁদের কথাই বলছি।

যতক্ষণ 'আমিত্ব' ততক্ষণ কর্তৃত্ব, ততক্ষণ দায়িত্ব, দুঃখও ততক্ষণ। 'আমিত্ব' গেলে দায়িত্ব, কর্তৃত্ব ও দুঃখ সব চলে যায়। পরমহংসদেব বলতেন, "আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল"। 'আমি'ই শয়তান, 'আমি'ই মায়া। 'আমার' 'আ'-টাই সব অনিষ্টের মূল। 'আ'-টাই আটা। ঐটেই আটকে রেখে দেয়। রামকৃষ্ণদেব বলতেন, আমার 'আ' মুছে দাও, সবই মার। আত্মনিবেদনে তিনটি অবস্থা আসে—(১) নিরাশ্রয় ভাব—তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই, কিছু নেই। (২) 'তোমার ইচ্ছা হোক হে পূর্ণ আমার জীবন মাঝে'। আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী। (৩) আমি তোমার। তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা, তোমা ছাড়া আমার নিজের কোন ইচ্ছা নেই, অস্তিত্বও নেই। সবই তোমার। আমিও তোমার। তুমি সাপ হয়ে কাট ওঝা হয়ে ঝাড়।

ক্রিয়া বা কর্ম ভক্ত, জ্ঞানী, যোগী সবারই আছে। আত্মনিবেদন করলেই ক্রিয়া লোপ হয় না; তবে কর্মত্যাগ হয় অর্থাৎ কর্তৃত্ব-অভিমান চলে যায়।

ভক্তি, বিশ্বাস ও আত্মনিবেদনে কর্ম অন্তরায় নয়। অন্তরায় Ego বা আমিত্ব। যখন আমিত্ব চলে যায় তখন ঠিক ঠিক কর্ম করা সম্ভব হয়। তখন ধারণা হয়, কর্তা করণ ও ক্রিয়া সকলই তিনি। তিনিই সকলের মূলে। আবার তাঁর মূলও তিনি। যাঁরা ভক্ত-কর্মী তাঁরা ঈশ্বরের যন্ত্র হয়ে কাজ করেন ও কর্মফল ভগবানে নিবেদন

করেন। যাঁরা ঈশ্বর মানেন না তাঁরাও শাস্ত্র বা গুরুবাক্য পালন ক'রে নিষ্কাম কর্ম করেন। যেমন—

দেবেভ্যশ্চ পিতৃভ্যশ্চ ভূতেভ্যোঽতিথিভিঃ সহ।

ইত্যর্থং সর্ব এব তে সমারম্ভা ভবন্তি বৈ॥'

যোগীর কর্ম হচ্ছে, আত্মস্থ হয়ে সংগ ত্যাগ করে কর্ম করা। জ্ঞানীর কর্ম—

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবি র্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।

ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা॥

ভক্তিপথের পাথেয় আত্মসমর্পণ। আত্মনিবেদনের পূর্বে ঈশ্বরে ভক্তি বা ভালবাসা হওয়া চাই। তা না হলে ভগবানে বিশ্বাসই হয় না; আর আত্মনিবেদনও সম্ভব হয় না। ভালবাসায়—(১) কোন দোকানদারী থাকে না, অর্থাৎ লেনা-দেনার ভাব থাকে না। (২) ভালবাসাই ভালবাসার পুরস্কার। (৩) ভালবাসায় কোন ভয় থাকে না। দুঃখ আসুক, মৃত্যু আসুক, তবুও মনে কোন চঞ্চলতা নেই; মনে হয় এ সব প্রিয়তমের দান। পওহারী বাবাকে একবার একটি গোখরো সাপে কামড়ায়। তিনি তিন চার ঘণ্টা অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। তারপর তাঁর যখন জ্ঞান হল, তখন তিনি বললেন, আমার প্রিয়তমের এক দূত এসেছিল। একজন জ্ঞানী সাধুকে এক মুসলমান ছোরা মারে। সাধুটি সেই মুসলমানকে জড়িয়ে ধ'রে বললেন, ভাই, তুমিই তিনি। এই বলে দেহত্যাগ করলেন। ইতি—

নগেন

৫২

সারদাধাম

প্রিয়—

আপনার পত্র পেয়েছি। আপনি লিখেছেন, টাকা পয়সা নাড়াচাড়া করি, এই নিয়েই আছি। দিন যাচ্ছে আর বুঝতে পারছি, মানুষ বাইরে কিছু ভাল বা মন্দ হতে পারে না। যে প্রকৃতি নিয়ে মানুষ জন্মায়, বাইরের অবস্থা সেটাকে ফুটিয়ে তোলে মাত্র। একটি গাছকে আপনি নিজের ইচ্ছামত বড় করতে পারেন না, কেবল পারেন সার দিতে ও জমিটা পরিষ্কার রাখতে। গাছ নিজের অন্তর্নিহিত শক্তিতেই রস গ্রহণ ক'রে বড় হতে থাকে। মানুষ সম্বন্ধেও তাই। যেমন আপনি কোন গাছ জন্মাতে পারেন না, তার বৃদ্ধিতে সাহায্য করতে পারেন মাত্র, তেমনি আপনি মানুষকে শিক্ষা দিতে পারেন না, তাকে সাহায্য করতে পারেন মাত্র। মানুষ মনে করে, ভাল কাজের মধ্যে থাকলেই ভাল হওয়া যায়, কিন্তু তা হয় না। মন যা চাইবে মানুষ তাই হবে। মনেই মানুষ, মনেই তার ভাল মন্দ। একজন টাকা পয়সা নিয়ে বেচা-কেনা ক'রে মনে করছে যে, জীবনে কিছুই হল না; আর একজন মন্দিরে ব'সে ভাবছে, টাকা পয়সা নাড়াই আমোদ, একটু কর্তৃত্ব করাই জীবনের সার্থকতা। কোথায় আছেন সেটা আপনার পরিচয় নয়; কি ভাবেন, কি চান, কি ভালবাসেন, মন কাকে চায়, অবসর সময় মন কি নিয়ে থাকে—সেটাই হল আপনার ঠিক পরিচয়।

"You cannot lose what you really are, you cannot jump out of your shadows." (আপনি যথার্থ যা তা আপনি

হারাতে পারেন না। আপনি আপনার ছায়াকে ছাড়িয়ে যেতে পারেন না)। নিজেকে ঠিক ঠিক জানতে হলে অন্তর দিয়েই জানতে হয়। কারণ অন্তর দিয়েই অন্তর জানা যায়; বুদ্ধি দিয়ে বুদ্ধি জানা যায়, অন্তর জানা যায় না।)

আপনার পূর্ব পত্রের উত্তর দিতে ভুলে গিয়েছিলাম। আজ হঠাৎ পত্রখানা চোখে পড়ল। "Faith and resignation" (বিশ্বাস ও আত্মসমর্পণ) শেষ কথা নয়, ওটা আরম্ভও নয়। যেটা শেষ সেটাই মাঝ এবং সেটাই আরম্ভ। উপায়টা উদ্দেশ্য ছাড়া নয়। একটা বিশ্বাস না হলে চলা সম্ভব নয়। কিছু ত্যাগ না করলে অগ্রগতি অসম্ভব। এই দুটিকে ভিত্তি করে জীবনের যাত্রা সুরু। সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ কখন কি ভাবে হবে তার ঠিক নেই; তা চেষ্টা করে হয় না। একটু মতলব, উদ্দেশ্য বা অন্য কিছু মনে থাকলে আর আত্ম-সমর্পণ হয় না। বিশ্বাস আর আত্মসমর্পণ নিয়ে চলতে হয়, আর চলতে চলতে বোঝা যায় যে, 'I am the way, I am the light and I am the truth.' (আমিই পথ, আমিই আলো এবং আমিই সত্য)। এক পথ, এক সংগ, এক আসন ও এক চিন্তা করার চেষ্টাই জীবনকে টেনে নিয়ে যায় আদর্শের দিকে। ভালবাসা নেবেন। ইতি—

নগেন

৫৩

স্নেহের—

তোমার পত্র ও প্রসাদ পেলাম। * * * তোমরা ঠাকুরের চিন্তা, তাঁর কথা আলোচনা ও তাঁর কাজ কর, তবেই মনে আনন্দ ও শান্তি পাবে। যতই নিজের ভাবনা ভাববে ততই দুঃখ বেশী করে আসবে। জগৎ জড়; এর কাজই হল দুঃখ দেওয়া। চৈতন্য আনন্দস্বরূপ। চৈতন্যের চিন্তা করলে আনন্দ হয়। যিনি আনন্দ-স্বরূপ। তাঁর চিন্তা করলে মনে আনন্দ ও শান্তি আসবেই। সুখ আর আনন্দ এক নয়। সুখ এলে তার সংগে দুঃখও আসে। তাই স্বামীজী বলেছেন, "ভ্রান্ত সেই যেবা সুখ চায়।" সুখের কথা ভেবো না। দুঃখেই মানুষের জীবন গড়ে ওঠে। সুখ কেবল ফাঁকি—সুখ দু'দিনের হাসি হেসে দুঃখের সাগরে নিয়ে যায়; আর দুঃখ মানুষকে মহৎ করে, জাগ্রত করে, চিন্তাশীল, বলশালী ও জ্ঞানী করে। সুখ আসুক আর দুঃখ আসুক, এ দুটোর সংগে কোন সম্বন্ধ না রেখে ইস্টের সংগে সম্বন্ধ স্থাপন কর, তবেই মন শান্ত হবে, আনন্দের আস্বাদ পাবে।

কিছুই চেয়ো না, নীরবে নিজের ব্যথা ব্যথাহারীকে জানাও। তোমার নীরব অশ্রুপাত ও মৌন বেদনা তাঁর কাছে পৌঁছাবে। তিনিই তোমার মনে শান্তি দিবেন। দুনিয়াতে শান্তি নেই, শান্তি অন্তরে। অন্তরের বস্তুর ধ্যানে ডুবে যাও।

শান্তি মানুষের হাতে। মানুষ অশান্তি ভোগ করে ইচ্ছা ক'রে। সকলেই সুখ চায়, দুঃখকে ভয় করে, শান্তি চায় না, অশান্তি হতে দূরে থাকতে চায়। শান্তি কেউ খোঁজে না। শান্তি চাইলেই শান্তি

পাওয়া যায়। ত্যাগই শান্তিলাভের একমাত্র উপায়। আশাত্যাগই ত্যাগ। কোন আকাংক্ষা, কোন আশা না রেখে, মনটা ইষ্টের চিন্তায় ডুবিয়ে দিয়ে সংসারে থাক, অশান্তি আসবে না। যখনই যার সংগ করবে, তখনই মনে কোরো যে, ইষ্টের সংগ করছ; তবেই কর্ম তোমার যজ্ঞে পরিণত হবে।

যেখানে দুঃখ, যেখানে ব্যথা, সেখানেই ভগবানের আসন। চিরদিন মানুষের দুঃখ থাকে না। ওঠা-পড়া আছেই। আজ যে সুখী কাল সে দুঃখী। আজ যে দুঃখী কাল তার দুঃখ নেই। যদি তীব্র ব্যাকুলতা থাকে, ইষ্টের প্রতি একান্ত অনুরাগ থাকে, তবে কার সাধ্য তার গতিকে বাধা দেয়? তাঁর পথে চলবার পাথেয় দুঃখ, অপমান, নির্যাতন, নিন্দা প্রভৃতি। এ সব আসবে নিশ্চয়ই, কিন্তু এরা হৃদয়কে উদার ক'রে মনের শক্তি বাড়ায় ও ইষ্টের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস জাগিয়ে দিয়ে অনন্তকালের জন্য কালসাগরে লীন হয়। যেটা যত বড়, তার জন্য তত বেশী দুঃখ পেতে হয়।

দুঃখ না পেলে তো জীবন বড় হয় না। যদি আদর্শ থাকে, আর আদর্শ লাভের চেষ্টা থাকে, তবে দুঃখের চেয়ে আর গুরু কেউ নেই। দুঃখ মানুষকে এমন জ্ঞান দেয় যা স্কুল-কলেজে বা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না; নীরবে কাঁদলে মনের ময়লা ধুয়ে যায়, অভিমান চলে যায়, দীনতা আসে। হৃদয় ব্যথায় ভরে থাকলে অন্তরে করুণার ভাব জাগে। করুণা ও দীনতা এলে আর অপ্রাপ্য কিছুই থাকে না। সংসারের ওপর রাগ বা অভিমান কোরো না। তা হলে ভগবান অভিমান চূর্ণ করার জন্য শত বাধা দেবেন। সংসারের যা প্রাপ্য তা দিয়ে, নিজের কর্তব্য কোরো সময় ও সুবিধা বুঝে।

জগতে এমন কেউ জন্মায় নি যে দুঃখ পায় নি। দুঃখ আসবেই, তার মধ্যে যতটুকু সম্ভব নিজের আনন্দ লাভ করবার চেষ্টা থাকা উচিত। অবসাদ এলে জীবন নষ্ট হয়, নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। নিজের কাজ অর্থাৎ পড়াশোনা, ধ্যান ধারণা নিয়মিত থাকা উচিত, তবেই একদিন নিরাশার মেঘ কেটে যাবে, আবার সূর্যোদয় হবে, আবার আনন্দ ও শান্তি আসবে। মনের দৃঢ়তা নিয়ে চলতে হয়। সুখ দুঃখ যাই আসুক না কেন, নিজের কাজ করে যাবই। এই অবস্থা হলে হৃদয়কে আঁধার বেশীদিন আচ্ছন্ন রাখতে পারে না। দুঃখ দুঃখ করলে দুঃখই আসবে। আনন্দ আনন্দ বললে আনন্দ পাবে। যেটা মনে মনে চাইবে জীবনটা তাই হয়ে যাবে। আনন্দ চাইতে চাইতে দুঃখ পালাবে আর আনন্দও পাবে। দুর্বল ভাবলে দুর্বলই হবে, আর সবল ভাবলে সবলতা আসবে। অবসাদ আনার চেয়ে মহাপাপ নেই জানবে। অবসাদ এলে চিরজীবন কেবল দুঃখই ভোগ করতে হয়। সমুদ্রের ঢেউ থামলে স্নান করতে চাইলে আর স্নান করাই হয় না। ঢেউ থাকতে থাকতেই স্নান করতে হয়—কেবল কৌশলটা জানা চাই। এই কৌশলটাই যোগ।

সুখ, দুঃখ, ভাল মন্দ জগতে আছেই—এরই নাম সংসার। সে দিকে মন দিলে দুঃখ অনিবার্য। আর ইষ্টের দিকে মন দিলে সংসারের দুঃখ, দুঃখ বলে মনে হবে না। ইষ্টের দিকে মন দিয়ে সংসারের দুঃখ ভুলবে, না সংসারের দিকে মন দিয়ে ইষ্টকে ভুলে দিনরাত অশান্তি ভোগ করবে? পুষ্কর তীর্থে যাই। সেখানে একটি হ্রদে স্নান করতে হয়। সেই হ্রদে যথেষ্ট কুমীর আছে। তারা অনবরত ঘুরছে। তা জেনেও তাতে ডুব দিতে হয়, দাঁড়িয়ে মন্ত্র

বলতে হয়। অবশ্য নজর রাখতে হয় কুমীরের দিকে। তখন মনে হয়েছিল সংসারের কথা। সংসারে অনবরত কুমীর ঘুরছে, সুবিধা পেলেই আক্রমণ করবে, কিন্তু এরই মধ্যে সমস্ত কাজ সারতে হবে। এমন সময় জীবনে কখনও আসবে না যখন সংসারের সকলেই তোমার মতে মত দেবে। তোমাকে বাধা দেবে না। তা কখনই হয় না। তোমার মনে শান্তি হোক। ভালবাসা নিও। ইতি—

নগেন

৫৪

পাবনা

স্নেহের—

তোমার পত্র পেলাম। আমি দেওঘরে নেই, পাবনাতে এসেছি। আবার কাজ সারা হলে চলে যাব। এই যাওয়া আসাই জীবন। যতদিন জীবন ততদিন দূরে নিকটে ঘুরে ফিরে যাওয়া আসা করতেই হবে। জানি না জীবনে যাওয়া আসা থামবে কি না। এ চলার পথে কারও চলার বিরাম নেই। চলতে চলতে কে কবে আড়ালে লুকাবে তাও জানা নেই। মা ছেলেকে ছেড়ে, ছেলে মাকে ছেড়ে যে আড়ালে দাঁড়ায়, এতো অহরহ দেখছ। এই আড়ালে যাওয়াটা তো চিরকাল চলবে, তবে আশ্চর্য এই, মানুষ একবারও সে কথা ভাবে না। আর ভাবে না, যে লোক চলতে চলতে আড়ালে চলে যায়, আর সামনে আসে না, সে কোথায় যায়, কি ভাবে সেখানে থাকে। এতবড় একটা ঘটনাকে মানুষ বেশ ভুলে থাকে, এটা আরও আশ্চর্য।

কেউ আড়াল থেকে সামনে এসে দাঁড়ায়, আর কেউ বা সামনে থেকে আড়ালে চলে যায়। এ নিয়ম অপরিবর্তনীয়।

"কোথা হতে আসি মোরা কোথা চলে যাই,
ভাবুক সুজন একবার ভাব তাই।"

তবেই দুঃখের অবসান হবে। ঝড় হয়, বৃষ্টি হয়; দিন যায়, রাত আসে। সুখ নিভে যায়, দুঃখ জ্বলে ওঠে। তাতে আমাদের উদ্বেগ বা অশান্তি নেই—জানি এটা নিয়ম। এ সম্বন্ধে কোন কথা মনেই ওঠে না। কিন্তু কেউ আড়ালে দাঁড়ালেই আশ্চর্য হয়ে কথা বলি, শোক করি, দুঃখ করি। পথ স্থির হয়ে আমাদের হায় হায় আপশোষ শোনে আর মনে মনে হাসে। হয় তো বলে, এ পথের এই নিয়ম, এই পরিণাম। যে এই পথে চলতে আরম্ভ করেছে তাকে আসতে হয়েছে সূর্যোদয়ে, আর চলে যেতে হয়েছে সূর্যাস্তে। এ চিরকাল চলছে ও চলবে। যে ভাবুক, যে চিন্তাশীল, যে একটু তাকিয়ে চলে পথে সে কিন্তু আপশোষ করে না, বরং উল্টোটাই বলে—

"যাত্রী আমি ওরে,
পারবে না কেউ রাখতে আমায় ধরে।
দুঃখ সুখের বাঁধন সবই মিছে,
বাঁধা এ ঘর রইবে কোথায় পিছে;
যাত্রী আমি ওরে,
যা-কিছু ভার যাবে সকল সরে।

আকাশ আমায় ডাকে দূরের পানে,
ভাষাবিহীন অজানিতের গানে
সকাল সাঁঝে পরাণ মম টানে,
কাহার বাঁশি এমন গভীর স্বরে।”

কেউ কিছু সংগেও নিয়ে আসে না, আর সংগেও কিছু নিয়ে যায় না। মা বাপ, স্বামী স্ত্রী, পুত্র কন্যা, ভাই বোন, বিষয় আশয় সব থাকে প'ড়ে; শূন্য হাতেই চলে যেতে হয়। এক ঘাটে পূর্ণ করে আর এক ঘাটে খালি করে দিতেই হয়। শূন্য না করলে সেখানে যাওয়া যায় না। সকলকেই চলে যেতে হয়, ও শূন্য হাতেই যেতে হয়। অবশ্য মনে লাগে, কিন্তু পথের অধিকার যার উপর তার চোখে কোনদিনই জল দেখা যায় না। এই আসা যাওয়ার মধ্যেই নিজের নিজস্ব যে খুঁজে নিতে পেরেছে, সে পথের ধারে দাঁড়িয়ে যাত্রীদের এই চলার লীলা দেখতে পায়। তার নিজের আসা যাওয়া চিরদিনের তরে বন্ধ হয়ে যায়। এখন বিদায়। ভালবাসা নিও। ইতি—

নগেন

৫৫

প্রিয়—

আমাকে ও-ভাবে প্রণাম করলে বড় কষ্ট হয়। আমাকে সমান মনে কোরো। তোমাদের চেয়ে এ শরীরটার বয়স বেশী; কিন্তু মনে, অন্তরে, জীবনে তোমরাই অনেক বড়। সম্মান ও প্রশংসা এই দুটোকেই বড় ভয় করি। এসব থেকে দূরে থাকবার চেষ্টা করি

সাধ্যমত। একটু ভালবাসা পেলেই যথেষ্ট, তার বেশী আর কিছুই আশা করি না। রবিবাবুর কথায় মনের ভাবটা ব্যক্ত করছি—

"বহুদিন মনে ছিল আশা
ধরণীর এক কোণে,
রহিব আপন মনে,
ধন নয়, মান নয়, এতটুকু বাসা
করেছিনু আশা।

* * *

বহুদিন মনে ছিল আশা
প্রাণের গভীর ক্ষুধা
পাবে তার শেষ সুধা
ধন নয়, মান নয়, কিছু ভালবাসা
করেছিনু আশা।"

এর অধিক আর কিছুই চাইনি; এখন তাও চাই না। আমার নিজের কাজ হল ভালবাসা ও সেবা করা। এর বেশী আর জানি না, আর কিছু চাইও না। মান, যশ, অর্থ বা সম্মানের যোগ্য আমি নই; তাই এ সব কোনদিন আকাংক্ষাও করিনি। আমি হলাম ঝাড়ুদার। অধিক সম্মান আমার প্রাপ্য নয়। আর ঝাড়ুদারকে বেশী সম্মান দেখানোও উচিত নয়। তোমাদের কাছ থেকে প্রণাম নেবার আমার অধিকার নেই। তোমরা আমার প্রণম্য। তাই আমি সকলকে প্রণাম করছি। তোমাদের সকলের আশীর্বাদ

চাই। এ পথে চলতে হলে সবার পায়ের ধূলি, সবার আশীর্বাদ দরকার হয়।

* * *

অন্যের কাছে গিয়ে কি কিছু লাভ আছে?

"শাস্ত্রে বা মন্দিরে বৃথা অন্বেষণ
নিজ হস্তে রজ্জু—যাহে আকর্ষণ।"

নিজের চেষ্টা বিনা কিছুই হয় না। সাধন না করলে কিছুই ধরে রাখা যায় না। আগে অধিকার অর্জন করতে হয়, তারপর পাবার আশা। এর উপায় হল, Vigilance—eternal vigilance is the price of liberty. Do it now. Watch and pray. Sit in a sincere and prayerful mood and make the mind blank. Drive off all the desires and thoughts, success or failure, praise or criticism. Stick to your ideal—do not swerve an inch from it. Stick to it in the midst of sorrow—stick to it in the midst of degradation and difficulty. Light must come. (চাই সদা জাগ্রত ভাব। মুক্তি লাভ করতে হলে চাই নিরবচ্ছিন্ন সতর্ক জাগরণ। এই মুহূর্তে লেগে যাও—নিজের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখে প্রার্থনা কর। অন্তরের সহিত প্রার্থনাপূর্ণ ভাব নিয়ে বসে যাও—মনকে ফাঁকা করে ফেল। সমস্ত বাসনা, সকল চিন্তা, সফলতা বিফলতা, নিন্দা প্রশংসা সব ঝেড়ে ফেলে দাও। আদর্শকে আঁকড়ে ধর। আদর্শ থেকে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়ো না। দুঃখে-দুর্বিপাকে বা পতনে উত্থানে সর্ব অবস্থায় আদর্শকে আঁকড়ে থাক। আলো আসবেই।)

একটা কথা মনে রেখো, পরের দোষ দেখলে ধীরে ধীরে সেই দোষ নিজের ভিতরও সংক্রমিত হয়। আমরা তো গুরু নই। আমরা পরের দোষ দেখতে এবং তাদের সংশোধন করতে আসিনি। কেউ কথা শুনবে না, কেউ কথা শোনে না এবং শুনতে পারে না ; যেহেতু প্রত্যেকেই নিজ নিজ বুদ্ধি ও সংস্কার নিয়ে চলছে।

একটা ভাব স্থায়ী কর। বেশী জিনিষ নিয়ে নাড়াচাড়া করে সময় ও শক্তি নষ্ট কোরো না। সময় ও শক্তির সদ্ব্যবহার না করলে তা আর ফিরে পাবে না। যেটা যায় সেটা আর ফিরে আসে না ; তাই খুব সংযত হয়ে, একটি ভাব নিয়ে পড়ে থাক্‌তে হয়। কামনার মধ্যে একটি কামনাই শ্রেষ্ঠ—

নত্বহং কাময়ে রাজ্যং ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
কাময়ে দুঃখতপ্তানাং প্রাণিনামার্তিনাশনম্॥

আমি সাম্রাজ্য চাই না, স্বর্গ চাই না, এমন কি মুক্তিও চাই না। আর্তের দুঃখ নিবারণ করাই আমার একমাত্র কামনা। যতদূর সম্ভব পরের অনিষ্ট (কায়া দ্বারা, বাক্য দ্বারা অথবা মনের দ্বারা) না করাই যথেষ্ট পরের উপকার। অন্য উপকার না করলেও ক্ষতি নেই।

মানব জীবনের স্তম্ভ চারটি—Love, Liberty, Truth and Justice. (প্রেম, স্বাধীনতা, সত্য ও ন্যায়)। এর কোন একটি নষ্ট হলেই মানুষ তথা জাতিও নষ্ট হয়ে যায়। এই চারটিকে বজায় রাখাই জীবনের সাধনা। এইগুলো যদি হয়, তবে মনুষ্যত্ব ফুটে উঠ্‌বে, পশুত্ব ঘুচে যাবে ; আর তখনই তুমি আধ্যাত্মিক জীবনের উপযোগী

হবে; তার আগে নয়। আধ্যাত্মিকতা, সভ্যতা ও জাতীয়তা একই সূত্রে গাঁথা। এদের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য। সবই এক সংগে চলতে পারে; এবং এগুলি সব একসংগে চললে তবেই হয় সর্বাংগীণ উন্নতি। আধ্যাত্মিক জীবন হল জীবনের প্রাচুর্য। আধ্যাত্মিক জীবন এলে মানুষের দয়া, ভালবাসা, জ্ঞান, প্রেম, সহানুভূতি, স্বাধীনতা সবই উপ্‌চে পড়ে। আমাদের জীবন সত্যিকার জীবন নয়; তাই আধ্যাত্মিক জীবনের ধারা, আর এ জীবনের ধারা একই খাতে প্রবাহিত হয় না। গতানুগতিক জীবনের সংগে আধ্যাত্মিকতার কোনও সম্বন্ধ নেই, তাই ব্যক্তি, সমাজ, জাতি সবই এক সংগে পড়ে গেছে; আর উঠ্‌তে পারছে না। এই সব ত্রুটি দূর না হলে আমাদের আধ্যাত্মিকতা ঠাকুরঘরে অথবা কীর্তনের আসরেই সীমাবদ্ধ থাকবে। যেটা জীবনের সংগে যুক্ত নয়, সেটা কখনও জীবন্ত হয়ে ওঠে না।

সবাই কি আধ্যাত্মিক জীবনের অধিকারী? Physical plane, plane of desire, plane of intellect (শরীরের স্তর, বাসনার স্তর ও বিচারের স্তর) প্রভৃতি ছাড়িয়ে গেলে, তবে তো আধ্যাত্মিক জীবনের অনুসন্ধান আরম্ভ হয়। নতুবা কেবল অন্ধ অনুকরণ। আধ্যাত্মিকতার একটু আভাস পেলে মানুষ যে আনন্দ পায় তা সামলাতে পারে না—সমস্ত জীবন আনন্দময় হয়ে ওঠে। ভালবাসা নিও। ইতি—

তোমাদের নগেন

৫৬

পাবনা

মা,

তোমরা যদি ঘরে থাকতে না চাও, তবে ঘরে থাকবে কি ভূতপ্রেত ? তোমরা আছ তাই এখনও হিন্দুর হিন্দুত্ব লোপ পায়নি ; তাই এখনও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ জন্মায়। তোমরা চিরকালই নীরবে সহ্য করে থাক ; সহ্য করাই তোমাদের ধর্ম। তোমাদের ধৈর্য আছে বলেই সংসার চলছে। তোমরা যদি অধীর হও, তবে কে আর এই তাপিত সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা দূর করবে ? যুগে যুগে যে সব অবতার জন্মগ্রহণ করেন তাঁদের জীবনের দিকে তাকাও। তাঁরা আসেন লোকের দুঃখ দূর করার জন্য। লোকের দুঃখ দূর করার জন্য তাঁরা কত কষ্ট, কত যন্ত্রণা সহ্য করে গেছেন ; তাঁরাই তোমাদের আদর্শ। তোমাদের নীরবে সমস্ত অত্যাচার সহ্য করতে হবে তাদের জন্য, যারা দিনরাত অত্যাচার করছে, দুঃখ-যন্ত্রণা দিচ্ছে। মা অধীর হলে কি সন্তান বাঁচে ? তুমি নিজের সুখের জন্য দূরে যেতে চাও ; তবে এই জ্বালা যন্ত্রণা দূর করবে কে ? মা'দের কাছে তো আমাদের যাবার উপায় নেই ; সেখানে যে তোমাদেরই যেতে হবে। তাদের মধ্যে তপস্যার ভাব জাগাতে হলে যে তোমাদেরই তৈরি হতে হবে। তোমরা নিজেরা কষ্ট ভোগ করে সন্তানদের আনন্দ দান কর। তোমরা নীরবে আগুনের উত্তাপ সহ্য করে রন্ধন কর ; কিন্তু রন্ধন যখন শেষ হয়, যখন সকলে আনন্দ করে খায়, তখন তোমাদের প্রাণে যে আনন্দ হয় তার তুলনা নেই। দুঃখ কষ্টের কথা তখন একটুও মনে থাকে না।

আগুন নিয়েই যে তোমাদের খেলা। আগুন দেখে তোমরা কখনও ভয় পাওনি। সমস্ত লংকা পুড়ে গেল, তবু তো জানকী একটুও বিচলিত হন নি; কারণ রাম তাঁর হৃদয়ে বর্ত্তমান। রামচিন্তায় যিনি অহর্নিশ নিমগ্না তাঁর দুঃখ কোথায়? আর, তাঁর জন্য দুঃখ সহ্য করা তো ভাগ্যের কথা। বাইরে ঝড় হোক, বৃষ্টি হোক, তোমার ভিতরটা থাকবে ধীর স্থির। জান তো, কুন্তী কি বলেছিলেন, "হে ভগবান, চিরদিন যেন দুঃখে রেখো, তাহলে তোমাকে ভুলব না।" যখন ঐহিক সুখই কাম্য হয়, তখন আমরা তাঁকে চাই না। যখন দুঃখ কষ্ট আসে তখন মনে হয় মায়ের কথা নয়নের জলে। চোখের জল যত পড়বে ততই পাপ ক্ষয় হবে এবং ভগবানে আসক্তি হবে। তাঁর দিকে মন যত যাবে, ততই মন শান্ত হবে।

* * * কোন কথার জবাব দিও না। নীরবে গুরুজনের সেবা করে যাও; আর ভগবানের কাছে তাঁদের কল্যাণের জন্য, তাঁদের মতিগতি পরিবর্ত্তনের জন্য, প্রার্থনা করে যাও; ভগবান সে প্রার্থনা শুনবেনই শুনবেন। দেখবে, যারা তোমার শত্রু ছিল তারাই তোমার মিত্র হবে। রিপু সম্বন্ধেও তাই। কাম ক্রোধাদি রিপু প্রথমে খুব বাধা দেয়, কিন্তু যখন আর কিছুতেই পারে না বাধা দিয়ে নিরস্ত করতে, তখন পরম বন্ধুর মত সাহায্য করে। এটা প্রত্যক্ষ সত্য।

তোমাদের সেবায় জীবন যেন উৎসর্গ করতে পারি, এই আশীর্বাদ কর। তোমরা মা, কাজেই তোমাদের বয়স বা জাতি নেই—তাই প্রণাম করছি। ছেলেকে আশীর্বাদ কর। তোমাদের আশীর্বাদে মানুষ হব। ইতি—

'ছেলে'

৫৭

মা,

তোমার যা-কিছু দরকার মা তা বেশ জানেন ; কাজেই ব্যস্ততার কোন প্রয়োজন নেই। রামকৃষ্ণ বলতেন, সময় না হলে পাখি ডিম ঠোকরায় না। চেষ্টা, দৈব ও সময় এই তিনটির যোগাযোগ না হলে গুরুশিষ্যের মিলন হয় না। প্রাণপণে ডাক, তাঁর নাম করে যাও, তিনিই তোমার সমস্ত বাসনা পূর্ণ করবেন। যাঁকে ভাল লাগে তাঁকে স্মরণ কর, যে নাম ভাল লাগে সেই নাম জপ করে যাও। আর যা-কিছুর প্রয়োজন তা মা দেখিয়ে দেবেন। তিনি যদি ডাক না শুনতেন, তবে কি তুমি তাঁর জন্য ব্যাকুল হতে ? তাঁর কৃপা না হলে তাঁকে পাবার চেষ্টাই হত না। আর আসল কথা এই, আমরা তাঁকে ডাকছি না। প্রকৃতপক্ষে তিনিই ডাকছেন। কিন্তু আমরা শুনছি না। তিনি দিবানিশি ডেকে যাচ্ছেন, আমরাই সাড়া দিচ্ছি না। কিন্তু তাই বলে তাঁর কৃপার বিরাম নেই। মা, তাঁকে যে চিন্তা করছ সে তাঁরই কৃপায়, এটা ভুলো না। তাঁর ডাক তোমার কানে পোঁছেছে, তাই তুমি আজ এত উতলা হয়েছ। যত দিন যাবে তত ব্যাকুল হবে প্রাণ তাঁর দর্শনের জন্য। তাঁর বাঁশরী বাজছেই। আর সেই বাঁশী যার কানে পোঁছেছে সেই ব্যাকুল হয়েছে তাঁর সংগে মিলিত হবার জন্য। জীবন মন তাঁতে সমর্পণ কর ; আর যা প্রয়োজন তা তুমি নিজেই টের পাবে। লোকের বাধাতে ভয় পেও না, লজ্জাও কোরো না। প্রিয়তমের জন্য সব সয়ে যাও। তাঁর মুখ চেয়ে, সব ভুলে যাও। মা যে প্রসব বেদনা ভোগ করে, ছেলের মুখ দেখলে তা আর মনে থাকে না। নতুন বৌ শ্বশুরবাড়িতে প্রথম প্রথম কত কষ্ট সহ্য

করে, কিন্তু স্বামীর সংগে দেখা হলে আর তার কোন কষ্টই মনে থাকে না। যতক্ষণ দেখা না হয় ততক্ষণ মনে হয়, কখন তাঁর দেখা পাব, কখন প্রাণের কথা জানাব।

মা, এই সংসারে সকলেই স্ত্রী। একমাত্র স্বামী হচ্ছেন প্রেমাস্পদ ভগবান। তাঁর দর্শন হলে সব দুঃখ দূর হবে। তবে যতক্ষণ দেখা না হয় ততক্ষণ দুঃখ জ্বালা। যত অত্যাচার হয়, ততই স্বামীর কথা মনে পড়ে, ততই তাঁর অভাবটা বেশী অনুভব হয়। কাজেই অত্যাচারটা এই পথের খুব সাহায্যকারী বন্ধু—আর একটা পরীক্ষাও বটে। গাছ যত বড় হয় তাতে ঝড় তত বেশী লাগে। এখন যারা তোমার বিপক্ষে, সময়ে তারাই তোমার পরম বন্ধু হবে, তোমাকে সাহায্য করবে। মা, যারা দুর্বল, যারা প্রেমহীন, যারা ভালবাসার ব্যবসা করে তারাই প্রতিদান চায়, তারাই দুঃখকে ভয় পায়। যারা সত্য সত্য প্রেমিক, যারা ভালবাসা বিক্রয় করে না, তাদের বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না। তারা সমস্ত নীরবে সহ্য ক'রে আরো বেশী ক'রে প্রিয়তমকে আঁকড়ে ধরে। গালমন্দ এ সমস্ত গ্রাহ্যের মধ্যে এনো না। ওদিকে মন দিলে প্রিয়তমের দিকে মন দিতে পারবে না। ভালবাসা কি কাউকে শিখিয়ে দিতে হয়? তবে ভালবাসা বস্তুবিশেষে ভিন্ন। কেউ টাকা, কেউ মান, আবার কেউবা দেহকে ভালবাসে। প্রকৃত ভালবাসা খুব কম লোকেরই হয়। তাই খুব কম লোকই শান্তি পায়। যারা বিষয় ভালবাসে তারা পরমার্থকে ভালবাসতে চায় না। তাই তারা এত বাধা দেয়। যারা দেহকে ভালবাসে তারা আত্মা-পরমাত্মার চিন্তা করাকে সময় নষ্ট করা ব'লে মনে করে। আবার যারা পরমার্থ চিন্তা করে, তারাও বিষয় চিন্তা করতে পারে না। তাদের ধারণা যে, বিষয়

চিন্তাই সমস্ত দুঃখ ও অশান্তির মূল। তুমি আপন মনে কাজ করে যাও —সাধ্যমত সেবা করে যাও ; কারো কথার উত্তর দি'ও না—কোন তর্ক কোরো না। প্রাণ দিয়ে সকলের কল্যাণ প্রার্থনা কর, তাদের যাতে চৈতন্য হয়, সেজন্য মা'র নিকট দিবানিশি প্রার্থনা ক'রে যাও। এমন দিন শীঘ্রই আসবে যখন সকলেই তোমার পথের পথিক হবে। ইতি—

ছেলে

৫৮

ভাই—

তোমার পত্র পেলাম। * * ধর্ম জিনিসটা এত বিকৃত হয়েছে যে ভাবতেও হাসি পায়। স্বামীজীর সেই কথাই মনে হয়—"জ্ঞানের দেশ যে অজ্ঞানে ডুবেছে!" যেটার অভাব সেটা অর্জন করাই ধর্ম। আগে সেটা অর্জন করা হোক, তারপর তাকে ত্যাগ করা বেশী কঠিন হবে না। গীতা, উপনিষদ ও বেদান্ত না পড়লে বা না জানলে মনুষ্যত্বের বিকাশ অসম্ভব। মানুষ না হলে ধর্মজীবন আরম্ভ হবে কি করে? কর্ম ও জ্ঞান দ্বারা পশুত্ব নষ্ট ক'রে মনুষ্যত্ব ফুটিয়ে তুলতে হবে ; তারপর ভাব, প্রেম, লীলা ইত্যাদি। বিরাটের উপাসনা দরকার। ব্যষ্টিকে এখন সমষ্টির সংগে ও সমষ্টিকে নিয়ে চলতে হবে, নইলে অধ্যাত্মজীবন লাভ অসম্ভব। স্বামীজী যে Practical Vedanta (কর্ম-জীবনে বেদান্ত) বলে চীৎকার করেছেন তা এইজন্যই। জীবনের সংগে যে ধর্ম বা দর্শনের সম্বন্ধ নেই, সে ধর্ম বা দর্শন এখন অচল। এখন রামানুজ, শংকর বা অন্য কোন ভাষ্য চলে না। এখন ভাষ্য হচ্ছে নিজের ব্যক্তিগত জীবন। * *

তোমাদের নগেন

পুঃ—যে অবস্থায় থাক না কেন, স্মরণ, মনন, জপ ছেড়ো না। নিত্য কিছু পাঠও দরকার। দুর্দিন চিরদিন থাকে না—একদিন হয় তো শান্ত হবে। ইতি

৫৯

কল্যাণীয়াসু—

মা, তোর পত্র পেয়েছি। আমার কোন স্থায়ী ঠিকানা নেই, তাই পত্র দিই নি। * * * জীবনটা কেন বৃথা যাবে মা? অসুখ হোক আর সুখই হোক জীবন-প্রবাহ যখন চলেছে, তখন সে নিশ্চয়ই তার লক্ষ্য বস্তুর দিকে চলেছে, যদিও খুব কম লোকই তা জানে। যতদিন পর্যন্ত জীবননদী তার লক্ষ্য সমুদ্রে গিয়ে না পড়ে, যতদিন পর্যন্ত সে তার হারানো বস্তুর সন্ধানে নিজেকে নিঃশেষ করে অতলে ডুবতে না পারে, ততদিন কি মা, চলার বিরাম আছে? সেই সাগরের গর্জন শোনা যাচ্ছে, তার আহ্বানও কানে প্রবেশ করছে, তার বাতাসও গায়ে লেগেছে। তাই তো জীবন-প্রবাহ ছুটেছে অধীর হয়ে। যখন এই প্রবাহ থেমে যাবার উপক্রম হয়, তখন হয় এমন একজনের প্রয়োজন যে ভগীরথের মত শংখ বাজিয়ে তাকে সেই অসীমের দিকে নিয়ে যায়। মা, তোর তো সে ভগীরথও মিলেছে, তবে কেন দুঃখ। যিনি খুঁজে দিয়েছেন তোর ভগীরথকে তিনি তো জানেন সবই, তিনিই সব কিছু ঠিক করে দেবেন। যিনি সকলের অন্তরে বাস করেন ও অন্তরটা জেনে যা-কিছু করার করেন, তাঁর উপর বিশ্বাস ক'রে, তাঁর হাতে সব সঁপে দিয়ে, তুই কেন স্রোতে

গা ভাসিয়ে বসে থাক না? "অনন্ত সমুদ্র মাঝে দাও তরী ভাসাইয়া যাক সুখ, যাক দুঃখ, যাক সব ডুবিয়া।" মা, দুঃখটাই কি বড় হ'ল? দুঃখে যখন বুক ভেঙে যায় তখন সে ভাঙা বুককে যিনি জোড়া দিয়ে যান, তাঁর কোমল স্পর্শ কি কিছুই নয়? যখন দুঃখে চোখের জল ঝরে তখন সেটাকেই বড় করিস, আর যিনি ব্যথার ব্যথী হ'য়ে তোর চোখের জল মুছিয়ে দেন, তাঁর কি কোন মূল্য নেই? বরং তাঁর মূল্যই বেশী। সংসারে রোগ, শোক, দুঃখ সবই আছে, সবই থাকবে, কিন্তু ধন্য সেই যে এই দুঃখের সংসারে একজন দরদী পায়। তিনি যে আড়ালে থেকে সব করেন মা—সব করেন। তাঁকে কিছুই বলতে হয় না। তিনি খুবই নিষ্ঠুর, কিন্তু ভালবাসেনও খুব। তিনি যে চোখের জল দেখতে ভালবাসেন, তাই ব্যথা দিয়ে ব্যথার আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকেন। তিনি আস্তে আস্তে এসে কাছে দাঁড়ান আর আদর ক'রে চোখের জল মুছিয়ে দেন। ব্যথা না পেলে কে তাঁকে খুঁজত? কে তাঁর মর্যাদা দিত? তাই দুঃখ দিয়ে তিনি তোর মান রাখেন। তিনিই দরদী হয়ে, মা হয়ে, সখা হয়ে, গুরু হয়ে এসে চোখের জল মুছিয়ে আদরে বুকে টেনে নেন। তিনি যে ছদ্মবেশে আসেন। নিজ বেশে এলে যে তঁকে সকলেই প্রত্যাখ্যান করবে!

"দুঃখ মিছে, কান্না মিছে,
দুদিন আগে, দুদিন পিছে,
মিলব সবাই একই ঠাঁই
বেয়ে এই ভব নদী।"

দুঃখের আঁধারে যাঁর কোমল স্পর্শ পাও, তাঁকে আঁকড়ে ধর। দুঃখকে ধরে লাভ কি? সেই আঁধারে যাঁকে হাতড়ে পাও তাঁকে

বুকে টেনে নাও। তিনি যে দুঃখের মুখোস পরে এসেছেন—তিনি যে তোমারই অন্তরের অন্তঃপুরে সদা বাস করেন! তিনি চিরদিনই ঘোমটা দিয়ে থাকেন; তাঁকে টেনে নাও কাছে। কখনও যদি ঘোমটা তুলে তাঁর মুখ দেখতে পাও, তবে দেখবে তিনি দর্শনে রুদ্র পরশনে শিব। * * * ভালবাসা নিও মা। বিদায়। ইতি—

নগেন্দ্র

৬০

স্নেহের—

তোর পত্র পেলাম। আমার শরীর একরূপ আছে। * * যেটা স্বভাব তা কি আর ছাড়া যায়? "স্বভাব ছাড়িয়া ভজে, ভজি তার পায়।" নিজের ইচ্ছার দিকে জগৎটাকে টানলে দুঃখ পেতেই হয়। যদি জগতের প্রবাহের সংগে নিজের ইচ্ছা যোগ করে চলা যায়, তবে ঘাতপ্রতিঘাতে কিছু কম ভুগতে হয়। নিজের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলে, তবে জীবন আরম্ভ হয়। মানুষ অনেক কিছু কল্পনা ক'রে নিয়ে চলতে থাকে; আর কল্পনা অনুযায়ী যখন ফল পায় না তখনই তার দুঃখ। বীজ পুঁতলে গাছ হবেই। বীজ না পুঁতে গাছ আর ফল চাওয়া যেমন পাগলামি তোদের অবস্থাও তেমনি। যেটা মানুষের প্রকৃত অভাব প্রকৃতিই তা পূর্ণ করে থাকে। ধারকরা ভাবটা আপনার করতে অনেক সময় লাগে। ডুব দেবার ক্ষমতা একদিনে লাভ করা যায় না। একটা বিষয়ে গভীর ভালবাসা না হলে ডুবে যাওয়া সম্ভব নয়। ভালবাসা হলে তারপর কি করতে হয় তা আর জেনে নিতে হয় না। সব নিজে নিজেই টের পাওয়া যায়।

ব্যাকুল হৃদয়ে প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর কাছে প্রার্থনা করিস। তোরা জগতে এসেছিস নীরবে সমস্ত ব্যথা ও কষ্ট সহ্য করতে—নীরবেই কেঁদে যা। তোদের জীবন নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নয়। তোরা জগতের কল্যাণের জন্য, সকলের মংগল কামনায় নিজের সুখ বিসর্জন দিয়ে যা। কেবল সংগী রাখ প্রার্থনাকে। জগতের ভাল মন্দ জগতে থাক, সেদিকে তোর চেয়ে দেখার কোন প্রয়োজন নেই। "আপনাতে আপনি থাক মন যেও নাকো কারো ঘরে, যা চাবি তা বসে পাবি খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।"

দুনিয়াতে সকলেই দুঃখী। কেউবা দেহের অসুস্থতার জন্য দুঃখভোগ করে, আর কেউবা মনের শান্তি পায় না; সবারই দুঃখ আছে। সব বন্ধু চলে যাবে, একমাত্র বন্ধু সংগে থাকবে চিরদিন—সে দুঃখ। সেই দুঃখকে আপনার করে নাও, তাকে সংগে করে ভগবানের পথে চল। যার কিছু আছে তার সব সময় ভয় থাকে, কখন তা হারাবে। যার হারিয়েছে তার আর কোন ভয় নেই। মার নাম অভয়া। যখন মানুষ পৃথিবীর সুখ হারিয়ে, ভয় পেয়ে কেঁদে ওঠে, তখনই মা আমার আসেন অভয় দিতে। যিনি সকলের পিছনে আছেন তিনি জানেন, কখন সময় হবে, আর কার কি অভাব। মানুষ চেষ্টা করে, ভাবেও অনেক, কিন্তু যেটা হবার তাই হয়। নিজের কোন কল্পনাই ঠিক হয় না; সুতরাং নিজের সুবিধামত না ভেবে তাঁর ভাবনা করলে সব দিকেই লাভ। দিন আসে, দিন যায়। কারও দিন চিরকাল একভাবে থাকে না। কিন্তু প্রত্যেক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে জীবনকে এগিয়ে দেয়—যদিও খুব কম মানুষ তা টের

পায়। সময়ের ওপর কারও হাত নেই। সময়ে মানুষ জন্মায়, সময়ে বড় হয়, আবার সময়েই চলে যায়—এ নিয়ম রোধ করে কারও সাধ্য নেই। পরিবর্তন না থাকলে জন্ম-মৃত্যু, মিলন-বিচ্ছেদ, সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ এসব থাকত না। সবই স্থির থাকত ; যে যেখানে সে সেখানেই থাকত। যেটা স্থির তাকে পেতে হলে নিজেকেও স্থির হতে হয়। যতক্ষণ নিজের ভিতরে অস্থিরতা আছে ততক্ষণ পরিবর্তনও আছে, দুঃখও আছে। যেখানে স্থিরতা সেখানে চঞ্চলতা বা দুঃখের কোন স্থান নেই। হাত পা ছেড়ে দিয়ে, নিজের ইচ্ছা লুপ্ত করে তাঁর ইচ্ছায় ভেসে যাওয়াই একমাত্র পথ, অন্য পথ নেই। আশা থাকলে নৈরাশ্য আছে, সুখ থাকলে দুঃখ অনিবার্য। জগতে সর্বত্র ভয়। স্বাস্থ্যে রোগের ভয়, সুখে দুঃখের ভয়, যশে অপযশের ভয়, মানে অপমানের ভয়, এইভাবে সর্বত্র ভয়। এক ভয় নেই তাঁর চরণে ; তাই তাঁর অভয় চরণে শরণ নিতে হয়। সুখ দুঃখের ভিতর দিয়ে জীবনকে গড়ে তুলছেন মা আড়াল থেকে। মনটাকে এমনি ভাবে তৈরি কর্ যাতে যাবার সময় বলে যেতে পারিস, "যা দেখেছি যা পেয়েছি তুলনা তার নাই।" যেন কোন আপশোস না থাকে। আর লেখবার কিছু নেই। ভালবাসা নিস। ইতি—

নগেন

৬১

স্নেহের—

তোমার পত্র পেয়েছি। ** গ্যেটে বলেছেন—"Great passions are hopeless diseases" (প্রবল আসক্তিগুলো সবই দুরারোগ্য ব্যাধিসদৃশ।) কাজেই মানুষের দুঃখ যাবার নয়। যতদিন রোগ ততদিন ভোগ। সে সম্বন্ধে আর দুঃখ ক'রে লাভ নেই। "A man is not deceived by others, he deceives himself. To be and to remain true to oneself and others is to possess the noblest attribute of the great talents." ("মানুষ অপরের দ্বারা প্রতারিত হয় না, সে নিজেই নিজেকে প্রতারণা করে। যে নিজের ও অপরের প্রতি সত্যনিষ্ঠ সে-ই মনীষিগণের মহৎগুণে গুণান্বিত।") ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর,

"তেমনি করে আবার এসে
ডাকাও ঠাকুর প্রেমের বান।
তাতে ভেসে যাবে ডুবে যাবে
জীবের দারুণ অভিমান।"

অভিমান চলে গেলেই সব দুঃখ চলে যায়। মানুষের অভিমান করার কি আছে? এক মুহূর্তে কোথায় সব ভেঙে যায়, সে কথা কি কেউ ভাবে? উচ্চ চিন্তা, উচ্চ আদর্শ থাকলে অভিমান ঢুকতে পারে না। যার ইচ্ছা অন্যায় করুক, তাতে তোমার কি? তুমি সুখী হও, শান্তিতে থাক, আনন্দ কর। মন তোমার, মন তো অন্যের নয়, তবে অন্যের কথায় বা কাজে দুঃখিত হবার কি আছে?

"দুঃখ ভরা ধরার মাঝে
সুখ যদি ভাই চাও,
পরকে তবে প্রীতির ডোরে,
আপন করে নাও।"

* * * *

সংসারে কে যে স্বার্থপর নয় তা তো আমি জানি না। স্বার্থপর সকলেই, কেউ কিছু কম, কেউ বেশী, এই যা তফাৎ! একটা breaking point (চরম অবস্থা) সকলেরই আছে।

যদি সকলেরই স্বার্থ থাকে, তবে কাউকে কিছু বলবার নেই। একটু স্বার্থ থাকলেই দৃষ্টিও অন্য রকম হয়ে যায়; আর একটা ভ্রান্ত দৃষ্টিভংগি নিয়ে দেখলে আরও খারাপ হয়। নিজের স্বার্থ না থাকলে জগতের স্বার্থ থাকে না; আর থাকলেও চোখে পড়ে না। Erasmus (ইরাস্‌মাস) বলেছেন, "Even the finest hair throws a shadow" (সূক্ষ্মতম চুলটিরও ছায়া আছে)। দোষ দেখে লাভ নেই। গুণ দেখাই কষ্ট। দোষ-দৃষ্টি থাকলে নিজেরই জীবন নষ্ট হয়ে যায়। * * গ্যেটের কথাটা স্মরণ হয়, "Defects are perceived by one who has no love, so to see them one must be uncharitable." (যার ভালবাসা নেই সেই দোষ দেখে, কাজেই যে দোষ দেখে তাকে হতে হয় হৃদয়হীন।) স্বামীজীর কথাও তাই, "Love never denounces, it is ambition that does so" (প্রেম কখনও হীন চক্ষে দেখে না, যে হীন চক্ষে দেখে সে হচ্ছে দুরাকাংক্ষা)। শ্রীশ্রীমার কথা, "জগতে কেউ পর নয়; যদি শান্তি চাও, সবাইকে আপনার করে নাও।" কারো দোষ না দেখাই ভাল।

যদি দোষ দেখতে চাও, তবে নিজের দোষ দেখ। দোষ-দৃষ্টি মানুষকে বড় অশান্তি দেয়। তুমি মনে করছ, অপরে স্বার্থপর; সে মনে করে, তুমি স্বার্থপর। প্রত্যেকেরই একটা নিজস্ব দৃষ্টি আছে। প্রত্যেকেই সেই দিক থেকে দেখবে; কাজেই উভয়েই সত্য আবার উভয়েই ভুল। বায়রনের একটা কথা মনে পড়ে, "We love what we loathe" (যা আমরা ঘৃণা করি তাই আমরা ভালবাসি;) আর এমার্সন বলেছেন—"Hatred is love inverted" (ঘৃণা প্রেমেরই উল্টো পিঠ।) নিজের মধ্যে পরিবর্তন আসলে পারিপার্শ্বিক পরিবেশও পরিবর্তিত হয়। "Judge not that ye be not judged" (যদি নিজের বিচার না চাও, তবে অপরকে বিচার করতে যেও না।) হয় নিজে মাথা দিয়ে সবটা পরিবর্তন করে দাও, নতুবা চুপ করে থাক। অনেক ক্ষেত্রেই আমরা চাই যে, আমাদের মতে সকলে চলুক। নিজেরা যে ভুল করি সেটা ভুলে যাই। জগতটা তো দোষশূন্য নয়! সাধক সে যে ঠাকুরের নাম করে। তার পক্ষে অন্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা ভয়ানক অন্যায়। "দাও আর ফিরে নাহি চাও", নতুবা দূরে চলে যাও। যখনই স্বার্থ-সংঘর্ষ হয়, তখনই নিজের মধ্যে কারণ অনুসন্ধান কোরো, তবেই শান্তি পাবে। Soul speaks to soul in silence (হৃদয়ের ভাষা হৃদয় বোঝে নীরবতার মধ্য দিয়ে।) নিজের মধ্যে ভালবাসা এলে অন্যে ভালবাসতে বাধ্য। নিজে নিঃস্বার্থ হলে অন্যে কখনও বেশীদিন স্বার্থপর থাকতে পারে না। যে সাধক সে নিজের মত করে গড়ে নেবে, সে কেন তৈরি জিনিষ চাইবে? সবাই চায় নিজ নিজ সুখ সুবিধা। নিজের মতের কাছে মাথা নত করুক, এই সকলে চায়;

তাই যত গোলমাল ও ঝগড়া। আমি নিজে যেমন জগৎ তো ঠিক তেমনি। যেখানে আমার স্বার্থ সেখানে জগৎও স্বার্থপর। যেখানে আমি হিংসুক, সেখানে অন্যেও হিংসা করে। আমি যদি ঘৃণা করি, অন্যেও আমাকে ঘৃণা করবে। আমরা যা দিই তাই ফিরে পাই। মানুষ একটা বেতার কেন্দ্র—জগতের চারদিক হতে সংবাদ গ্রহণ ক'রে আবার সেগুলিকে জগতে ছড়িয়ে দেয়। যেটা দেব তাই ফিরে পাব। যা ফিরে পাই তাই আমাদের চরিত্রকে প্রকাশ করে। Reaction is character. * * প্রতিক্রিয়া দ্বারাই চরিত্র নিরূপিত হয়। সকলে ভালবাসা নিও। ইতি—

তোমাদের নগেন

৬২

স্নেহের—

তোমার পত্র পেয়ে সুখী হলাম। * * * লিখেছ মনটা প্রত্যেক দিন একই ভাবে চিন্তা করতে পারে না; কোনদিন বেশ ভালভাবে চিন্তা হয়, কোনদিন তা হয় না। ওটা অতি সত্য কথা। সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতে মন তো চঞ্চল হবেই। যারা বলে মন চঞ্চল হয় না, প্রত্যহই একই রকম চিন্তা হয়, তারা কোন চিন্তাই করে না। "Is it easy to detach the mind from all objects ? Only a hero can do that. The external objects are ever trying to enter into your mind and conquer you." (বিষয় থেকে মনকে পৃথক করা কি সোজা কথা? বীরই কেবল তা

করতে পারে। বাইরের বিষয়সমূহ অনবরত চেষ্টা করছে তোমার মনে প্রবেশ করতে এবং তোমাকে জয় করতে।) কাজেই খুব লড়াই করতে হয়—নতুবা মন উঁচুতে উঠতে পারে না, একই স্থানে একই ভাবে থাকে। দেখ, যারা ধ্যান করে তাদেরই লক্ষের মধ্যে ২।৩ জন এগিয়ে যেতে পারে। আর সকলে যেখানে আরম্ভ করে সেখানেই শেষ করে, কোন উন্নতি হয় না। চোখ বুজলেই কি ধ্যান হয়? ধ্যানের ভিত্তি হ'ল ত্যাগ, তপস্যা ও কঠোরতায়। সব চেয়ে বড় কঠোরতা হল দুর্ভাগ্যের মধ্যেও আনন্দে থাকা। নতুন ভাব নিতে গেলে, জীবনকে নতুন ভাবে তৈরি করতে হয়। একটা উচ্চভাব পেতে হলে উচ্চদরের ত্যাগও করতে হয়। আড্ডা ত্যাগই মস্ত ত্যাগ। স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলেছিলেন—"আড্ডা জীবনের পরম শত্রু। আড্ডা মানুষকে ধ্বংস করে। কিছু কাজ না থাকে ঘুমিয়ে কাটাবে, তবু আড্ডায় যাবে না, আড্ডা দেবে না।" স্বামীজীদের মধ্যে এত ভালবাসা, অথচ কেউ কারুর সংগে বড় একটা কোন কথা বলতেন না, সবাই আপন আপন ভাব ও চিন্তায় মগ্ন থাকতেন। "In the mind itself there are many layers one upon another. It is useless merely closing the eyes and ears." (আমাদের এই মনেই একের পর এক বহু স্তর আছে। শুধু চোখ কান বুজে বসে থাকা নিরর্থক)। যদি কেউ আড্ডা দিতে আসে, একখানা বই নিয়ে পড়তে থাকবে। দেখবে, সে ধীরে ধীরে সরে পড়বে। তারপর সে আর আসবে না। * * * স্বামীজী যে দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে গেছেন সে কথা কি আমরা মনে করি? অথচ ঠাকুর-স্বামীজীর বই পড়ি ও মনে করি, তাঁদের খুব ভক্তি করছি। ন্যুট হ্যামসুনের

একটা কথা মনে পড়ছে—"Life without a load upon one's shoulders is a miserable thing—no life for him." (দায়িত্বহীন জীবন অতি দুঃখের—সেটা জীবনই নয়।) মানুষের মন অনেক দিকে আট্‌কা থাকে—গল্প, রূপ, রং ইত্যাদিতে। তাকে টেনে এনে নিজের আদর্শে যুক্ত করা কি সহজ? তরবারি ধরে মনের আসক্তিকে কেটে ফেলাই প্রধান উপায়। ভালবাসা নিও। ইতি—

নগেন

৬৩

মুন্সীগঞ্জ

প্রিয়—

আপনার পত্র পেয়েছি। আপনাকে ভুলতে পারি, সে শক্তি আমার নেই। অবশ্য সকলকে ভুলতে পারলে ভালই হত। যিনি ঠাকুরকে স্মরণ করেন তিনি আমার পরম আত্মীয়, আমি তাঁর দাস। আমি আশীর্বাদ করব কি? আমিই সবার চরণরেণু ও আশীর্বাদের ভিখারী। অধ্যাত্ম পথের পাথেয় হল ভক্ত-পদধূলি। আমার নিজের সাধন নেই, ভজন নেই, ত্যাগ নেই, তপস্যা নেই, বিদ্যা বুদ্ধি নেই—নেই বলতে কিছুই নেই। তবুও কোন অভাব বোধ করি না, কারণ তিনি যে ধরে আছেন। 'যদি ভুলে যাই পথে, শ্যাম যায় মোর সাথে সাথে চরণে চরণ ঠেকাইয়া।' আমি যদি তাঁকে ধরতে যেতাম, তবে নিশ্চয় নিরাশ হতাম, কিন্তু তিনি যে গ্রাস ক'রে বসে আছেন! কাজেই নিজের চেষ্টায় দাঁড়াবার উপায় নেই। কিছু হওয়া বা কিছু পাওয়ার

আশায় নেই, সুতরাং কিছু হারাবার ভয়ও নেই। যা আছে তাই আছে, যেমন আছে তেমনই আছে। আমি চলেছি ভেসে। কোথায় যাচ্ছি তা জানিনা, কেন যাচ্ছি তাও জানিনা। স্রোতে যেমন মড়া ভেসে যায় তেমনি ভেসে যাচ্ছি। আমার ইচ্ছা করে সকলের চরণে মাথা নত করি। আপনি ও ছোট মাখনবাবু আমার ভালবাসা নেবেন। ইতি—

নগেন

৬৪

সারদাধাম ঃ ভুবনেশ্বর

মা,

তোমার পত্র পেয়েছি। ছিঃ মা, উপদেশের কথা তুমি লিখেছ! সন্তান মাকে কি উপদেশ দেবে মা? মা-ই তো জীবন দিয়ে সন্তানকে শেখান। মা অন্তর দিয়ে, ভালবাসা দিয়ে নীরবে সন্তানের অন্তরকে বিকশিত ক'রে দেন। জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা অন্তরকে বিকশিত করা। আর সব বিদ্যা নিজের চেষ্টায় আয়ত্ত করা যায়; চেষ্টা দ্বারা অসাধ্য সাধন করা যায়; কিন্তু অন্তরের নিকট কোন চেষ্টা, অধ্যবসায় বা জোর খাটে না। তাই মা হলেন সকলের চেয়ে বড় শিক্ষক। মা, সন্তানকে বুকে টেনে নিয়ে নিজের ভালবাসা সন্তানের অন্তরে ঢুকিয়ে দেন। মায়ের কোমল স্পর্শে জীবনটা ফুটে ওঠে বিনা চেষ্টায়, যেমন সূর্যের উদয়ে পদ্ম আপনি ফোটে। নিজে ভালবেসে মা অন্যকে ভালবাসা শেখান। হৃদয়ের মূল্যে সব জিনিষ গ্রহণ করতে হয়। হৃদয়ে যে দাগ পড়ে তা চিরস্থায়ী হয়।

জগতে হঠাৎ কিছু হয় না। সব জিনিষেরই কারণ আছে। জন্ম জন্মান্তর ধরে সম্বন্ধ চলে আসে। তাই মা কখনও মেয়ে হয়ে জন্মায়, আবার মেয়েই মা হয়। পিতা পুত্র হয়ে আসে, আবার পুত্রই পিতা হয়। এই ভাবে যাতায়াত চলে। জন্ম-মৃত্যু, সুখ দুঃখ, ভাল মন্দের মধ্য দিয়ে মানুষকে চলতে হয় ভালবাসার আস্বাদন করবার জন্য। যে সামনে আছে তার ভালবাসা কতটুকু তা তো ধারণা হয় না। যখন সে আড়ালে চলে যায়, যখন চিরজীবন খুঁজেও তাকে আর পাওয়া যায় না, চোখের জলে বুক ভেসে গেলেও যখন আর তাকে দেখতে পাওয়া যায় না, তখনই সমস্ত মন প্রাণ সেই প্রিয়তমের চিন্তায় মগ্ন হয়। তখন প্রিয়তমের জীবন আর নিজের জীবনে কোন প্রভেদ থাকে না; নিজের অস্তিত্ব পর্যন্ত ভুল হয়ে যায়; মন প্রাণ কেবল ধায় তারই সন্ধানে। প্রকৃত ভালবাসার আরম্ভই তখন; তার পূর্বে ভালবাসা কি ধারণা হয় না। মৃত্যুর নিকট হতে আমরা প্রেম শিক্ষা করি। মৃত্যু ও প্রেম একই জিনিষ। যখনই মানুষের হৃদয়ে প্রেম জন্মে তখন সে মৃত্যুকে বলতে পারে, "মরণ রে, তুঁহু মম শ্যাম সমান।" তখন সে মৃত্যুকে প্রিয়তমের মত মনে করে, তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তে কষ্ট বোধ করে না। নিজের সুখেচ্ছা, স্বার্থ ইত্যাদি থাকলে ভালবাসার বিকাশ হয় না। দুঃখই ভালবাসার দূত, আর মৃত্যুই পরম প্রেমাস্পদ। যে নিজেকে ভুলতে পারে নি, সে তো ভালবাসতে শেখেনি। যাকে যত ভালবাসা যায়, তার জন্যে ততটা দুঃখ সহ্য করা যায়। তাই কার জন্যে কতটা দুঃখ সইতে পারি, তাতেই প্রমাণ হয়, কাকে কতটা ভালবাসি। সুখে দুঃখে তিনিই সব; মা-ই সব; সবই আনন্দময়ীর আনন্দের খেলা। মা আমার, তুমিই সূতিকা মন্দিরে

আনন্দের প্রদীপ জ্বালো ; আবার তুমিই জ্বাল মা, শ্মশান বহ্নির ভীষণ আলো। যারা জ্যোৎস্না রাতে ফুলের হাসিতে সুখের মধ্যে ভালবাসা খোঁজে তারা ভ্রান্ত। তারা জানে না প্রেম কি বস্তু। প্রেমিক দুঃখকে আলিঙ্গন করবে, তবু প্রেম ছাড়বে না ; মৃত্যুকে আলিঙ্গন করবে, তবু প্রেমকে ত্যাগ করবে না। ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, স্বার্থ, মান, যশ এসব থাকতে প্রেম কি তা ধারণা হয় না। প্রেম কি সেই জানে, যে সাহসে দুঃখ দৈন্য চায়, এবং মৃত্যুকে বাঁধে বাহুপাশে। যখন ধৃতরাষ্ট্র শকুনির পরামর্শে পাণ্ডবদের ধ্বংস করবার ষড়যন্ত্র করেছিলেন তখন গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, "তুমি ধর্মপথ অবলম্বন কর।" উত্তরে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "ধর্ম কি দেবে ?" গান্ধারী উত্তর করলেন, "দুঃখ নব নব।"

বিশ্বাসঘাতক, নীচ, 'মুখে মধু অন্তরে গরল, সত্যহীন, স্বার্থ-পরায়ণ' হলে তবে এই জগতে স্থান হবে, নতুবা নয়। মা, আমরা দুঃখের পথ স্বেচ্ছায় বরণ ক'রে নিয়েছি। পূর্বেই লিখেছি ভালবাসার অর্থ দুঃখের সংগে বন্ধুত্ব করা, মৃত্যুকে আলিংগন করা। যদি এ পথ সুখের হত তবে তো সকলেই এ পথে আসত। দুঃখের মধ্য দিয়েই এ পথ চলেছে ; তাই এ পথের পথিককে দুঃখ পেতেই হবে। সংসারে দুঃখ সবাই পায়, সবাইকেই দুঃখ ভোগ করতে হয়, তবে কেউ দুঃখ ভোগ করে নিজের জন্যে, আর কেউ বা দুঃখকে বরণ করে নেয় পরের জন্যে। কেউ দুঃখ পায় স্বার্থের জন্য, আবার কেউ দুঃখ পায় স্বার্থ-ত্যাগের জন্যে। প্রেমই জীবনকে ধরে রেখেছে, যেমন ধরে রেখেছে মূল গাছকে। মূল যেমন আড়াল থেকে রস সংগ্রহ ক'রে বৃক্ষকে বাঁচিয়ে রাখে, আর তাকে ঝড় বাতাস সহ্য করবার ক্ষমতা দেয়,

তেমনি প্রেম অলক্ষ্যে মানুষকে অসীম শক্তি দেয় ও তাকে বাঁচিয়ে রাখে। প্রেমই ভগবান আর তিনিই প্রেমাস্পদ। যার মধ্যে প্রেমের প্রকাশ যত অধিক সে তত বড়, আর সে-ই প্রেমাস্পদের দিকে তত এগিয়ে গিয়েছে।

সবাই ফুল দিয়ে পূজা করে ; আমি মাকে পূজা করি কাগজ-কলম দিয়ে। আমার সময় নষ্ট হয় না ; বরং যতক্ষণ আমি 'মা'র সংগে থাকি ততক্ষণ মন আনন্দে পূর্ণ থাকে—মার চিন্তায় মন মগ্ন হয়ে থাকে ; জগতের কোন কথাই মনে থাকে না। আমি তখন মায়ের সান্নিধ্য অনুভব করি—আমার কাছে দূর নিকট লোপ হয়ে যায়।

আমার মাকে কি আমি ছাড়তে পারি ? মা শত দুঃখ দিলেও তাঁকে ছাড়তে পারি না। মার চরণের নূপুর হ'য়ে থাকতেই বাসনা। মা আমার, আমি মার ; এর মধ্যে আর কেউ নেই। তোমরা এক একটা মুখোস পরে আমার সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছ ; তবুও আমি মাঝে মাঝে টের পাই যে, আমার মা-ই এই ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তুমি আমার প্রণাম নিও। তোমার নিকট আমার প্রার্থনা, মুখের মুখোসটা ফেলে নিজের স্বরূপটা দেখাও। ইতি—

পুঃ—মা, বাইরের সাহায্য নিশ্চয়ই দরকার। আমার দ্বারা যদি কোন সাহায্য হয়, তা আমি করতে সদা প্রস্তুত। আমি তোমার সন্তান, এটা মনে প্রাণে জেনে আমার ওপর দাবি রেখো। আমার কাছে যেন তোমাদের কোন ভয় বা দ্বিধা না থাকে। আমি তোমাদের, আর তোমরা আমার ; এটা ভুলো না। মৃত্যু পর্যন্ত আমি তোমাদের দাস ; এটা জেনে রখো। ইতি—

সন্তান

৬৫

মা,

তোমার পত্র পেয়েছি। মা এখানে ছিলনা সেজন্য পত্র দিতে দেরি হল। মা ৭।৮ দিন কলকাতা গিয়ে খুব আনন্দ করে এল। তোমাদের ওখানেও গিয়েছিল। তোমার শরীর কেমন আছে? মনেই স্বাস্থ্য। মনটা ভাল থাকলে শরীরটা অনেক পরিমাণে ভাল থাকে; অন্ততঃ অভাব বোধ আসে না, বা কোনও অবসাদও স্থান পায় না। যখন মনটা দুর্ব্বল হয় তখন নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। আশাশূন্য হওয়াই নরকবাস। জীবনে শত দুঃখ আসুক, শত যন্ত্রণা আসুক, তবু সেগুলিকে ঠেলে ফেলে দিয়ে নিজের কাজ করতে হয়। আনন্দই আপন, আর সব পর। আনন্দের জন্যই আত্মীয় স্বজন, টাকা পয়সা ইত্যাদি। যদি আনন্দই না খুঁজলে তবে আর জীবন ধারণে লাভ কি? আনন্দ ভিতরে আছে সত্য, কিন্তু সেটাকে ব্যক্ত করাই সাধনা। শরীর থাকলে সুখ দুঃখ আছেই। জগতে এমন কেউ জন্মে নি যে দুঃখ পায় নি। দুঃখ আসবেই; তার মধ্যেই যতটুকু সম্ভব আনন্দ লাভ করবার চেষ্টা থাকা উচিত। তবেই একদিন নৈরাশ্যের মেঘ কেটে যাবে, আবার সূর্য্য উদয় হবে, আবার আনন্দ শান্তি ফিরে আসবে। মনের দৃঢ়তা নিয়ে চলতে হয়। সুখ দুঃখ যাই আসুক না কেন, নিজের কাজ করে যাবই, এইরূপ দৃঢ়তা থাকলে হৃদয় বেশীদিন আঁধারে আচ্ছন্ন থাকতে পারে না। দুঃখ দুঃখ করলে দুঃখই আসবে, আনন্দ আনন্দ বললে আনন্দ পাবে। যেটা মনে মনে চাইবে, জীবনটা সেইরূপই হয়ে যাবে। আনন্দ চাইতে চাইতে দুঃখ পালাবে, আর আনন্দও পাবে। দুর্বল ভাবলেই দুর্বল হবে, আর সবল

ভাবলে সবলতা আসবে। অবসাদ আনার চেয়ে মহাপাপ আর নেই জানবে। চিরজীবন তবে কেবল দুঃখই ভোগ করতে হবে। সমুদ্রের ঢেউ থামলে স্নান করতে চাইলে আর স্নান করাই হয় না। ঢেউ থাকতেই স্নান করতে হয়, কেবল কৌশলটা জেনে নিয়ে। এই কৌশলটাই যোগ। জগতে সবই পরিবর্তিত হয়। সুখ দুঃখ চক্রাকারে ঘোরে, কিন্তু আনন্দ স্থির; তবে সেটা পেতে হলে সুখদুঃখের মধ্য দিয়েই যেতে হয়। একটু একটু লিখো, একটু একটু পড়াশোনা কোরো। আর ধ্যান একটু একটু অভ্যাস রেখো। ধ'রে থাকলে সুদিন আসবেই। ঠাকুর বলেছেন, যে সয় সেই রয়, যে না সয় সে নাশ হয়। সকলেই ভাল আছে। ভালবাসা নিও। ইতি—

নগেন

৬৬

সারদাধাম

স্নেহের—

আমি আমার ইষ্টদেবীর চিন্তায়, আরাধ্যের ধ্যানে ভেসে চলেছি। মনটা আর কিছুতে আবদ্ধ থাকতে চাচ্ছে না। আমার আরাধ্য দেবতাকে আমি বাইরে দেখতে পাই যখন যে দিকে তাকাই; আবার যখন চোখ বুজি তখনও তাঁকে দেখি হৃদয়মাঝে। যিনি বাইরে তিনিই ভিতরে। এখন নিজেকে বলি, "ডুব দে মন কালী বলে হৃদিরত্নাকরের অগাধ জলে।" এখন আর কিছু ভাল লাগে না। দুনিয়া একটা প্রকাণ্ড স্বপ্ন বলে মনে হয়। কারো সুখ বা দুঃখের সংগে আর আমার কোন যোগ নেই। কেউ জন্মাক বা মরুক, কেউ

সুখে থাক বা দুঃখে থাক তা আমায় আর স্পর্শ করবে না। এখন ঠাকুর রামকৃষ্ণ ছাড়া আমার আর কেউ নেই, কিছু নেই। আমি তো প্রস্তুত হয়ে বসে আছি। যাবার সময় যেন পেছনে চেয়ে কাঁদতে না হয়, যেন কোন অকৃত কর্ম বা অকথিত বাণী না থাকে। সব মিটিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছি। জানি না, সময় হয়েছে কি না। তবে বড় ব্যাকুলতা এসেছে ডুবে যাবার জন্য। এই শরীরের কাজ শেষ হয়েছে। এখন প্রারব্ধের অধিকার। কেমন করে দেহ ছেড়ে জীব চলে যায় তার স্পষ্ট আভাস পেয়েছি। আমার এখন এক কথা, "বিদায় বন্ধু, বিদায়!" দেনা পাওনা শেষ হয়েছে। এখন কেবল এক প্রার্থনা, "অব শিব পার কর মেরে নেইয়া।" ইতি—

নগেন

৬৬ (ক)

সারদাধাম

স্নেহের ভাইটি,

আমি তো তোমার জন্য নিজে কিছুই করতে পারি নি, তাই মনে কষ্ট ছিল। এবার যে একটা সুবিধা হয়েছে ঠাকুরের কৃপায়, এজন্য খুবই আনন্দিত হয়েছি। তোমার ও যতীনের খুবই সৌভাগ্য। তোমরা মহাপুরুষের আশীর্বাদ পেয়েছ। জীবনের সমস্ত শক্তি গুটিয়ে আন তাঁর চরণে উৎসর্গ করবার জন্য। বৃথা কাজে নষ্ট করবার মত সময় ও শক্তি আমাদের কারো নেই।

ত্যাগ অর্থই প্রেম। প্রেম না হলে ত্যাগ হয় না। সেটা মুখস্থ ত্যাগ। অন্তর দিয়ে ব্যাকুল হয়ে তাঁর চরণে হৃদয়ের ভাব নিবেদন কর। তবেই তিনি সমস্ত বাধাবিপত্তি দূর ক'রে সমস্ত সুবিধা ক'রে দেবেন। যদি তাঁর চরণে ভক্তিই না হল, যদি মনটা একটা চিন্তায় ডুবে না গেল, তবে আর ত্যাগের মূল্য কোথায়? ত্যাগ হচ্ছে একটা উপায় মাত্র, কখনোই উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য নয়। নিয়মিত পড়াশোনা কোরো অন্তরের খোরাকের জন্য। ফরাসী ভাষা পড়ছ। মনোযোগ দিয়ে পোড়ো। আমরা তোমার কাছে ফরাসী mystic-দের (মরমীদের) জীবনবৃত্তান্ত ও সাধনার কথা জানতে চাই। তা'ছাড়া Pascal (প্যাস্কাল) প্রভৃতি লেখকদের কথাও শুনতে চাই তোমার মুখে। কেমন আছ। ভালবাসা নিও। ইতি—

তোমার দাদা

৬৭

পরম কল্যাণীয়াসু—

স্নেহের সরস্বতী, মা তোমার পত্র পেলাম। লক্ষ্মীর পত্রও পেয়েছি। সে ঢাকায় আসবে লিখেছিল। এসেছে কিনা জানি না, তাকে এই সংগে পত্র দিলাম। মা, তোমরা আমার কত প্রিয় তা জান? তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করতেই তোমার সংগে দেখা। জীবনের প্রকৃত অভাব যা তা কখনও অপূর্ণ থাকে না। ভিতরে অভাব বোধ হলে তা পূর্ণ হবেই। সকাল সন্ধ্যা তুমি স্মরণ মনন কর তা শুনেছি।

ঠাকুরের চরণে তোমার অচলা ভক্তি হোক, এই আমার প্রার্থনা। মা, তোমাকে আমি কি আর আশীর্বাদ করব! তোমার কথা রোজই মনে হয়। এখনও পশ্চিম দিকে তাকালেই তোমার মূর্তি সামনে ভেসে ওঠে। তোমার সরলতা ও পবিত্রতাই তোমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাবে। ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা কর, "হে ঠাকুর, আমাকে ভক্তি দাও, আমাকে শক্তি দাও, সমস্ত জীবনে তুমিই একমাত্র লক্ষ্য হও। শয়নে স্বপনে সর্ব অবস্থায় যেন মনে করি, তুমি আমার কাছে কাছে আছ। তুমি আমার সংগে আছ সে কথা যেন না ভুলি।"

কথামৃত, লীলাপ্রসংগ খুব পড়বে আর যখনই ধ্যান করতে বসবে তখনই মনে করবে যে, তুমি দক্ষিণেশ্বরে আছ, সামনে পতিতপাবনী গংগা, আর দুই পাশে ঠাকুর ও মা। তুমি তাঁদের মাঝখানে বসে ধ্যান করছ। তোমার হৃদয়েও ঠাকুর, মা। সত্যি কথা বলতে কি তুমি, দিদি ও লক্ষ্মী যেন আমার সংগে সংগে আছ। মা, তোমাকে আর কি বলব, তুমি আমার মা। যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন তোমাদের কথা মনে থাকবে। সংসার যে কি তাতো টের পাচ্ছ। সংসারের বাইরে গেলেই শান্তি। তাঁকে জীবনের ধ্রুবতারা কর, তবেই আর কখনও দিশেহারা হবে না। সংসারে যেন কোন আশা রেখো না। আশাই দুঃখের কারণ। আশা থাকলেই নৈরাশ্য আছে। সংসারে যা কর্তব্য তা করে যাও। কোন কিছু আশা কোরো না। শরীর সংসারের, অন্তর তোমার নিজের; সেখানে ঠাকুরকে বসাও। যখনই কোন দুঃখ পাবে তখনই একটু স্থির হয়ে বসে অন্তরে যে ঠাকুর আছেন তাঁকে চিন্তা করে তাঁর কাছে মনের দুঃখ জানাও। সংসারের যা প্রাপ্য তা সংসারকে দাও; কিন্তু অন্তরটা

যেন অন্তর্যামীকে দিতে ভুলো না। যার জিনিষ তাকে না দিলে কষ্ট পেতে হয়।

আমার শরীর অসুখ করার কারণ, খুব কঠোরভাবে একবেলা ও একঢালা খাওয়া। আর তো জানই, পেটে ব্যথা হয়ে জ্বর হয়। দিদির হাতে ব্যথা, লিখতে পারেন না। ছোট একটি ঠাকুর (পাচক) আছে বয়স ১৪।১৫ বছর। ছেলেটি বেশ নিষ্ঠাবান্। এখন সবাই ধ্যানে নিমগ্ন, পাঠ একবার হয়, শরীর এখন খুব ভাল চলছে। রাত ৩টায় উঠে ঠাকুর ঘরে যাই, মা-ও তাই। ভোর পর্যন্ত ধ্যান, তারপর পড়াশুনা আরম্ভ হয়। বাড়ী এখন জীবন্ত। এখন সবাই নীরব। আর কিছু লিখবার নেই। ভুবন দক্ষিণে, জিতেন পুরীতে। আমি, দাদা, দিদি আর মা এখানে। মা, আমি তো তোমাদের আছিই। দিদি ও মুখার্জি মশায়কে আমার প্রণাম দিও। তুমি আমার প্রণাম, ভালবাসা ও আশীর্বাদ নিও। এখন বিদায়। ইতি—

অকৃতী সন্তান
নগেন

৬৮

স্নেহের—

তোমার পত্র পেয়ে সুখী হলাম। তোমাদের কথা খুবই মনে হচ্ছিল, কিন্তু পত্র দেওয়া হয় নি। এখন পত্র লিখতে বিশেষ ইচ্ছা করে না। একমাসে অনেকবার যাওয়া আসা করতে হল। তোমাদের বাসা এতদূর যে সেখান থেকে এসে আর ট্রেণ ধরবার সময় থাকে না। আমি যে-ট্রেণে কলকাতা যাই তার পরের

ট্রেণেই কলকাতা ছাড়ি। কাজেই হাতে এমন সময় থাকে না যে গিয়ে দেখা করে আসি। তাছাড়া পিছন টান রেখে কোন দিনই কাজ করার অভ্যাস নেই। তোমরা স্মরণ করেছ, এটাই আনন্দের বিষয়। নিজেরা একটু পড়াশুনা কর। নিজের মত কিছু লিখতে চেষ্টা কর সময় ক'রে। তবেই মনে আনন্দ শান্তি পাবে। মানুষের জীবনের দুইটি দিক আছে। একটি নিজের সম্পূর্ণ নিজস্ব ; সেখানে কারো অধিকার নেই। আর একটার সংগে আছে জগতের যোগ। সেই যোগসূত্রেই সংসারের সমস্ত বাঁধা। মা বাবা, ভাই বোন, স্বামী পুত্র, আত্মীয় বন্ধু ইত্যাদি। অবশ্য এর মধ্যে সম্বন্ধের ও বন্ধনের তারতম্য আছে। জীবনের এই দিকটার হিসাব করে চলতে হয়। যত কিছু সুখদুঃখ ভালমন্দের সম্বন্ধ এই দিকটায়। কিন্তু যেটা নিজের নিজস্ব সেটার জন্য জগতের কাউকে কৈফিয়ৎ দিতে হয় না বা বাইরের কোন নিয়ম পালন করতে হয় না। অন্তর্যামী অন্তরের নিভৃত কোণে বসে এই রাজ্য পরিচালনা করেন। মানুষ নিজেই তা টের পায় না, অন্যের কথা আর কি ? যে এই রাজ্যের যতটা সংবাদ রাখে, এই রাজ্যে যে যতটা থাকতে পারে, সে সেই পরিমাণে ধীরস্থির, শান্ত ও আনন্দময় হয়। প্রত্যেকের জীবন যে দুর্বিষহ হয়ে উঠে না, শত কষ্টের মধ্যেও যে সে বেঁচে থাকে, তার কারণ, জীবনের এই অংশের সংগে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে জীবনের অপর দিকের একটু যোগ আছে। গাছ যেমন তার অতি সূক্ষ্ম মূল দিয়ে অতি নিভৃতে আহার সংগ্রহ ক'রে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে (অবশ্য কেউ তা টের পায় না) মানুষ তেমনি অজ্ঞাতসারে জীবনের নিভৃত কোণ থেকে, অজানার ভাণ্ডার থেকে বাঁচবার খোরাক

সংগ্রহ করে। শরীরের ও মনের খোরাক পায় মানুষ সংসারের দিক থেকে; কিন্তু শত দুঃখ কষ্টেও সে বেঁচে থাকে জীবনের নিভৃত অজানা অংশ থেকে রস গ্রহণ ক'রে। জীবনের নিজস্ব অংশকে উপবাসী রেখে অপর অংশটিকে বেশী খোরাক দিতে গিয়েই প্রত্যেকের দুঃখ কষ্ট অশান্তি।

সময় চুরি ক'রে নিজের নিজস্ব যিনি তাঁর কাছে গিয়ে কিছুক্ষণ বসলে সব অশান্তি দূর হয়ে যাবে। যখন তাঁর কাছে যাবে তখন আর সেখানে বাইরের কর্মকে ঢুকতে দেবে না—কোন ভাবনা চিন্তাকেও না। এই নিভৃত নিলয়ই মানুষের নিজের ঘর; আর সব পরের ঘর। যে পরবাসী তার সুখ নেই। নিজের ঘরটি বেঁধে তোল; সে শক্তি আছে। সে ঘরের মালিক তো সংগে সংগেই আছেন। তাঁর একটু পরিচয় যখন পাবে তখন নিজেই বলবে—

"এই চির অপরাধী পাতকীর বোঝা
হাসি মুখে তুমি বয়েছ।"

তাঁকে খোঁজ কর। ভালবাসা নিও। ইতি—

নগেন

৬৯

প্রিয়—

তুমি ও যতীন শেষ যাত্রার সময় নেদুকে ঘাড়ে নিয়েছিলে। একাদশীতে নেদু তোমার ওখানে এসেছিল। আর লক্ষ্মীপুর্ণিমার পরের পর দিন মহাযাত্রা করে। এই দুই দিন তার জন্য ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা কোরো—"প্রেতলোক ছেড়ে পিতৃলোকে যাও; সেখানে

পিতৃলোকের সংগে পরিচিত হও; তাঁরা তোমাকে গ্রহণ করুন; তাঁদের সাহায্যে দেবলোকে গমন কর; দেবলোক থেকে দিব্য শরীর নিয়ে দেবতাদের সংগে আনন্দ কর। সেখানে গিয়ে জন্ম জন্মান্তরে যে সকল দেবতাকে পূজা করেছ, চিন্তা করেছ, তাঁদের সংগে মিলিত হয়ে দিব্য শরীরে যে ভোগ সম্ভব তা সমাপ্ত কর। আমরা তোমার শেষ যাত্রার বন্ধু। পার্থিব কোন কামনা বাসনায় তোমাকে আকর্ষণ করব না। তুমি মুক্ত হও। তোমার প্রেত শরীরের অবসান হোক। তুমি ঊর্ধ্ব পিতৃলোকে পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ প্রভৃতির সাথে মিলিত হও। তাঁরা তোমাকে ঊর্ধ্ব লোকে যাবার সাহায্য করুন। তারপর দিব্য ভাব নিয়ে আবার নরলোকে এসে তোমার অতৃপ্ত বাসনা কামনা পূর্ণ ক'রে ব্রহ্মপদে মিলিত হও। চির আনন্দ, চির শান্তি লাভ কর। তোমার পূর্বজন্মার্জিত সুকৃতি দুষ্কৃতির ভোগ সমাপন ক'রে তুমি ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হও। তোমার সাধনায় তীব্রতা আসুক; তোমার জন্য আমরা প্রার্থনা করছি। তুমি দিব্যধাম থেকে আমাদের মধ্যে দেববৃত্তি জাগাও। আমরা পরস্পরের সাহায্যে লক্ষ্যস্থানে পৌঁছিতে পারব। তুমি তৃপ্ত হও, তুমি শান্ত হও, তোমার ভববন্ধন ঘুচে যাক; পৃথিবীর স্নেহ মমতা আর যেন তোমাকে টানতে না পারে। নূতন শরীরে নূতন জীবন আরম্ভ কর। জীবনের উদ্দেশ্য সফল হোক। আমাদের কাছে তোমার কোন ঋণ নেই। আমাদের সকলের আন্তরিক শুভ ইচ্ছাতে তুমি ঊর্ধ্ব দেশে যাও। আমাদের কাছে যদি কোন ঋণ থাকে সে ঋণ থেকে তুমি মুক্ত। তুমি আনন্দে আনন্দধামে চলে যাও।"

মৃত আত্মার প্রতি এই তোমাদের শেষ কাজ। তার জন্য

তোমাদের আর কিছু করতে হবে না। আমি যখন চলে যাব, আমার জন্যও এমনি প্রার্থনা কোরো। অবশ্য যদি যাবার সময় তোমাদের আমার কথা স্মরণ থাকে। আমি চেষ্টা করব যাতে তোমরা সকলেই আমাকে ভুলে যে যার কাজে ব্যস্ত থাক। আমি সেই অবকাশে আমার পথ দেখব। প্রণাম নিও সকলকে প্রণাম দিও। ইতি—

তোমাদের নগেন

৭০

স্নেহের—

তোর পত্র পেলাম। তুই যে এখন সবার চেয়ে বড়, তাই তোকে প্রণাম করতে প্রাণ চায়—মাথা আপনি নত হয়ে আসে। তোর শরীরের চেয়ে বড় একজন তোর অন্তরে আছেন। তাঁকে সম্মান ও শ্রদ্ধা না করলে তিনি অভিশাপ দেবেন, তাই প্রণাম করছি। খুব কাঁদ, তাতে অন্তরের সব মলিনতা দূর হবে। যারা সমদুঃখী নয়, তাদের মধ্যে কখনো মিল হতে পারে না। তোর ব্যথা বোঝবার শক্তি কারও নেই। একদিন তো সবাইকে হারাতে হবেই, সুতরাং তার জন্য পূর্ব হতে প্রস্তুত থাকাই উচিত নয় কি? সংসারে সবাই নিজের সুখ খোঁজে, অন্যের ব্যথা বুঝতে চায় না। একটা সংসার দেখেছি,—আমার বন্ধুর বাড়ি। তার ছোট বোন বিধবা হয়ে বাড়ি এল, আর বাড়ির সবাই মাছ মাংস ত্যাগ করল। এক ঘরেই রান্না হত। মেয়েরা সব গহনা খুলে ফেলে শুধু শাঁখা পরে থাকত। বড় পেড়ে কাপড় ছেড়ে দিয়ে সবাই খুব সরু পাড়ের কাপড় পরত।

সব পুরুষ একঘরে ও মেয়েরা সব এক সংগে অন্য ঘরে শুত। যদি ছ'মাস বোন বাপের বাড়ি থাকত, ছ'মাসই সবাই ঐভাবে থাকত। সে এক অদ্ভুত বাড়ি। যাক সে কথা। সমস্ত ব্যথা তাঁকে জানাস, তাঁর কাছেই নীরবে কাঁদিস; আর কেউ সান্ত্বনা দিবার নেই। তাঁর ইচ্ছাতেই মানুষ মানুষের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হয়। আর তাঁর ইচ্ছা না হলে বাবা মা, ভাই বোন, জগতের সবাই বিরোধী হয়। তাঁর উপর বিশ্বাস ছিল বলেই সকলের আশীর্বাদ ও ভালবাসা পেলি। যখনই সময় পাবি তখনই তাঁর কাছে নীরবে মনের ব্যথা জানাবি। মনে করবি, তিনি তোর সামনে আছেন, আর তাঁর কাছে তুই তোর মনের ব্যথা জানাচ্ছিস। অধিক কিছু লিখবার নেই। ভালবাসা নিস। ইতি—

নগেন

৭১

শান্তিধাম : দেওঘর

শ্রীচরণেষু—

মামা, আপনি এখনও অসুস্থ জেনে দুঃখিত হলাম। আমাদের জন্যে আপনি কত কষ্ট করলেন। আপনি নিজের মত চেষ্টা করলেন। এটা আপনার মহাপ্রাণতার পরিচয়। কিন্তু আপনার শান্ত ও সরল মনে অযথা চঞ্চলতা আসায় শরীরটা দীর্ঘদিন অসুস্থ আছে। বাবার নিকট শুনেছি, ব্রাহ্মণ হবে অঋণী। আপনি বোধ হয় নিজে ইচ্ছা করে এই কষ্ট বরণ করে ঋণমুক্ত হলেন। যে স্থানে বা যার কাছে একদিনও শান্তি পাওয়া যায় তার নিকট একটা ঋণ থেকেই যায়। আপনি সেজন্য কর্তব্যবোধে এই সব নিয়ে নাড়াচাড়া করলেন।

মামা, সময় না হলে কিছুই হয় না। যে শান্তি চায় তার অশান্তি শীঘ্র দূর হয়; আর যে ইচ্ছা ক'রে অশান্তি সৃষ্টি করে, তাকে শান্তি দেবেন কি ক'রে? বিষয় বিষ শুনেছিলাম, জানতাম না। বিষয়ের জন্য এত কাণ্ড! আমাদের কল্যাণই হল। * * আমাদের মন অন্তর্মুখ হবার সুবিধা হল। এইভাবে আঘাতের পর আঘাত দিয়ে আমাদের মনের মলিনতা নষ্ট করবার জন্য মা এই ব্যবস্থা করেছেন। মন স্বতঃই সুখ চায়, নিশ্চিন্ত হতে চায়; কিন্তু মা যে তাঁর সন্তানকে নিশ্চিন্ত হয়ে ভুলে থাকতে দেন না। তাই তিনি সুখের সংগে দুঃখেরও ব্যবস্থা করে রেখেছেন। আমরাও তো জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে কত লোকের দোষ দিয়েছি, কত লোকের নিন্দা করেছি। সেগুলির ফল তো ভোগ করতেই হবে। শাস্ত্রের একটি কথা মনে হচ্ছে—

"অসম্মানাত্তপোবৃদ্ধিঃ সম্মানাত্তু তপঃক্ষয়ঃ।
অর্চিতঃ পূজিতো বিপ্রো দুগ্ধা গৌরিব সীদতি॥"

কেউ অসম্মান করলে তপস্যা জনিত ফল অধিকতর হয়। কেউ সম্মান করলে তপস্যা জনিত ফলের ক্ষয় হয়। অর্চিত ও পূজিত ব্রাহ্মণ অবসন্ন হয় যেমন গাভীর দুগ্ধ দোহন করলে সে অবসন্ন হয়ে পড়ে।

তাঁর দিকে চলতে হলে যে পাথেয় প্রয়োজন তার মধ্যে অমানিত্ব একটি। যে গুণ আছে আর যে গুণ নেই, সেজন্য যে আত্মশ্লাঘা করে তাকে মানী বলে। এইরূপ স্বভাব না থাকার নাম অমানিত্ব। অমানিত্বপ্রাপ্তির জন্যই ভগবান নিন্দা অপবাদ প্রভৃতি দিয়ে থাকেন। আমার মত লোকের তো সহজেই অভিমানটা প্রবল হবে, তাই দয়াল সকল রকমে অভিমান নষ্ট করতে এই ব্যবস্থা করেছেন। এটা তাঁরই বিধান। তিনি উত্তম বৈদ্য, রোগীর কিসে কল্যাণ হবে তিনিই

জানেন। মানুষ নিমিত্ত মাত্র। সেই পথে যাবার দ্বিতীয় সম্বল 'অদম্ভিত্ব'। যে ব্যক্তি পূজা বা খ্যাতির উদ্দেশ্যে নিজে ধর্ম প্রকটন করে তাকে দম্ভী বলে। আমার মধ্যে এই দম্ভ অত্যন্ত স্বাভাবিক ; তাই আমি লোকসংগের অনুপযুক্ত। এই কারণে আমি বাইরে মিশি না। আপনি স্নেহবশতঃ আমাকে প্রশংসা করেন। কিন্তু আমি জানি যে, আমি আপনার প্রশংসার যোগ্য নই। তাই যখন 'ব্রহ্মচারী বাবা' প্রভৃতি লেখেন তখন আমার লজ্জা হয়। ব্রহ্মচারী কে ? না যে জগতের সমস্ত নারীর মধ্যে জগন্মাতাকে দেখতে পায়। নারীকে প্রণাম করি মা ব'লে, কিন্তু মায়ের স্বরূপ তো দেখলাম না। অথচ দিন তো চলে গেল। তাই মাঝে মাঝে মনে হয়—

"খাওয়ালি পরালি মাগো করিলি কত যতন।
আছ মাত্র জানি শিবে, হেরি নাই সে রূপ কেমন ॥"

আমি অতি দুর্বল, ধরমহীন, করমহীন, সাধনহীন, ভজন হীন। জানি, মা দীনহীন জনকে দয়া করেন। আমি হীন, কিন্তু আমি তো দীন নই—আমি তো দীন হতে পারি নি। অভিমানে মনটা পূর্ণ ; তাই মা'র কৃপা পাচ্ছি না। চোখে ঠুলি পরিয়ে দিয়ে মা আমাকে অন্ধ করেছেন, তাই মা'র কৃপা পেয়েও মাকে চিনতে পারছি না।

"সন্তানের চোখে ঠুলি তুমিই তো দিয়েছ কালি।
আমি ভেবে ভেবে হলাম কালি আর কি আসিবি মা ॥

তৃতীয় সম্বল 'ক্ষান্তি'। ক্ষান্তি মানে চিত্তের নির্বিকারতা—অপরে অপকার করলেও যেন অপকার করার প্রবৃত্তি না আসে। এটাই মা পরীক্ষা করছেন। আপনি আশীর্বাদ করুন পথের সম্বল যেন না হারাই। চতুর্থ সম্বল 'আর্জব'। আর্জব মানে কুটিলতাশূন্যতা, অর্থাৎ মন

মুখ এক করা। নিজেকে বেশ করে পরীক্ষা করে দেখেছি, সরলতা আসে নি। বরং যেটুকু সরল ছিলাম তাও সংসারের ঘাত প্রতিঘাতে নষ্ট হয়ে গেছে। সরলতা লাভ হলে, মা'র ছোট্ট ছেলে হলে, তবেই মা কোলে করেন। শিশু না হলে তো মা কোলে করেন না। পঞ্চম সম্বল "আচার্যোপাসনা", অর্থাৎ যিনি মোক্ষের উপদেশ করেন তাঁর সেবা। আপনাদের আশীর্বাদে আমি তিন জন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সংগ পেয়েছি। একজন সন্ন্যাস নিয়ে অন্যত্র চলে গেছেন। তিনি চিরকুমার ছিলেন। অতবড় পণ্ডিত ও বিনয়ী লোক দেখা যায় না। চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই তাঁকে জানেন। তিনি প্রথমনাথ মুখোপাধ্যায় এম, এ। আর একজন প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী। তিনি হিমালয়বাসী। তাঁর নিকট আমি শাংকর বেদান্ত গ্রন্থাদি নিত্য নিয়মিত ২।৩ ঘণ্টা ক'রে অধ্যয়ন করছি। তাঁর এখানে আসবার কথা ছিল না। তিনি লিখেছিলেন, যাওয়া হবে না, অথচ তারপরই হঠাৎ এসে উপস্থিত। তাঁর কাছে বেশ আনন্দে শাস্ত্র অধ্যয়ন করছি। ভুবনেশ্বর থাকতে মনে করেছিলাম যে, তীর্থ যাত্রা করে আর বিষয়ের সম্পর্কে থাকব না। দেবোত্তর হল, এইবার আমার ছুটি। আমি এবার শাস্ত্র আলোচনায় জীবন কাটাব। তা মা আমাকে সেই সুবিধা দিলেন এখানে টেনে এনে। মা'র অশেষ করুণা! বাবা বৈদ্যনাথ মনের বাসনা পূর্ণ করেন। তাই তিনি এখানে এনে এখানে রেখে আমার ইচ্ছা পূর্ণ করলেন। আর একজন মহাজ্ঞানী মহাসাধক ও অত্যন্ত সরল অমায়িক লোকের সংগ পেয়েছি। তাঁর মত লোকও দেখা যায় না। ১৬০০৲ টাকা মাহিনা পেতেন। এখন পেন্সন নিয়ে ধ্যান ধারণা ও পাঠ আলোচনায় ব্যাপৃত আছেন। তিনি ৪২ বৎসর এইভাবে জীবন যাপন করছেন।

এখানে আছেন ১৪ বৎসর। এই তিন জনের সংগে দেখা করবার ইচ্ছা বহু পূর্ব হতেই ছিল। আর বাবা বৈদ্যনাথকে দর্শন করবার ইচ্ছাও হয়েছিল ১২ বৎসর পূর্বে। মা সকল ইচ্ছা এখানে এনে পূর্ণ করলেন। মহামায়ার দয়ার কথা ভেবে আশ্চর্য হই। দুঃখ এই, ভারতের বিশেষতঃ বাংলার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের সংগ করেও আমার মান অভিমান গেল না, দীনতাও এল না। তাই মনে হয়, অংগারকে শত ধৌত করলেও তার মলিনতা যায় না। কাজেই আমার মলিনতা গেল না, শুদ্ধ হলাম না, মা'র দেখা পেলাম না। মা নিজেই সাধক, জীব উপলক্ষ্য মাত্র। মা-ই জীবের শবদেহকে নিয়ে সাধনা করেন, নতুবা জীবের কি সাধ্য যে মুক্তির চেষ্টা করে? মা তাই দয়া করে নিযুক্ত করেছেন আমাকে নিজেকে শুদ্ধ করে দম্ভশূন্য হতে, অমানী হতে। ধন্য মহামায়া, তাঁর লীলাও ধন্য। তিনি আমাদের যথেষ্ট উপকার করছেন দুঃখ দিয়ে, আঘাত দিয়ে। ষষ্ঠ 'স্থৈর্য' ও সপ্তম 'দর্পরাহিত্য'। যে অস্থির, যে দর্পী সে কখনো মা'র কৃপা লাভ করতে পারে না। আশীর্বাদ করবেন এই সকল সম্বল যেন প্রাপ্ত হই। মোক্ষ সাধনের বিঘ্নগুলিকে যেন উপেক্ষা করতে পারি। কোন বিষয়েই যেন 'আমি কর্তা' এ বোধ না আসে। মানুষের বিশ্বাস চাই না, তাই অবিশ্বাসেরও ভয় নেই। বরং অবিশ্বাস যদি কেউ করে, (জগতে অবিশ্বাস কেউ করে না, হিংসাই করে) তাতে আমার আনন্দই হয় এই মনে ক'রে যে, একজনের হাত থেকে রেহাই পেলাম। আর সে আমাকে বিরক্ত করবে না। দীর্ঘ হোল পত্র। আপনার শরীর ভাল নয়, তাই ভয় হয়। প্রণাম গ্রহণ করবেন। নিঃ ইতি—

প্রণত নগেন

৭২

স্নেহের—

তোর পত্র পেলাম। আমার শরীর একরূপ আছে। মাঝে দিন কয়েক একটু খারাপ হয়েছিল। এখন ভাল আছি। অনেকদিন পর নির্জন ও নীরবতা পেয়ে মনটা আনন্দে আছে। কেবল খাই আর ঘুমাই: মাঝে মাঝে এধার ওধার ঘুরি। অবশ্য সব সময়ে ঘুরে বেড়ান সম্ভব হয় না, কারণ পয়সা থাকে না। মানুষ তো অনেক কিছু ইচ্ছা করে, অনেক কল্পনাও করে, কিন্তু "পক্ষহীন শোন বিহংগম, এ যে নহে পথ পালাবার। বারংবার পাইছ আঘাত, কেন কর বৃথা এ উদ্যম?" যেটা স্বভাব তা কি ছাড়া যায়? "স্বভাব ছাড়িয়া ভজে ভজি তার পায়।" নিজের ইচ্ছার দিকে জগতকে টানলে দুঃখ পেতেই হয়। যদি নিজের ইচ্ছা ছেড়ে জগতকে জগতের মত চলতে দেওয়া যায়, তবে ঘাত প্রতিঘাতে কম ভুগতে হয়। * * * নিজের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলে তবে জীবন আরম্ভ হয়। মানুষ অনেক কিছু কল্পনা করে নিয়ে চলতে থাকে; আর কল্পনা অনুযায়ী যখন ফল পায় না তখনই তার হয় দুঃখ। * * * বীজ পুঁতলে গাছ হবেই। বীজ না পুঁতে গাছ আর ফল চাওয়া যেমন পাগলামী, তোদের অবস্থাও তেমনি। অত সহজে যদি কিছু হত তবে আর কথা কি ছিল? যেটা মানুষের প্রকৃত অভাব প্রকৃতিই তা পূর্ণ করে থাকে। * * * ধারকরা ভাবটা আপনার করে নিতে অনেক সময় লাগে। ধৈর্য ধরে লেগে থাকতে হয়। আমাদের ধৈর্য নেই, তাই সবই হয় ভাসা ভাসা। ডুব দেবার ক্ষমতা তো একদিনে লাভ করা যায় না! একটা বিষয়ে

গভীর ভালবাসা না হলে ডুবে যাওয়া সম্ভব নয়। ভালবাসা হলে তারপর কি করতে হবে তা আর জেনে নিতে হয় না। সব নিজে নিজেই টের পাওয়া যায়। যদি ঠিক ঠিক ভালবাসা থাকে ইষ্টের প্রতি, তবে কি করতে হবে তা আর আমাকে বলে দিতে হবে না। বেশ তো, যা করলে ভাল মনে হয় তাই করিস। কবে দেখা হবে জানি না। পত্র না পেলে পত্র দিস না। ভালবাসা নিস। ইতি—

নগেন

৭৩

প্রিয়—

আপনার পত্র পেলাম। আমাদের জন্য ব্যস্ত হবেন না। আমাদের যাওয়া হবে কি না জানি না। আমার নিজের কথা হচ্ছে, প্রাণের টান না থাকলে কেবল পুণ্য করার জন্য না যাওয়াই ভাল। পুণ্য করার ইচ্ছা নেই।

বাড়ি ভাড়া হয়েছে জন্য দুঃখিত হবেন না। সময় না হলে কিছুই হয় না। চপলতা ত্যাগ করুন। একটা ভাব নিয়ে থাকুন। মানুষকে না চেয়ে ভাবকে চান। বহু সাধুসংগ কিন্তু মোটেই ভাল নয়। তাতে নিজের লক্ষ্য স্থির হয় না। জগতের শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ যাঁরা তাঁদের কাউকে (যথা বুদ্ধ, শংকর, খৃষ্ট, রামকৃষ্ণ ইত্যাদি) আদর্শ ক'রে তাঁদের জীবন আলোচনা, তাঁদের প্রসংগ, তাঁদের নাম স্মরণ, তাঁদের ভক্তের সেবা, তাঁদের কাছে আত্মনিবেদন, তাঁদের ভাবে ভরপুর থাকার চেষ্টা—এই সব নিয়ে থাকলে শান্তি পাবেন; আর বুঝতে পারবেন যে, একটা কিছু পেলেন—জীবনটা ব্যর্থ হয় নি।

একটা আদর্শ ধরে নিন। তারপর আমার যা করার আমি করতে পারি, নইলে কেবল কথা শুনে লাভ কি? জীবনে কি চান একবার মনকে জিজ্ঞাসা করুন। কোন পথে যাবেন তা ঠিক করে নিন। সংসারে হাজার হাজার লোক আছে যারা পুত্রশোক বা অন্য কোন শোক পেয়েছে, কিন্তু তারা আবার সেই সংসারের কথা ও চিন্তা নিয়েই আছে। শোকটাকে মোড় ফিরিয়ে দিয়ে সাধনায় লাগানোই শোকের সার্থকতা। প্রিয়তম সন্তান পরলোকে গিয়ে জানিয়ে দেয়, ছুনিয়া অনিত্য। সবই পড়ে থাকে। যে চলে যায় সে আর পূর্ব রূপ বা সম্বন্ধ নিয়ে ফিরে আসে না। পরলোকগত আত্মাকে প্রকৃত সম্মান করতে হলে মৃত্যুকে সামনে রেখে, শরীর ও সংসারকে অনিত্য জেনে, আদর্শ ও ইষ্টকে লক্ষ্য করে জীবনের পথে চলা উচিত। একটা ব্যথা পেয়েও যদি জীবনের পরিবর্তন না হয়, অর্থাৎ উচ্চতর আদর্শ আঁকড়ে ধরা না যায়, তবে জীবনটা দুর্বিষহ হয়ে পড়ে, জীবনটাকে বৃথা নষ্ট করা হয়।

আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করতে হলে সরল সহজ জীবন যাপন করা ও সহজ পথে চলা উচিত। যদি প্রাণই গেল, তবে আর ছায়া রেখে লাভ কি? শোক ধরে রাখবার চেষ্টা করেও ধরে রাখা যায় না। প্রথম দিন যে শোক ছিল আজ সে শোক নেই, পরে আরও কমে যাবে। এটা মহামায়ার মায়া, নিয়তির গতি। একে রোধ করার সাধ্য কারো নেই। চেষ্টা করে দেখুন শোকটাকে ধরে রাখতে পারেন কিনা। শোককে ধরে রাখার চেষ্টাতে পরলোকগত আত্মার অকল্যাণ করা হয়। যতদিন পর্যন্ত শোক ধরে রাখবার চেষ্টা করবেন ততদিন আধ্যাত্মিক উন্নতি হবে না।

মনটা শোক ধরে রাখবার চেষ্টাতেই ব্যাপৃত থাকবে, উপরে উঠতে পারবে না। শ্রাদ্ধের উদ্দেশ্য আত্মার ঊর্ধ্বগতি। ঊর্ধ্বগত আত্মাকে ধরে রাখবার চেষ্টা করলে যে চলে গেছে তারও কল্যাণ হয় না, নিজেরও মন নষ্ট হয়। সে মন দিয়ে না হয় সংসার, না হয় ধর্মজীবন; আর শান্তিও পাওয়া যায় না। পুত্রকে পুত্ররূপে ভাবলে কোন ফলই হবে না। তাকে দেবতার সংগে মিশিয়ে দিয়েছেন—দেবতার মধ্যে দেখতে চেষ্টা করুন। তাতে পরলোকগত আত্মার ও আপনাদের উভয়েরই কল্যাণ হবে। যখন ব্যথাটা প্রবল থাকে তখন মনটাকে একমুখী করবার সুবিধা হয়। মনকে যদি ঊর্ধ্বমুখ না করেন, তবে মন চিরদিনের জন্য মলিন থাকবে। জানেন তো, চণ্ডীতে আছে, মা ক্ষুধারূপে, নিদ্রারূপে ও ভ্রান্তিরূপে সর্বভূতে আছেন। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা প্রভৃতি সব শোক ভুলিয়ে দেয়। শোকটাকে ঊর্ধ্বগতি না করতে পারলে মনের দুর্বলতা বড় হয়ে ওঠে। কালের স্রোত অনবরত চলছে। যেটা অতীত তাকে আর ফিরিয়ে আনা যায় না। কালের সংগে লড়াই ক'রে বৃথা শক্তিক্ষয় ক'রে লাভ নেই। এই জন্যই হিন্দুরা বাইরে স্মৃতি রাখবার ব্যবস্থা করেনি, কিন্তু প্রত্যেক কাজেই যথা অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ, পূজা ইত্যাদিতে পরলোকগত আত্মার স্মরণের ব্যবস্থা করে গেছেন। তাঁদের স্মরণ না করলে কোন কাজই হয় না। প্রাচীন ঋষিরা জানতেন যে, মূর্তি বা ছবিতে স্মৃতি ধরে রাখা যায় না। প্রত্যেক কাজে স্মরণ করাই স্মৃতি রাখবার শ্রেষ্ঠ উপায়। তাঁরা আরও জানতেন যে, বাইরে স্মৃতি রাখলে অন্তরের স্মৃতি মুছে যায়। অন্তরের জিনিষ অন্তরেই চিরকাল থাকে। প্রিয়তমের চোখ দিয়েই

জগতকে দেখতে হয়, আর প্রিয়তমের অন্তর দিয়েই তাকে বুঝতে হয়। তাঁরই মন দিয়ে চিন্তা করতে হয়, আর তাঁরই প্রাণ দিয়ে অনুভব করতে হয়।

দুঃখ তাদের কাছেই দুঃখ যাদের জীবনে আদর্শ নেই। জীবনে আদর্শ থাকলে দুঃখ পরম বন্ধু, দুঃখ গুরু, দুঃখ সহায়। দুঃখে ধৈর্য আনে, দুঃখে সংযমের চেষ্টা আসে, দুঃখ অভিমান অহংকার নষ্ট করে। দুঃখ পেলে দুনিয়া অনিত্য বলে বোধ হয়, মন অন্তর্মুখ হয়, আর পার্থিব সুখ ছাড়া অপার্থিব কিছু পাবার চেষ্টা হয়। যীশু বলেছেন, 'শোকার্তেরা ধন্য, কারণ তারা সান্ত্বনা পাবে।' যদি জীবনে আদর্শ স্থির না থাকে, তবে দুঃখ জীবনকে ছোট করে, জীবনের আশা ভরসা নষ্ট করে ও রিপুর উত্তেজনা আনে। সাধারণের জীবনের চেয়ে আপনার জীবন একটু উপরে বলে মনে করি। ভিতরে অনেক জিনিষ আছে। বৃথা শোক ক'রে শক্তিক্ষয় ক'রে জীবন নষ্ট করবেন না।

অযথা শরীরকে কষ্ট দেবেন না। সেটা আত্মহত্যা। উচ্চ-আদর্শের জন্য গুরুনির্দিষ্ট পথে চলবার সময় কঠোরতার প্রয়োজন। বিনা কারণে শরীরকে কষ্ট দিলে খুব অন্যায় হয়—পাপ হয়।

বেশী বলা যায় না, পাছে ব্যথা লাগে; কিন্তু যে পথে চলেছেন তাতে জীবনের বিশেষ কিছু পরিবর্তন হবে বলে মনে হয় না। ব্রাহ্মণের শোক থাকেনা। শোক সবারই আসে, তবে শোক জয় করাই মনুষ্যত্ব, আর শোককে সাধনার সহায় করাই দেবত্ব।

আবার বলি—

বহু সাধুসঙ্গ করবেন না। একভাবের সাধুসঙ্গ করলে লাভ হয়, মনের উন্নতি হয়। যে মত ভাললাগে সেই মতের

সাধুদের সংগ করুন, সেই মতের গ্রন্থ পড়ুন। তাঁদের উপদেশ মত চলতে থাকুন।

জগতের শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষদের কাউকে আদর্শ ক'রে সাধনার পথে এগিয়ে চলুন।

শোকটাকে পুষে রাখবার বৃথা চেষ্টা করবেন না; তাতে এদিক ওদিক দুদিকই যাবে। অন্তরে যে ছবি আছে সে ছবি বাইরের স্মৃতিচিহ্ন ও ছবির চেয়ে অনেক স্থায়ী।

যে সব বইতে কেবল অলৌকিকতা আছে সে সব বই পড়ে জীবন নষ্ট করবেন না। অলৌকিকতা দু'এক জনেরই থাকে। অন্যে চেষ্টা করলেও তা পায় না, অথচ জীবন নষ্ট হয়। অলৌকিকতা অপেক্ষা পবিত্রতা, আত্মসংযম ও নিঃস্বার্থতা অনেক বড়।

পবিত্রতা, আত্মসংযম ও নিঃস্বার্থতাকে জীবনের ভিত্তি করুন। এ সমস্ত গুণ যাতে বেশী হয় তার চেষ্টা করুন। আধ্যাত্মিক জীবনের পরীক্ষাই হচ্ছে এই। ঠিক জানবেন, যার আধ্যাত্মিকতা যত বড়, তার ভিতরে ঐ সমস্ত গুণ তত বেশী। আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করবেন। মাকে প্রণাম দেবেন ও আপনি ভালবাসা গ্রহণ করবেন।

পুনঃ—

যেটুকু বলা কর্তব্য বোধ করলাম বললাম। আর বেশী এখন বলা চলে না। সংসারে যখন আর কোন বন্ধন নেই, যার জন্য সংসার সেই যখন চলে গেছে তখন শরীর, মন ও প্রাণ উচ্চ আদর্শে উৎসর্গ ক'রে জীবন ধন্য করুন। শোককে সার্থক করুন। ইতি—

আপনাদের নগেন

৭৪

মা,

আমার অর্ঘ্য গ্রহণ কর। আজ তোমাকে ভক্তি ও সাধন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলব—

(১) প্রথমে চাই শ্রদ্ধা। ঠাকুর, স্বামীজী ও শ্রীশ্রীমার প্রতি যদি শ্রদ্ধা থাকে, তবে আর যা তোমার প্রয়োজন তা আসতে বাধ্য। কেউ না কেউ এসে তোমাকে সব বলে দিয়ে যাবে। ঠাকুর, স্বামীজী ও শ্রীমা তিনে এক। ঠাকুরের শরণ নাও, তবেই সব হয়ে যাবে। (২) প্রীতি, প্রীতি মানে অন্তর দিয়ে ভালবাসা। তাঁতে যেন প্রীতি থাকে, অর্থাৎ তাঁকে ভালবেসে পাগল হতে হবে। শ্রদ্ধার সঙ্গে সঙ্গে ভালবাসা থাকা চাই। তাঁর সঙ্গে একটা সম্বন্ধ ঠিক করে নাও। সবচেয়ে যে সম্বন্ধ ভাল লাগে তাঁর সঙ্গে সেই সম্বন্ধ রাখ। (৩) তারপর বিরহ, অর্থাৎ তাঁকে পাবার জন্য কাতর হওয়া—তাঁর জন্য ব্যাকুল হওয়া। তাঁর দর্শন যে পেতেই হবে সে কথা মনে থাকলে, তবেই তাঁর বিরহে ব্যথা লাগে। যখনই তাঁকে স্মরণ করতে ভুলে যাবে তখনই যেন ব্যথা পাও। স্বামীজী বলেছেন, 'স্মরণ আর দর্শন একই কথা। স্মরণ ঠিক ঠিক হলেই দর্শন হয়ে থাকে।' (৪) অধৈর্য, অর্থাৎ তাঁর অদর্শনে যেন জীবন দুর্বহ হয়। তাঁর কথা ছাড়া অন্য কথা যেন ভাল না লাগে, অন্য জিনিষ যেন দেখতে ইচ্ছা না হয়। সর্বদাই তাঁর স্মরণ, তাঁর প্রসঙ্গ। নিজের সমস্ত চিন্তা যেন ভুল হয়ে যায়। সংসারের সংগে সকল সম্বন্ধ যেন দূর হয়ে যায়। যাঁরা তাঁর কথা বলেন, তাঁর চিন্তা করেন তাঁরাই আত্মীয়, আর সব অনাত্মীয়; তাদের সঙ্গে কোন শত্রুতা নেই, তবে টানও যেন না থাকে। (৫) প্রেম, প্রেম এলে জীবন

দীর্ঘ হোক, এই কামনা হয়। নিজের শরীর মন ভাল রাখতে ইচ্ছা হয় প্রেম আস্বাদন করার জন্য। তখন জীবনটা হয় সুন্দর। আর জীবনের প্রত্যেকটা মুহূর্ত হয়ে ওঠে মধুময়। তখন তাঁর স্পর্শিত সমস্ত বস্তুই প্রিয় হয়। তিনি যা কিছু ভালবাসেন সবই ভাল লাগে। তাঁর কথা, তাঁর প্রসঙ্গ, তাঁর জীবন, সবই তখন মধুময় হয়ে দেখা দেয়। তখন মনে হয়, দেহ তুচ্ছ, সংসার তুচ্ছ, সবই তুচ্ছ। মনে হয় সবই, এমন কি মুক্তি পর্যন্ত যেন প্রিয়তমের সেবায় উৎসর্গ করতে পারি। অন্তরে তখন প্রেমের উৎস খুলে যায়। তখন যাকে স্পর্শ করা যায়, যা স্পর্শ করা যায়, সবই মধুর ও পবিত্র হয়। অপবিত্রতা, মলিনতা কিছুই থাকে না। সে প্রেম এমনি জিনিস যে, প্রেমিক তখন ভগবানের কৃপা পর্যন্ত ভিক্ষা করে না—বিবেক, বৈরাগ্য, ব্যাকুলতা কিছুই চায় না। যেমন পোকা আগুনে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে পুড়ে মরে, তবু আগুনকেই আঁকড়ে ধরে, তেমনি প্রেমিক ভগবানের জন্য সর্বস্ব বিসর্জন দেয়, তবু ভগবানকে ছাড়ে না। এই প্রেমের জন্যই ধ্যান ধারণা, সাধনা ; এরই জন্যই সংযম, তিতিক্ষা। বিবাহ, সন্ন্যাস সবই এরই জন্য। তখন অহং মরে যায়, নিজের অস্তিত্ব পর্যন্ত থাকে না—প্রিয়তমের অস্তিত্বই তার অস্তিত্ব। তখন প্রেমই পূজা, জপ, ধ্যান সব। ধন্য সে যার ভিতরে এই প্রেম জাগ্রত হয়! প্রেমে কোন প্রতিদান আকাংক্ষা নেই, এমন কি মুক্তির ইচ্ছা পর্যন্ত নেই। প্রেম প্রেমেরই জন্য। প্রেম না ক'রে সে পারে না—প্রেমই তার স্বভাব হয়ে যায়। প্রেমে ভয় থাকে না, ঘৃণা থাকে না, লজ্জা থাকে না। নিজের সর্বোচ্চ আদর্শকেই

মানুষ প্রেম করে। যাকেই সে প্রেম করুক না কেন, সেই তার অন্তরের সর্বোত্তম আদর্শ। নিজের সর্বোত্তম আদর্শকেই প্রিয়তমের মধ্যে দেখে সে আত্মসমর্পণ করে। এই প্রেমেই জগতের শ্রেষ্ঠ আচার্যগণ পাগল। তাঁদের কাছে জগতের যা কিছু সবই সুন্দর, সবই পবিত্র। কুৎসিৎ অপবিত্র কিছু নেই। এই প্রেমের সাধনাই বেদ বেদান্ত, যোগ উপনিষদ্ ও শাক্ততন্ত্রে। এই প্রেমেই মানুষ গৃহী ও সন্ন্যাসী। এই প্রেমের প্রেরণাতেই জগৎ চলছে। মহাপুরুষগণ এই প্রেমেরই ঘনীভূত মূর্তি।

সাধনায় প্রবৃত্তি আসবার কালে নানারূপ বাধাবিঘ্ন এসে উপস্থিত হয়। সে সকল বাধাবিঘ্ন প্রবৃত্তিমূলক। ইন্দ্রিয় দশটি এবং প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ে দশরকম প্রবৃত্তি। মহাভারতের কৌরবগণ হচ্ছে প্রবৃত্তি পক্ষ। ধৃতরাষ্ট্র হচ্ছে মন—তাই অন্ধ। মন নিজে অন্ধ, তার পিছনে বুদ্ধি, বুদ্ধির পিছনে আত্মা। মনেরই একশত সন্তান হচ্ছে, প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের দশরকম প্রবৃত্তি। এরাই দুর্যোধন প্রভৃতি একশত ভাই। এই একশত ভাই সাধককে সাধনমার্গ থেকে চ্যুত করবার জন্য যুদ্ধ আরম্ভ করেছে। আর পাণ্ডবেরা পঞ্চ ভাই হচ্ছে, দেহের পঞ্চতত্ত্ব। এরা নিবৃত্তি পক্ষ। দেহটা হচ্ছে ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র। মন অন্ধ, তাই ধৃতরাষ্ট্র খবর নিচ্ছেন সঞ্জয়ের দ্বারা। সঞ্জয় হচ্ছে দিব্যদৃষ্টি। এই হচ্ছে সংক্ষেপে গীতার যৌগিক ব্যাখ্যা।

আজ স্বামীজীর ভক্তি ও সাধনা সম্বন্ধে আলোচনা করেই চিঠি শেষ করলাম। ঠাকুর স্বামিজী আমার উপাস্য। তাঁদের যে পূজা করে আমি তার দাস, সে আমার পূজ্য, সে আমার নমস্য। ইতি—

নগেন

৭৫

মা,

আমি সমস্ত বন্ধন মুক্ত হবার চেষ্টা করছি। ঠাকুর স্বামীজীকে বাদ দিয়ে আর মিশতে চাই না। সংসারের ভালমন্দ সংসার দেখুক, আর যিনি সংসার সৃষ্টি করেছেন তিনি দেখুন। আমার সে বিষয়ে ভাববার দরকার নেই।

দিন দিন করে সময় চলে যাচ্ছে। আর কতকাল বসে থাকবে? পূর্বে অজ্ঞানতাবশতঃ এক রোখে চলেছিলে—তার প্রয়োজন ছিল। দশ বৎসর কঠোরতা করে দেখলে, জ্ঞানও কিছু হল। অনেক শুনেছ, সাধনেরও অনেক কিছু পেয়েছ, যা মানুষ সহজে পায় না। বহু সাধ্যসাধনা করেও মানুষ অভাবপূর্ণ করতে পারে না। ঠাকুর তোমার সব অভাব পূর্ণ করেছেন। তোমার কিছুই নষ্ট হয় নি। বিন্দুমাত্র সময় ও শক্তি নষ্ট কোরো না। ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা কর, যেন আরও উচ্চ স্তরের জন্য মনটা তৈরি হয়। ইতি—

নগেন

৭৬

মা,

তুমি সন্ন্যাসিনী—তুমি জগতের মাতা। তোমার চরণে যে মাথা ছোঁয়াবে সে-ই সোনা হয়ে যাবে। এই কথা যেন তোমার মনে থাকে। মনে মুখে যেন বাজে চিন্তা বাজে কথা না থাকে। তুমি নিজেকে সম্পূর্ণ গুটিয়ে নাও। বাইরে কিছুই নেই, সবই

ভিতরে। নিজের মনের অন্তস্তলে ডুবে যাও। মন মুখ এক কর। কাউকে মনে কষ্ট দিও না; কারও কাছে বেশী ঘেঁসো না। আপন ভাবে আপনি বিভোর থাক। বেশী কথা বোলো না, যতটা পার চুপ থাক। অনবরত জপ কর। ঠাকুরের বিষয় পর পর মনে মনে আলোচনা কর, চিন্তা কর, তবে তো দর্শন পাবে। সময় চলে গেল। দুনিয়া ছেড়ে যাবার সময় হল। তুমি আমি সবাই চলে যাব, কেউ থাকব না, ভাবতে পার? তুমি যদি তোমার শরীর ভাল না কর, খামখেয়ালীভাবে চল, তবে কিন্তু এবারও তোমার পূর্বে গিয়েই তোমাকে কষ্ট দেব। সুস্থ শরীর, সুস্থ মন, নিয়মিত জীবন, ঠাকুর ও স্বামীজীর চিন্তা ও ধ্যান চাই। ঠাকুর ও স্বামীজীর বই ব্যাকুলতা নিয়ে পড়। শরৎ মহারাজের লেখা ঠাকুরের জীবন ধ্যান কর—তাঁর দর্শন নিশ্চয় পাবে। তিনি গুরু, তিনি তোমাকে যথেষ্ট কৃপা করেছেন, একথা ভুলো না। যদি তোমার শরীর শক্ত ও মন প্রফুল্ল দেখি, তবে তোমাকে গীতা, উপনিষদ্ ইত্যাদির কথা লিখব। গীতা রোজ পড়বে। ভাল ভাল শ্লোক মুখস্থ করবে; আর শ্লোকের প্রত্যেক কথার অর্থ শিখে রাখবে যাতে শ্লোক পড়লেই অর্থ বুঝতে পার। গীতার প্রত্যেক শ্লোকের উপরে ধ্যান কোরো। গীতা জীবনে পালন করতে চেষ্টা কোরো। ইতি—

ছেলে

৭৭

সারদাধাম

স্নেহের—

এই মাত্র তোমার প্রেরিত পার্শ্বেল পেলাম। আমি একবার 'চৈ' খেতে চেয়েছিলাম, সেজন্য কি চিরকাল আমাকে চৈ খেতে হবে? আর চৈ পাঠিও না।

তুমি এবার আষাঢ় মাসের প্রবাসী পড়ে দেখো। তাতে প্রীতিলতার একটা প্রবন্ধ আছে। তাতে নির্মল সেনের একটী চিত্র, আর অপূর্ব সেনের একটু আভাস পাবে। সূর্য সেনের আদেশে প্রীতিলতা ঐ প্রবন্ধ লিখেছেন। সূর্য সেন জানত যে, একদিন সে ধরা পড়বেই, তাই সঙ্গে ঐ লেখাগুলি রাখত। কারণ, তা হলে ঐ গুলি প্রকাশিত হবে এবং প্রকাশিত হলে লোকে জানতে পারবে, প্রীতিলতা, নির্মল ও অপূর্ব কি করেছে। ঐ লেখাগুলি তার পকেটেই থাকত।

মানুষ যখন একটা কিছু পায়, তখন সে আনন্দে উৎফুল্ল হয়, শরীরও ভাল হয়। আর সে যদি কিছু হারায়, তবে তার মন দুঃখে ভরে যায়। দুঃখ পেলে শরীর ও মনের উপর একটা প্রতিক্রিয়া হবেই। ভাব এমনি জিনিষ যে, ভাবের আবেগ প্রবল হলে মানুষ হার্ট ফেলও করতে পারে, শরীর খারাপ হওয়া তো সামান্য কথা।

যাঁরা সর্বত্যাগী তাঁরা যে ভাবেরই হোন না কেন, আমার প্রণম্য। তাঁদের জীবন একটা প্রেরণার উৎস। কোন কিছু ভালবাসলে ভিতরে আগুন জ্বলে। তখন আর ভয় বা অলসতার অবসর কোথায়? মরণ নিশ্চিত জেনে মরণকে বরণ ক'রে যাঁরা জীবন

যাত্রা সুরু করেন তাঁরা কত মহৎ। তাঁদের প্রতি যোগ্য সম্মান দিলে নিজেদের মনের বল বাড়ে, ত্যাগ তপস্যার ভাব বেশী হয়।

তোমাদের সঙ্গে গত বৎসর ছিলাম। এখন মনে হয়, সে আর এক জন্মের কথা। তখন ছিলাম উন্মুখ। এবার তোমাদের ওখানে গিয়ে একটা অধ্যায় যেটা এখানে আরম্ভ হয়েছিল, সেটা শেষ হল। একটা ধারাবাহিক ভাব তখন ছিল; তাই অত শীঘ্র আবার সকলে একত্র হয়েছিলাম। যার যেমন ভাব তার সংগে তেমন যোগাযোগ। ভাবটাকে গুটিয়ে নিতে বড় কষ্ট হয়েছিল। এখানে এসে কেবল ধ্যানে আপন মনে থাকতাম; তাই শরীরটা একটু দুর্বল হয়ে পড়েছে। বেশী ধ্যান ধারণা করলে শরীর দুর্বল হবেই, খাওয়াও কমে যাবেই, সুতরাং ও নিয়ে ভেবে লাভ নেই।

চিন্তা একস্থানে ধরে রাখা যায় না; তাই তোমাদের যা বলব, যা শুনাব ভেবেছিলাম তার প্রায় সব গুলোই ফিরিয়ে নিতে হল। যেখানকার জিনিষ সেখানে চলে গেল। আবার যদি সময় হয়, তবে হয়তো সেগুলি ফিরে আসতে পারে। তোমরা সকলে আমার ভালবাসা নিও। ইতি—

নগেন

৭৮

সারদাধাম

স্নেহের—

তোমার পত্র পেয়েছি। পরীক্ষায় পাশ করা না করা তোমার নিজের উপরই নির্ভর করে। তোমার নিজের ত্রুটি নিজে বুঝে যদি তার প্রতিকার করবার ইচ্ছা না জাগাও, তবে অন্য কেউ

তোমাকে পাশ করাতে পারবে না। তোমার বুদ্ধি আছে, স্মৃতিও আছে; কিন্তু তোমার ভয়ই তোমার জীবনকে নষ্ট করছে। এ 'ভয়'এর অর্থ নেই। ভয় জীবনের একটা বড় অন্তরায়। ভয় নিয়ে বসে থাকলে পিছনে পড়ে থাকবে। তখন আর কেউ তোমাকে ভালবাসবে না। এটা বুঝে পড়াশুনা কোরো। ভালবাসা নিও। ইতি—

নগেন

৭৯

প্রিয়—

আপনার পত্র পেয়েছি। ম্যালিগ্ন্যাণ্ট ম্যালেরিয়ায় শয্যাশায়ী ছিলাম, তাই উত্তর দেওয়া হয়নি। মন্ত্র জপ করলে দেবতা প্রসন্ন হন, এটা সাধারণ ধারণা; কিন্তু আসল কথা তা' নয়। দেবতা চিরপ্রসন্ন। আমাদের মন বিষয়মুখী; আমরা স্ত্রী, পুত্র অর্থ প্রভৃতির চিন্তায় ব্যাপৃত থাকি; তাই ইষ্টের চিন্তা হৃদয়ে স্থান পায় না। আমাদের হৃদয়ের দ্বার বিষয়ের দিকে মুক্ত, আর ঈশ্বরের দিকে রুদ্ধ; তাই ঈশ্বর বা ইষ্ট অন্তরে ঢুকতে পারেন না। নাম নামী অভেদ, এতে কোন সন্দেহ নেই। যেই নাম করবেন অমনি তিনি আসবেন, এও সত্য; কিন্তু হৃদয়ের দ্বার রুদ্ধ থাকায় তিনি বাইরে থেকে ফিরে যান, হৃদয়ে প্রবেশ করতে পারেন না। চিন্তা করলে, ঈশ্বর-ভাবনা করলে হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত হয় ও হৃদয়ে তাঁর বসবার স্থান হয়। তখন নাম করলেই তিনি এসে হৃদয়ে স্থান গ্রহণ করেন। সমাধি লাভের জন্য, রাগ দ্বেষ প্রভৃতি পঞ্চক্লেশ দূর করবার জন্য ও ঈশ্বরমুখী

দ্বার উন্মুক্ত করার জন্যই ঈশ্বরচিন্তা ও নাম করা। যোগশাস্ত্রেও তাই আছে। পাতঞ্জল সূত্রের সাধনপাদের ২য় সূত্র দেখবেন। *

নাম বলতে চিন্তাকে বুঝায়।······নিত্য সত্যই ধর্ম। সত্যই পরম ধর্ম, সত্যই পরম গুরু, সত্যই পরম পদ।······সত্য ছাড়া এই ত্রিজগতে আপন কেউ নেই—সেই সত্যকেই 'ভাগ্য' বলে থাকে।··· সত্যকে সর্বদা অভ্যাস করে নাম করতে হয়। (বেদবাণী ২য় খণ্ড)। আর একটা কথাও স্মরণ করিয়ে দিই। ঠাকুর মহাশয়ের (রামঠাকুর) নিজের কথা না হলেও তিনি তাঁর পত্রে উদ্ধৃত করেছেন—

"না দেখিবে কারো দোষ
না করিবে কারো রোষ
আপনি হইবে সাবধান"

—মহাজনপদ

ভাল আছি। ভালবাসা নেবেন। ইতি—

নগেন

৮০

স্নেহের—

লক্ষীটি, তোমার পত্র পেয়েছি। তোমার জন্য ভাবনা ছিল খুবই। তুমি বহুদিন নীরবে কেঁদেছ তা জানি; তাই তোমার জন্য আমার প্রাণটা বড়ই আকুল হয়েছিল, অথচ তোমার দুঃখ দূর করবার কোন উপায় ছিল না। আমিও নীরবে তোমার জন্য ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করেছি। ঠাকুর আমার প্রার্থনা শুনেছেন। এখন তুমি

* "সমাধিভাবনার্থঃ ক্লেশতনূকরণার্থশ্চ"

একটু শান্তি ও আনন্দে আছ। মা তোমার কাছে আছে। মা-ই তোমার ভার নেবে। এবার আমায় বিদায় দাও লক্ষ্মী!

তুমি নীরবে ঠাকুরকে ডেকে যাও। তোমার ভক্তি-অর্ঘ্য তাঁর চরণে দিয়ে, তাঁকে স্মরণ করে নিশ্চিন্ত মনে জীবনের পথে চলতে থাক তাঁকেই জীবনের ধ্রুবতারা কর; কারো উপর নির্ভর কোরো না। সুখে দুঃখে সর্ব অবস্থায় তাঁকে স্মরণ কোরো। শরীরটা সংসারের কাজে দিতে বাধ্য। কিন্তু অন্তরটা যেন সদা ঠাকুরের চরণে থাকে। সংসারে ঝড়ের এঁটো পাতা হয়ে থেকো। সংসারে থাকতে হলে কখনও স্পষ্ট কথা বলতে যেয়ো না, রাগ কোরো না, কারো কথার প্রতিবাদ কোরো না। কেবল নীরবে দেখবে, শুনবে, আর যা সবাই করতে বলে করে যাবে—ভালমন্দ কোন বাসনা করবে না।

এ জগতে চলতে হলে প্রতিপদে আঘাত খেতেই হবে। অন্তরটাকে দেখতে পায় এরূপ লোক খুবই কম। সবাই দেখে বাহিরটা—অন্তরের ভাবটা দেখে না কেউ; এই কথাটি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, এটা ভুলো না। এটা না ভুললে সংসারে শান্তিতে দিন কাটাতে পারবে। নিজেকে কর্ত্রী না ভেবে দাসী মনে করে সবার হুকুম পালন করে যাও, মুখ বুজে সব কাজ করে যাও। দুঃখ হলেও সবাইকে সুখী করবার জন্য মুখের হাসিটি যেন বজায় থাকে। সবার সুখে সুখী হও—ব্যক্তিগত অভাব যেন না থাকে।

এ সংসারে সরলতার স্থান নেই। তাই তোমাকে অনেক কষ্ট পেতে হয়েছে। তোমার ব্যথা তোমারই থাক। যতদিন পার সবাইকে সেবা করে, সবার কথা শুনে, কাজ করে সুখী কর। তারপর যখন আর পারবে না তখন একটা রোগকে অবলম্বন করে

মহামায়ার কোলে বিশ্রাম নেবে। দুঃখের চেয়ে কি শান্তিদাতা আর কিছু আছে? জগতে সেই শান্তি ও আনন্দ পায় যে দুঃখকে বরণ করতে পারে। জীবনে অনেক ব্যথা, অনেক দুঃখ তো পেয়েছ, মাঝে মাঝে নীরবে অন্তরে অন্তরে সেই সমস্ত স্মরণ করে মনটাকে শান্ত কর। হে কল্যাণী, সরলতা, স্নেহমমতা, ভালবাসার মূর্তি তুমি। তোমাকে আমার অন্তরের ভক্তিশ্রদ্ধা জানাচ্ছি। তুমি অন্তরে অন্তরে তা গ্রহণ কোরো। ইতি—

নগেন

৮১

শ্রীচরণেষু—

মা, এখানে কয়েকদিন হল নারায়ণের কাছে আছি। স্থানটা অতি সুন্দর। পাহাড়ের উপর সহর। চারি দিকে পাহাড়। ঝর ঝর শব্দে ঝরণা পড়ছে, আর কোন শব্দ নেই। এইখানে স্বামীজী ও হরি মহারাজ এসেছিলেন। এখানেই বোধ হয় খেতড়ির মহারাজের সংগে তাঁদের দেখা। এমন স্থান আর আমার চোখে পড়ে নি। এখানে প্রকৃতি যেন ধ্যানমগ্না। চারদিকে পাহাড়, মাঝখানে একটি হ্রদ, হ্রদের চারি পাশে রাস্তা, আর উপরে একটি বাড়ি। প্রত্যেক টিলায় একটি বাড়ি। এখান থেকে সূর্যাস্ত খুব সুন্দর দেখায়। সূর্যাস্ত দেখার একটি স্থান আছে। সেখান থেকে বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায়। এ পাহাড়টি খাড়া এক মাইল। ২৫ মাইল ঘুরে ঘুরে উপরে উঠতে হয়। এখানে এক সময় সাধু সন্ন্যাসী থাকত। সাধু সন্ন্যাসীর স্থানই বটে।

বাতাসটা খুবই সুন্দর, মনটা আপনিই অন্তর্মুখ হয়। পাহাড়ে চামেলী ফুলের বন। বনে বনে কেবল চামেলী ফুটে আছে। চতুর্দিকে তার সুন্দর গন্ধ কি আর বলব! সূর্যাস্ত দেখতে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে বহু দূরে নীচে একটি নদী। নদী মনে হয় যেন একটা রেখা—বহুদূরে এঁকেবেঁকে চলে গিয়েছে। ক্রমে ক্রমে সূর্য নীচু দিকে নামল, তারপর পাহাড়ের অন্তরালে চলে গেল। সূর্য ডুবে যাবার বহুক্ষণ পরেও চারিদিকে আকাশের গায়ে লাল ও নীল রংএর কি অপূর্ব খেলা! ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে এল—তখন দৃশ্য আরও সুন্দর। উপরে অনন্ত আকাশ, দূরে বহুদূরে সবুজ প্রান্তর। তার উপর পাহাড়ী জ্যোৎস্নার আলোকে প্রকৃতি নীরব। মাঝে মাঝে সে নীরবতা ভংগ হচ্ছে ঝরঝর ঝরণার শব্দে। সুন্দর আকাশ, সুন্দর চাঁদ, সুন্দর পাহাড়, সুন্দর গন্ধ! প্রকৃতি পরম সুন্দর, পরম প্রেমাস্পদ শ্রীভগবানের চরণপদ্মে অঞ্জলি অঞ্জলি ফুল অর্ঘ্যরূপে ঢেলে দিচ্ছে। পাছে ধ্যান ভংগ হয়, তাই সমস্ত প্রকৃতি নীরব। চাঁদ উপর থেকে চুপটি করে প্রকৃতির পূজা দেখছে। সমীরণ এই সমাচার দিকে দিকে বহন করছে। চঞ্চলা নির্ঝরিণী আনন্দে মাতোয়ারা—ঝর ঝর শব্দ করতে করতে উপর থেকে নীচে নামছে, আর আহ্বান করছে সবাইকে প্রকৃতির পূজা ও শ্রীভগবান কর্তৃক সে পূজা গ্রহণ দেখবার জন্য। আমি অবাক হয়ে এই মহামিলন দেখলাম। এ ব'লে বুঝান যায় না, না দেখলে ধারণা হয় না। তোমাদের ওখান থেকে এ স্থান প্রায় সতের শ' মাইল। দিল্লী থেকে এখানে আসবার ভাড়া দশ টাকা। যাতায়াতে কুড়ি টাকা। এখানে থাকবার জন্য কেন মন এত টেনেছিল তা এখন বুঝতে পারি।

স্বামীজী এখানে এসে খুব তপস্যা করেছিলেন। এখানে আরও কয়েক দিন থেকে তারপর চিতোর, উদয়পুর, আজমীর, পুষ্কর ও জয়পুর দেখে দিল্লী ফিরব। তারপর কোথায় যাব তা জানি না। এ ঠিকানায় পত্র দিবার প্রয়োজন নেই। ভুবনকে দেখে খুব আনন্দ হল। ভুবন সব বিষয়েই উন্নতি করেছে। অভিমান মোটে নেই। তবে শরীরটা একদম নষ্ট করেছে, তাই দুঃখ। আর কিছু লিখবার নেই। তুমি প্রণাম নিও ও সকলকে ভালবাসা দিও। পৃথক পত্র লিখলাম না। ইতি—

সেবক ছেলে

৮২

মা,

তোমাকে কতকগুলি বিষয়ে লিখছি। আশাকরি এগুলি জীবনে প্রতিপালন করবে। তোমার কথার উপর বিশ্বাস আছে। তুমি নিশ্চয়ই প্রতিপালন করতে চেষ্টা করবে।

(১) নিয়মিত সময়ে ওঠা, খাওয়া ও শোয়া।

(২) প্রতিদিন আহারের পর এক ঘণ্টা বিশ্রাম (দিনে ঘুমিও না)।

(৩) চিঠি পত্র লেখা ও অপ্রয়োজনীয় পত্র ছিঁড়ে ফেলে দেওয়া।

(৪) প্রতি সকালে, দুপুরে ও রাত্রিতে পাঠ। নিয়মিত পাঠ না করলে ধ্যান করতে পারবে না। আগে শ্রবণ, তারপর মনন, তারপর ধ্যান। না শুনলে কার চিন্তা করবে, কি চিন্তা করবে? ঠাকুর আগে শুনেছিলেন, তারপর মনন ও ধ্যান করেছিলেন।

ব্যাকুলতা বাড়ানো দরকার। জোর করে কিছু করতে গেলেই ফল উল্টো হবে। ধীরে ধীরে শক্তি বাড়াও।

(৫) তুমি সন্ন্যাসিনী, তুমি জগতের মাতা। সমস্ত সন্তানের দায়িত্ব তোমার উপর। তুমি নিজে সত্য লাভ কর তোমার জন্য নয়, তোমার সন্তানের জন্য। নিজেকে যশোদা মনে কর। মনে প্রাণে ঐ ভাব ফুটে উঠুক। কায়মনোবাক্যে যেন ঐ ভাব প্রকাশ পায়। মন মুখ এক হোক। তুমি সমস্ত সংস্কারমুক্ত। কোন সংস্কার তোমাকে বাঁধতে পারবে না।

(৬) প্রতিদিন ধ্যান করার সময় মনে কোরো, ভিতর থেকে অসীম শক্তি ঠেলে উঠছে, পবিত্রতা ফুটে বেরুচ্ছে, তোমার সামনে কেউ দাঁড়াতে পারছে না। তুমি সমস্ত শক্তির আধার—দুর্ব্বলতা নেই, অভাব নেই, দুঃখ নেই, অপূর্ণতা নেই। তুমি আনন্দের ঘনীভূত মূর্তি। জগতের সবাই তোমার সন্তান। এই তোমার সন্ন্যাসের ভিত্তি। আগে এইটি হোক তারপর আর সব হবে।

(৭) বাইরের ত্যাগের মূল্য খুব বেশী নেই। "আত্মসমর্পণই প্রকৃত সন্ন্যাস," স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলেন। প্রার্থনা করতে হয়, হে ঠাকুর, আমার শরীর মন সব তোমার; তুমি যেমন ইচ্ছা ব্যবহার করতে পার।

(৮) নিজের ব্যক্তিত্ব রেখো না। টাকা পয়সা ও সংসার সম্বন্ধে কোন মতামত দিও না, নিজের ভাবে নিজে ডুবে থাক, তোমার কোন দুঃখই থাকবে না।

(৯) দিনের বেশীর ভাগ সময়ই ধ্যান ও জপে কাটিও। অন্য সময় পড়া শুনা কোরো এবং ধ্যান করবার সময় মনে যে সব চিন্তা

আসে সেগুলি পরীক্ষা কোরো। ধ্যানের একটা ধারা যেন সব সময়ই থাকে। অন্য চিন্তা যেন মনে স্থান না পায়।

(১০) এখন এমন শক্তি সংগ্রহ কর যে পরে কোন বিপদই তোমাকে দুঃখ দিতে না পারে। এখন অভ্যাস না করলে পরে জীবন যাপন করতে বড় কষ্ট হবে। ধ্যান, জপ, পড়া ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ে নিয়মিত জীবন যাপন করলে শরীর ও মনের শক্তি বেশী হয়। স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলেছেন, নিয়মিত সাধন করলে শক্তি বেশী হয়। পরে ষোল ঘণ্টা পর্য্যন্ত ধ্যান জপ করতে কষ্ট হয় না। যদি একাসনে ধ্যান জপ করতে কষ্ট হয়, তবে শুয়ে জপ করবে।

(১১) তিনি বলেছেন, সত্য সত্য আকাংক্ষা থাকলে দেহ যাবার পরেও ঠাকুরের সন্তান এসে দেখা দিয়ে সমস্ত বিষয় শিক্ষা দিয়ে যান।

(১২) আত্মসমর্পণই সমস্ত সাধনার মূল। ঠাকুরের চরণে আত্মসমর্পণ করবে; তা ছাড়া আর সব ছুঁড়ে ফেলবে। ইতি—

নগেন

৮৩

স্নেহের—

তোমাকে একটা পত্র দিয়েছিলাম। সে পত্র তোমার হাতে পৌঁছেছে কিনা জানি না। আবার পত্র দিচ্ছি এইটুকু জানাবার জন্য যে, তোমার পত্র আমাকে কোন দুঃখই দেয়নি, বরং আনন্দই দিয়েছে। আমি জানি যে,

সুখস্য দুঃখস্য ন কোঽপি দাতা পরো দদাতীতি কুবুদ্ধিরেষা
অহং করোমীতি বৃথাভিমানঃ স্বকর্মসূত্রগ্রথিতো হি লোকঃ॥

মানুষ দুঃখ নিজে থেকেই পায়। কেউ কাউকে দুঃখ দিতে পারে না। সুখদুঃখ, ভালমন্দ সবই পূর্ব জন্মার্জিত কর্মের ফল। জন্ম-জন্মান্তরের সম্বন্ধ ও সংস্কার মানুষকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এমন অবস্থায় আনে, যাতে তাকে সুখ দুঃখ ভোগ করতে হয়। যিনি এই যোগাযোগ স্থাপন করেন তাঁর নাম বিধাতা। তাঁকে কেউ দেখতে পায় না। মানুষ কর্ম দেখে, আর দেখে তার ফল; কিন্তু কর্মকে সংস্কার, প্রারব্ধ, অদৃষ্ট, দৈব, নিয়তি যে নামেই অভিহিত কর না কেন, মানুষ এর দ্বারাই চালিত হয় ও ফলভোগ করে; আর এর ফল ভোগের জন্য নানা ঘটনা ও নানা পরিস্থিতির একত্র সমাবেশ হয়। প্রারব্ধের হাত থেকে নিষ্কৃতি পায় এমন কেউ নেই। প্রারব্ধকে ঈশ্বরের ইচ্ছা, শয়তানের ইচ্ছা, অদৃষ্ট প্রভৃতি নানা নাম দেওয়া হয়েছে। তাকে সত্যভাবে কেউ ব্যাখ্যা করতে পারে নি। জ্ঞানীরা তাকে অঘটন-ঘটন-পটিয়সী মায়ার অন্তর্গত ক'রে নিশ্চিন্ত হয়েছেন। যাই হোক না কেন, এটা ঠিক যে মানুষ নিজের দুঃখের জন্য নিজেই দায়ী। অন্য কেউ তাকে দুঃখ দিতে পারে না। সুতরাং তোমার মনে করার কারণ নেই যে, আমার জন্য তুমি দুঃখ পেয়েছ বা তোমার জন্য আমি দুঃখ পেয়েছি।

আমি আবার বলি, তোমার পত্র আমাকে দুঃখ তো দেয়ই নাই, বরং এমন একটা কিছু দিয়েছে যা দুঃখকে কাছে ঘেঁসতেই দেয় না। সে জিনিসটা নিস্তেজ ও শক্তিহীন, কিন্তু বিদ্যুৎবাহী হলে তার ক্ষমতা হয় অসীম, কারণ তখন তার শক্তি আসে পশ্চাতের বিদ্যুতাধার থেকে। মানুষ অতি ক্ষুদ্র, পৃথিবীর ধূলিতে তার জন্ম, এই ধূলিতেই তার পরিণতি; কিন্তু পশ্চাতে এমন এক মহাশক্তি আছে যার নিবিড়

স্পর্শে মানুষ অসীম শক্তিশালী হয়ে পড়ে। হয়তো সেটা ক্ষণিকের, সে-শক্তির পরিচয় হয়তো মানুষ নিজেও জানতে পারে না, তবুও তার ভিতর দিয়েই মহাশক্তি তাঁর কার্যসিদ্ধি করে থাকেন।

জগতে যে সব ঘটনা ঘটে তার কোনটাই অর্থশূন্য বা উদ্দেশ্যবিহীন নয়। আবার একটি ঘটনা একটিমাত্র ফল প্রসব করেই মিলিয়ে যায় না। জগৎপ্রবাহ চলছে অবিরাম, আর সেই সংগে চলছে মানব-জীবন-প্রবাহ বিরামহীনভাবে। যারা চলছে তাদের মধ্যে কখনও বা কয়েকজন একত্র সংঘবদ্ধ হয়ে চলে, আবার হয়তো পরমুহূর্তেই বিক্ষিপ্ত হয়ে তারা অন্যগতির সহিত মিলিত হয়। এইভাবে জীবনপ্রবাহ নানাবিধ আবর্তের মধ্য দিয়ে, নানা ভাঙাগড়া, ওঠানামা, সুখদুঃখ, ভালমন্দ, মিলনবিরহের মধ্য দিয়ে কাল সমুদ্রের অসীমে মিলিত হয়। কোথায় এর আরম্ভ, কোথায় শেষ, কেউ জানে না। তাই কবি বলেছেন—

"কোথা হ'তে আসি মোরা কোথা চলে যাই
ভাবুক সুজন, ভাব হে তাই।"

এ গতির শেষ নেই, চিরজীবন চিন্তা করেও এর খেই মেলে না। যতই ভাববে ততই প্রহেলিকা মনে হবে ; তখন বুঝতে পারবে—

"কাঁটা হয়ে থাকি কেতকী ফুলে ফণা তুলে রই তটিনী কূলে
ঢালি সাগরের তলে তপন কিরণ
আঁধার ঘরে চাঁদ ভাসাই॥
আমরা হাসির ভিতর শোকের গান, সলিলে অনিলে শিলায় প্রাণ,
শুকাই সাগর, বসাই নগর,
আমরা শিশির নীরে গিরি গলাই॥"

সুতরাং নিয়তির কার্যের গতি বুঝতে চেষ্টা না ক'রে বুঝতে চেষ্টা করা উচিত সেই মহাশক্তিকে যিনি সমুদয় পরিবর্তনের মধ্যে জীবনকে অভিব্যক্ত করতে করতে লক্ষ্যে পৌঁছে দিচ্ছেন। সেই শক্তির এক কণা কথায় কর্মে, চিঠিতে পত্রে, নয়নে বদনে বা অন্য কোন রূপে ব্যক্ত হলে মানুষের অন্তরকে স্পর্শ করে ও তাকে জীবনের পথে দ্রুত অগ্রসর ক'রে দেয়। তোমার অজ্ঞাতসারে এক মুহূর্তের জন্য তোমার পত্রের ভিতর দিয়ে সেই মহাশক্তি আবির্ভূত হয়ে আমার অন্তরকে স্পর্শ করেছিল, আর তার ফলে মনে অসীম শক্তি ও অন্তরে অনন্ত আনন্দ লাভ করতে পেরেছি। যদিও তুমি নিজে এর কিছুই জান না, তবু সেই অজ্ঞাত মহাশক্তি তোমার ভিতর দিয়ে মুহূর্তের জন্য কার্য ক'রে গেছেন।

এই শক্তি গুরুশক্তি, এই শক্তির কখন কি ভাবে যে স্ফুরণ হয় তা মানবের অজ্ঞাত; কিন্তু এই শক্তিস্পর্শে মানবজীবন ধন্য হয়। মানুষ চকিতের তরে এই অপার্থিব শক্তির সহিত যুক্ত হয়ে বলতে পারে, "আমি ভুললেও মা ভোলেন না একটিবার।" বলতে পারে,

"আমি তো তোমারে চাহিনি জীবনে
তুমি অভাগারে চেয়েছ,
আমি না ডাকিতে হৃদয় মাঝারে
নিজে এসে দেখা দিয়েছ।"

একবার তাঁর শরণাপন্ন হলে তিনি জীবনের গতি কিছুতেই থামতে দেন না। কোন মানুষ বা ঘটনা তাকে আর বেঁধে রাখতে পারে না। মা নিজে অসি ধারণ ক'রে সর্ববন্ধন মুক্ত ক'রে দেন। মানুষ যতক্ষণ না জীবনের পথে চলতে পারে ততক্ষণ তার জীবনের গতি গতানুগতিক

নিয়মেই চলে। সকাল থেকে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা থেকে সকাল একই নিয়মে দিনের পর দিন আবর্তিত হয়। আর যারা জীবন-পথের পথিক, যারা সংসার মরুভূমির মাঝে চলতে আরম্ভ করেছে অজানার সন্ধানে, তাদের জীবন প্রতিমুহূর্তে বদলাতে থাকে। তারা ঘণ্টায় পঞ্চাশবার জন্মায় ও পঞ্চাশবার মরে। অন্যে পঞ্চাশ বছর ধরে একই জীবন চালায়। জীবনের পথে চলতে চলতে ক্লান্তি আসে, অবসন্নতা আসে সত্য, কিন্তু তবুও চলার বিরাম নেই—ছুটি নেই। পথিক যে তাকে বলতেই হবে—

"চুকিয়ে এলাম কান্না হাসি, ভেঙে এলাম খেলার বাঁশী।"

যে মহাশক্তির স্পর্শ তোমার মধ্য দিয়ে পেয়েছি আজ তাকে সমস্ত অন্তর দিয়ে প্রণতি জানাচ্ছি। তার কাছে করজোড়ে এই নিবেদন—"হে মহাশক্তি, তুমি আমার অশেষ কল্যাণ করেছ, তোমার চরণে পুনঃ পুনঃ প্রণাম।"

নিজের শত চেষ্টাতেও যা সম্ভব হত না তা এক মুহূর্তেই সম্ভব হল। যে শক্তির দ্বারা এটা সম্ভব হয়, সে শক্তি মানুষের নয়, দেবতার। তাকে অন্তরের কৃতজ্ঞতা না জানানো অত্যন্ত অন্যায়, তাই পুনঃ পুনঃ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। মর্তের বন্ধন ক্ষয় হোক, স্বাধীনতার আনন্দ উপভোগ করি, জীবন প্রবাহে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে ভাসতে ভাসতে অনন্ত জীবনসমুদ্রে গিয়ে পৌঁছি—এ জীব মাত্রেরই কাম্য। যে কার্যে এই কামনা পূর্ণ হয় সেইটাই সাধনা ; আর যে কোন মুহূর্তে যিনি এই কামনা পূর্ণতায় সহায়তা করেন তিনি গুরু।

যজ্ঞ, দান, তপস্যা প্রভৃতি পুণ্য কর্ম মানব প্রতিনিয়ত করলেও যদি না জীবনের একটি লক্ষ্য বা আদর্শ থাকে, তবে সবই ব্যর্থ হয় ; অর্থাৎ এ সব করেও মানুষ জীবনে শান্তি, আনন্দ, অফুরন্ত উৎসাহ ও

উত্তম নিয়ে চলতে পারে না। জীবনের লক্ষ্য ঠিক থাকলে মা তাকে কাঁটাবন দিয়ে নিয়ে গিয়েও জীবনকে সার্থক ক'রে তোলেন। জীবনের এমন একটি অবস্থা হয় যখন ভালমন্দ, সুখদুঃখ, নিন্দাস্তুতি সবই মানুষকে লক্ষ্যের দিকেই এগিয়ে দেয়। তখন মন সূক্ষ্ম শরীরে বিশ্বাসী হয় এবং সেই শরীরেই বেশী সময় বাস করতে পারে, আর তখনই হয় জীবনের যাত্রা সুরু। মনের এই অবস্থায় মানুষ এ জগতের নিকট থেকে কিছুই প্রত্যাশা করে না। কিন্তু জগতের নিকট থেকে সামান্য কিছু পেলেই চিরকৃতজ্ঞ হয়। পেলেও কোন সুখ নেই, না পেলেও কোন দুঃখ নেই। সুখ বাইরের বস্তু নয়। চিত্তস্থির হলে তাতে আনন্দ প্রতিবিম্বিত হয়। জগতকে প্রত্যাখ্যান না করলে চিত্ত স্থির হয় না। এই জন্যই দানের ব্যবস্থা। না দিলে পাওয়া যায় না। "অবিরত দানে বড়, নিরাকাংক্ষ প্রতিদানে।" এ না হলে জগতকে প্রত্যাখ্যান করা চলে না। জগতের নিকট থেকে কিছু নিলে তা নানা ভাবে ফিরিয়ে দিতে হয়, না দিতে পারলে অত্যন্ত দুঃখ ভোগ করতে হয়।

চলবার দুটি প্রণালী আছে। একটি হচ্ছে, জগৎকে নিজের দিকে টেনে রাখা। এ পথে যারা চলে তারা চায়, জগতের সবাই আমাকে দিক ও আমার মত চলুক। সাধারণ লোক এই পথে চলে বলে তারা অশেষ দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করতে বাধ্য হয়। কৃষ্ণ, বুদ্ধ, রামকৃষ্ণ প্রভৃতির মত তপস্বী না হলে জগতকে নিজের দিকে টানতে পারা যায় না, বা ধরে রাখাও যায় না। অন্যটি হচ্ছে, জগতের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া। যাকে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন,—

"দাও আর ফিরে নাহি চাও থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল"

যাকে শ্রীমা বলেছেন, "জগতে কেউ তোমার পর নয়, সবাইকে আপনার করে নাও, জগতকে আপনার করে নিতে হয়। জগতের দোষ দেখো না, দোষ দেখবে নিজের যদি মনে শান্তি চাও।" এই দুই পথ ছাড়াও আর একটা মধ্যপথ আছে। যারা এই পথের পথিক তারা একটা উচ্চ আদর্শ নিয়ে জীবনের পথে চলতে থাকে। কিন্তু আদর্শে পৌঁছিবার কোন বিশেষ সাহায্য পায়নি। তারা জগতের কাছে কিছু চায়, কিন্তু বেশী চায় না ; জানে জগতের নিকট থেকে বেশী কিছু পাওয়া যায় না, কিংবা পেলেও নিজের ক্ষমতার অতিরিক্ত কিছুই ধরে রাখা যায় না। সুতরাং জগতের ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে তারা চলতে চেষ্টা করে দ্রষ্টার মত, সাক্ষীর মত। তাতে মনের সমতা আনে। তাদের জীবনে ভালমন্দ যা'ই ঘটুক না কেন, তা দেয় জ্ঞান, আর দৃঢ় করে বিশ্বাসকে।

জীবনপথের প্রধান পাথেয় বিশ্বাস। মানুষ নিজের বিশ্বাস নিয়েই চলে। অন্য কেউ মানুষকে বিশ্বাস দিতে পারে না। একমাত্র অবতারপুরুষই বিশ্বাস দিতে পারেন। অবতারের চিহ্নিত পার্ষদ কিংবা বিশেষ শক্তিপ্রাপ্ত সংগী ব্যতীত অপর কেউই কারো বিশ্বাসকে দৃঢ় করতে পারে না। অজ্ঞ লোক ভিখারীর মত চারিদিকে বিশ্বাস ভিক্ষা করে বেড়ায়, কিন্তু একবারও ভাবে না যে, বিশ্বাস ধরে রাখবার পাত্রটি তার নিজের। সেই আধারটি নিয়েই সে জন্মেছে, অপর কেউ তার বিশ্বাসের আধারকে বড় করে দিতে পারে না। যারা জীবনের পথে চলতে পারে না তারা অবশ্য সংসারকে খুব শক্ত করেই আঁকড়ে ধরে, আর সংসারের ঘাতপ্রতিঘাতে প্রতি মুহূর্তেই চূর্ণ হয়। পরে তারা বুঝতে পারে যে, সংসারে কেবল অশান্তি, দুঃখ আর জ্বালা।

লক্ষ্য মানুষ বা সংসার নয়, সুখ জীবনের উদ্দেশ্য নয়, জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে জ্ঞান; কারণ জীবনের সব অবস্থারই পরিবর্তন হয়, কেবল পরিবর্তন হয় না জ্ঞানের। এই লক্ষ্যে স্থির থাকলে শত্রু মিত্র, ভাল মন্দ, সুখ দুঃখ প্রভৃতিতে কোন পার্থক্যই থাকে না। যে যাই করুক না কেন, তার ফল হয় অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান। এই জ্ঞানকে ছেড়ে অন্য কোন জিনিসকে ধরতে গেলেই মানুষ অশেষ দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ ক'রে থাকে। মানব যেমন চেতন তার চারিপার্শ্বস্থিত জীব, জন্তু, বৃক্ষলতাও তেমনি চেতন, আর যে সমস্ত ঘটনা ঘটে সেগুলিও অর্থপূর্ণ। যে ঘটনাগুলি দৈনন্দিন জীবনে ঘটে থাকে তার অধিকাংশই আমরা লক্ষ্য করি না; কারণ যে সকল ঘটনার সংগে স্বার্থের যোগ নেই, সে সব ঘটনা সম্বন্ধে চিন্তা করতে আমরা অভ্যস্ত নই। মানব বিভিন্ন জন্মে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে যে সমস্ত বাসনা করেছে, তাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি ঘটনা ঈশ্বরের ইচ্ছায় সেই সব বাসনা সিদ্ধির জন্যই ঘটে থাকে। যারা জীবনপথের পথিক তারা বেশ বুঝতে পারে, কোন একটি ঘটনাও নিরর্থক ঘটে না; কিংবা কোন এক বিশেষ ব্যক্তির সুখ দুঃখ, ভাল মন্দের জন্যেও ঘটে না। জগতের প্রত্যেকটি ঘটনাই অন্যটির সংগে অচ্ছেদ্যভাবে সম্বন্ধযুক্ত। নানা ঘটনাপরম্পরার মধ্য দিয়ে মানুষের জীবন বয়ে চলেছে একটা একটানা প্রবাহ রূপে, সমুদ্রগামী নদী যেমন পথের বাধা বিঘ্নকে অতিক্রম ক'রে কখনও মন্দিরের পাশ দিয়ে, কখনও বা পায়খানার কাছ দিয়ে চলতে থাকে। তখন তার দিক-বিদিক জ্ঞান থাকে না, তার বিরাম নেই, কেবল সে ছোটে ঊর্ধ্বশ্বাসে। তাতে কত ভাঙাগড়া, কত সুখ দুঃখ, হাসি অশ্রু মিশে আছে,

কিন্তু সে সর্বদা উদাসীন থেকে অবিরাম গতিতে চলতে থাকে সমুদ্রের পানে; কারণ চলাই তার জীবন, থামা তার পক্ষে সম্ভব নয়। মানব জীবনও ঠিক তেমনি কোথা থেকে আসে কোথা চলে যায়, কত হাসি কান্নার তরংগ তোলে, কিন্তু কোথাও স্থির থাকে না। সে চলতে থাকে নিরন্তর, আর এই চলার পথে কখনও শত্রুতা, কখনও বা মিত্রতা করে, কখনও মিলন কখনো বা বিরহের মধ্য দিয়ে নিজে ফুটতে ফুটতে ও অপরকে ফোটাতে ফোটাতে অনন্ত জীবনসমুদ্রে লীন হয়। জীবনের দিকে সমগ্র দৃষ্টি না দিলে অনেক দুঃখ পেতে হয়। মানুষের প্রত্যেক জন্মের পিছনে অনন্ত জন্মের অনন্ত শক্তি, অনন্ত বাসনা লুকিয়ে থাকে, তাই মানুষ ভয়ে ভয়ে বলে—

"লক্ষ্যশূন্য লক্ষ বাসনা ছুটিছে গভীর আঁধারে
(আমি) জানিনা কখন ডুবে যাব কোন অকূল তিমির পাথারে ॥"

পিছনের দিকে চাই না, আর সম্মুখেও দৃষ্টি প্রসারিত করতে পারি না। না চাই অতীত, না চাই ভবিষ্যৎ; কেবল বর্তমানের প্রত্যেকটি ঘটনা পৃথক পৃথক ভাবে প্রতি মুহূর্তে গ্রহণ করি; তাই আমাদের দুঃখের অবধি থাকে না। জীবন সম্বন্ধে, জগৎ সম্বন্ধে, ঈশ্বর, অবতার ও সাধন সম্বন্ধে যদি সামান্য জ্ঞান থাকত, তবে মানুষ অন্ধের মত অন্যের উপর নির্ভর করবার প্রয়াস পেত না। আর আসল কথা—কেউ কারো উপর নির্ভর করে না, প্রকৃতি ও সংস্কার অনুযায়ী যতটুকু নির্ভর করা দরকার তার চেয়ে বেশী নির্ভর করতে পারে না, নির্ভর করতে চায়ও না। নিজের সুখ দুঃখ অন্যের উপর নির্ভর করে না।

কেন জানিনা ছেলেবেলা থেকেই কারো দোষ দেখিনি, বা

দোষ দেখলেও সে সম্বন্ধে কোন কথা বলি নি। সেজন্য কত মার খেতে হয়েছে; কত নির্যাতন, লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছে; তবুও পরকে দোষী করতে পারি নি। তারপর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই বোধটি দৃঢ় হল যে, (১) একজনকে দোষী করলে নিজের কোন লাভ নেই। (২) এতে নিজের দোষের ক্ষালন হয় না। (৩) অন্যেরও দোষ দূর হয় না। যদি অন্যের জীবন পরিবর্ত্তন করা যেত, যদি অপরকে দোষমুক্ত করা সম্ভব হত, কিংবা নিয়তির গতিরোধ বা অদৃষ্টখণ্ডন করা যেত বা প্রারব্ধ নষ্ট হত, তবে অন্যের দোষ কীর্তনে লাভ ছিল। যেটা ঘটবে তাকে রোধ করবার ক্ষমতা কারো নেই; নিয়তির নিকট মানুষ এতই হীনবল! তাই জ্ঞানী ব্যক্তিরা মানুষের দোষ না দেখিয়ে জীবনের লক্ষ্যকে সামনে ধরেন, মানুষের চিন্তা শক্তির উন্মেষ ক'রে দেন, চলবার পথের অন্তরায় দূর ক'রে দেন, পড়ে গেলে টেনে তোলেন। আর যারা প্রেমিক তারা মায়ের মত নিজের অন্তর্নিহিত করুণা, প্রেম, ভালবাসা দিয়ে অপূর্ণতাকে পূর্ণ করে দেন। যেখানে স্বার্থ সেখানে শুধু চাওয়া। যারা স্বার্থ নিয়ে আছে তারা সব জিনিসই পূর্ণরূপে চায়, নিজে কিছুই দিতে প্রস্তুত নয়। কিন্তু মানুষ একবারও মনে রাখে না যে, স্থূলে ভালবাসা নেই, ভালবাসা ভাবরাজ্যে। যাঁরা যত স্থূলে বিচরণ করেন, যাঁদের মন ভাবরাজ্যে একবারও যায় না তাঁরা ভালবাসা নিয়ে তত মারামারি কাটাকাটি করেন। কি জ্ঞানপথে, কি প্রেমপথে সর্বত্রই দায়িত্ব নিজের উপরে।

ঠাকুরের কৃপায় জীবনের প্রথম থেকেই দুঃখ, বিপদ, দায়িত্ব ঘাড়ে নিতে ভালবেসেছি। সেজন্য অনেক কষ্ট লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছে,

তবুও দায়িত্ববিহীন, বিপদশূন্য, দুঃখ কষ্ট নেই, এমন কোন কাজ করতে পারি নি, এখনও পারি না। যেটা ধরি সেটাকে শেষ না করে ছাড়ি না। মাঝ পথে ছেড়ে দেওয়া আমার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। তাই দুঃখ বিপদ, কষ্ট গ্লানি, অপমান ঘৃণা, প্রভৃতির দিকে না তাকিয়ে চিরদিনই দৃষ্টি রেখেছি সেই কর্ত্তব্যের প্রতি যাকে স্বেচ্ছায় বরণ ক'রে নিয়েছি। মানবজীবনের গতি জানলে জীবনযাত্রা সহজ হয়।

যে যেটা চায়, যার যেটা আদর্শ, সেইটাই তার জীবন। শরীর তার বিরোধী হতে পারে, মন চঞ্চল হয়ে তাকে কষ্ট দিতে পারে, তবু সেইটাই তার জীবন। যে যেটা বরণ ক'রে নেয়, বুঝতে হবে, তার বীজ তার অন্তরেই সুপ্ত আছে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুকূল হলে সেই বীজ অঙ্কুরিত হয়ে ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে ফলফুলে সার্থক হতে পারে। লক্ষ্যের দিকে মন থাকলে নানা পথ দিয়ে তাকে লক্ষ্যে পৌঁছিয়ে দেবেই দেবে। লক্ষ্য নির্বাচনই জীবন, আর সবই তাঁর হাতে। কবীর বলতেন, "পৃথিবী তাঁর, বীজ তাঁর, মাটি, বলদ, মানুষ প্রকৃতি সবই তাঁর, আলো বৃষ্টিও তাঁর ; মানুষের কাজ কেবল চাষ করা, ফল ভগবানের হাতে।"

যেটা না হলে জীবন চলে না, যেটা জীবনের প্রধান অবলম্বন ও প্রধান কেন্দ্র সেটা মানুষ কখনই ছাড়তে পারে না। বাপ মা, ভাইবোন, স্ত্রী পুত্র, এমন কি মায়ের একমাত্র পুত্র মরে গেলেও সংসারের সকল কাজই সমভাবে চলতে থাকে ; কারো অভাবে কেউ কোন কাজ ছাড়ে না, কোন কাজ আটকেও থাকে না ; তবুও মানুষ বলতে চায়, অন্যের উপরে তার জীবন অনেকটা নির্ভর করে। তাই সত্যই মনে হয়, ভেবে দেখ মন, "কেউ কারু নয়, মিছে ভ্রম ভূমণ্ডলে।"

তবে জ্ঞান নিয়ে চললে জীবনটা আশার দিকে বেশী ঝুঁকে পড়ে না ; সুতরাং তার বিপরীত নৈরাশ্যও উপস্থিত হয় না।

যজ্ঞ, দান ও তপস্যা, এই তিনটি জীবনের ভিত্তি। জীবনটাকে চালাতে হলে এই তিনটির উপর সমভাবে দৃষ্টি রাখতে হয় ; এর ব্যতিক্রম হলে জীবনটাতে বিপর্যয় ঘটে থাকে। যজ্ঞ হল নাম, আর তপস্যা হল জীবনের উদ্দেশ্যের জন্যে দুঃখকে বরণ করা ; আর এই দুটোকে ঠিক পথে চালিয়ে নিতে পারে দান। দান না থাকলে তপস্যা ও যজ্ঞ জীবনকে বেশীদূর এগিয়ে নিতে পারে না, দান অর্থ নিজে কিছু না চাওয়া, এবং অন্যকে সর্ব বিষয়ে সাহায্য করা। নিজে দুঃখ অসুবিধা বরণ করেও অন্যের সুখ সুবিধা দেওয়াই দান। মনুষ্যজীবনের কেন্দ্র নিজের শরীর ও মন। মানুষ চায় নিজের শরীর ও মনের সুখ। সে অন্যের কথা ভাবতেও পারে না। যতদিন পর্যন্ত সে অন্যের ভাবনা ভাবতে না শেখে, ততদিন পর্যন্ত সে মনুষ্যস্তরে পৌঁছেছে, এ কথা বলা চলে না। মানুষ প্রত্যেক ক্ষেত্রে কেবল নিতেই চায়, দিতে চায় না ; কিন্তু সংসারের তা নিয়ম নয়। এখানে না দিলে কিছুই পাওয়া যায় না। যদি কেউ নিজেকে নিঃস্ব ক'রে দিতে পারে, সে-ই ভগবানের নিকট থেকে নিজেকে পূর্ণ করবার শক্তি পায়। জীবনের প্রধান কাজই দান। দানে মানুষকে নিঃস্বার্থ করে। দানে অন্যের দুঃখ যন্ত্রণা বুঝবার ক্ষমতা হয়, হৃদয়ের প্রসন্নতা হয়, জগতের প্রত্যেকের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপনের সুযোগ হয় এবং নিজের স্বার্থ, সুখ, সুবিধা অতি সহজেই ভুলতে পারা যায়। দানের ভাব না জাগালে সত্যকার জীবনযাত্রা আরম্ভ হয় না। যখনই দেওয়ার ভাব কমে আসে তখনই জীবনে দুঃখ অশান্তির ভাব প্রবল

হয়ে ওঠে। গুরু আসেন জগতে এই দেওয়া শিক্ষা দিতে। এইজন্য গুরুর স্থান এত উপরে। গুরু আর ভগবান এক। মানুষ গুরু নয়, অবতারগণই গুরু। দীক্ষার পরেও হৃদয়ের প্রসারতা না জাগলে বুঝতে হবে, মানুষ দেহকেই গুরু মনে করেছে, আত্মাকে গুরু মনে করে নি। একজন বড় বৈজ্ঞানিক সিদ্ধপুরুষ তাঁর গ্রন্থে গুরুকে বন্দনা করতে গিয়ে বলেছেন, গুরু ঈশ্বরের সেই শক্তি যা মানুষের ভিতরে আনে জাগরণ, যা মানুষকে করে বন্ধনমুক্ত ও মনকে করে অন্তর্মুখ। তিনি গুরুকে ঈশ্বরের চেয়েও বড় করেছেন ; কারণ তাঁর মতে—ঈশ্বর জীবকে বন্ধন করেন ও মুক্তিও দেন, কিন্তু গুরু কেবল মুক্তি দিয়েই থাকেন। সেই গুরুশক্তির ধ্যান কর, তাঁর গুণ কীর্তন কর, আনন্দে মগ্ন হও।

সাধনার পথে চললে মানুষ একই জীবনে অনেকবার ম'রে নূতন জীবন ধারণ করে। তুমিও নূতন জীবন প্রাপ্ত হও, অতীত মরে যাক, নূতন ভবিষ্যৎ গড়ে তোল, এই একমাত্র প্রার্থনা। কিছু পেলে কিছু ফিরিয়ে দিতে হয়। তোমার কাছে যা পেয়েছি তারই প্রতিদানে অর্ঘ্যস্বরূপ এই পত্রখানি লিখলাম। ইতি—

নগেন

৮৪

সারদাধাম : ভুবনেশ্বর

স্নেহের—

তোমার পত্র পেলাম। অনুকূল কেমন আছে? তার practice (চিকিৎসা-ব্যবসায়) কিরূপ চলছে? বাড়ি তৈরি হয়েছে কি? এসব সংবাদ তো কিছু লেখ নাই। সেজন্য মনটা ব্যস্ত আছে।

সংগ চাই, একা থাকলে কিছুই করতে পারবে না। সংগের গুণে মনের বল অনেক বেশী হয়। কর্ম চাই, ধ্যান চাই ও পড়াশুনা চাই। ধর্মের কাজ হোল আত্মবিশ্বাস জাগানো। আত্মবিশ্বাস না জাগলে কেবল জয় রামকৃষ্ণ বললে লাভ নেই। আদর্শ হবে—(১) Physically invincible (শরীরের দিক থেকে অজেয়)। (২) Morally great (নীতির দিক থেকে মহান্)। এবং (৩) Intellectually strong (বুদ্ধির দিক থেকে তীক্ষ্ণ)। ভক্ত হবে বলে দুর্বল হবে কেন? সিংহের বাচ্চা চাই, মেষশাবক চাই না। ভালবাসা নিও। ইতি—

নগেন

৮৫

সারদাধাম ঃ ভুবনেশ্বর

স্নেহের—

আজকের দিনে স্বামীজী চলে গেছেন দেহ ছেড়ে। আজ সকাল থেকেই আমাদের পাঠ চলছে। কত বড় মহাপ্রাণ এসেছিলেন ভারতের ও জগতের কল্যাণের জন্য! চমক লাগিয়ে দিয়ে আবার যেখান থেকে এসেছিলেন সেখানেই চলে গেলেন। সে যে কি করুণ— তা আর কি বলব। তোদের শোনা হল না। একবার মনে হয়, শোনা উচিত ছিল, আবার মনে হয়, বড় কষ্ট হতো তোদের, বড় কোমল প্রাণ তো তোদের! মহাপুরুষের মহাপ্রয়াণে দুঃখ হয়, চোখের জল পড়ে; এতেও কল্যাণ আছে, এতে জীবন ধন্য হ'য়ে যায়। এই

সব দিন স্মরণ করতে হয়। মহাপুরুষদের আসা ও যাওয়া দুইই সমান। মহতের মহত্ত্ব সবদিক থেকেই লোককল্যাণের জন্য। তোরা হয়তো জানিস নে, আজ সেই দিন যেদিনটাতে তিনি সকলকে কাঁদিয়ে নিজে হাসতে হাসতে চলে গেলেন নিজের স্থানে। দরদ চাই—প্রাণের দরদ সবচেয়ে বড় জিনিষ। মহাপুরুষের নামে দু'ফোঁটা চোখের জলের মূল্য লক্ষ লক্ষ জপের চেয়ে বেশী। যিনি আমাদের জন্য তিল তিল ক'রে জীবন দিয়ে গেলেন, আমাদের গৌরব জগৎময় ঘোষণা করলেন, সভ্য জগতে ভারতের স্থান দিয়ে গেলেন, গরীবদুঃখীর দুঃখের লাঘব ক'রে গেলেন, আমরা তাঁর পুণ্য জীবনের স্মরণে এক ফোঁটা চোখের জল ফেলতেও পারি না। এমনি অকৃতজ্ঞ আমরা! গুরুকে অমান্য করলে দুঃখ দারিদ্র্য আসে, তাই আমাদের দুঃখ দুর্দশা ঘোচে না। ঠাকুর বলেছেন, "ভগবানের জন্য মাঝে মাঝে নির্জনে বসে কাঁদতে হয়।" আমরা তো ভগবানকে জানি না। এই সব মহাপুরুষদের নাম জানি। এঁদের জন্য দু'ফোঁটা অশ্রু বিসর্জন ক'রে এঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে পারি। দু'এক মিনিটও এঁদের জন্য কাঁদতে পারি। আমরা এত নিষ্ঠুর যে তাও আমরা করি না। নিজেদের তুচ্ছ আমোদ ছেড়ে এসব ভাববার অবসর কোথা? যাক্ সে কথা; অন্ধকারে আর দেখা যাচ্ছে না। অতি কষ্টে পত্র লিখছি। তোরা আমার স্নেহ গ্রহণ করিস। তোদের কল্যাণ হোক, তোরা মহৎ হ', বড় হ'—এই আমার প্রার্থনা। ইতি—

নগেন

৮৬

স্নেহের—

তোমার পত্র পেয়েছি। আমার জ্বর হয়েছিল। তুমি আমার নববর্ষের স্নেহ গ্রহণ কোরো। তোমার প্রতি একটা টান আছে, কেন জানি না। বোধহয় এখনো তুমি সংসারে প্রবেশ করনি, সেইজন্য। সংসারে প্রবেশ করলে মানুষের দৃষ্টি বদলে যায়। তখন অনেক কিছু দেখতে পায় না, আর অনেক কিছু ভাবতে বা বুঝতেও পারে না। ক্রমাগত ঢালু পথে চলতে চলতে বুঝতে পারে না যে, সে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে।

মানুষ অবস্থার দাস। ব্যক্তিত্ব খুব কম লোকেরই আছে। There is an element of hate in every human love. Man loves and man hates. মানবীয় ভালবাসার মধ্যে ঘৃণার বীজ লুকিয়ে আছে। মানুষ ভালও বাসে, ঘৃণাও করে। কিন্তু যাঁরা উপরে গিয়েছেন, যাঁরা একবার ভগবানের স্পর্শ পেয়েছেন তাঁরা চিরকাল ভালবাসেন, কখনো ঘৃণা করেন না। আজ নববর্ষের দিনে আর তোমাকে কি বলব? কেবল বলি—"O man, move forward on thy path. Let not thy heart be distressed, nor lose thy courage. Walk alone, walk on and weep if thy heart is heavy; but let not thy spirit sink in grief, nor give up thy march. After night of storm and strain the dawn comes—the dawn comes. At dawn the Infinite speaketh to our soul through the rays of the

rising sun. The Infinite speaketh to us through earth and water, rock and river, beast and bird, tree and flower; through all—through all. Try to train your ears so that you may hear the voice of the Infinite.

(হে মানব, এগিয়ে চল, এগিয়ে চল। হৃদয়কে বিচলিত হতে দিও না, সাহস হারিও না। এগিয়ে চল, একাকী এগিয়ে চল। যদি অন্তরে ভার বোধ কর, তবে কেঁদে নাও; কিন্তু দুঃখে অবসন্ন হতে দিও না তোমার উদ্যমকে, বন্ধ হতে দিও না তোমার চলাকে। ঝঞ্ঝাপূর্ণ ক্লান্ত রাত্রির অবসানে ফুটে ওঠে ঊষার আলো—প্রভাতের ভাতি। ঊষার নবোদিত সূর্যের আলোকচ্ছটার মধ্য দিয়ে ধ্বনিত হয় অসীমের বাণী অন্তরের মণিকোঠায়। সে বাণী জল-মাটি, নদী-পাহাড়, পশু-পাখি, গাছ-পালা, ফল-ফুল প্রভৃতির মধ্য দিয়ে ধ্বনিত হয় আমাদের প্রাণের কানে। কানকে এমন ভাবে তৈরি করতে চেষ্টা কর, যাতে তুমি শুনতে পাও সেই অসীমের বাণী।) কি আর লিখব? শেষ কথা—"পাগলা মনটারে তোর বাঁধ।" দাদা কেমন আছেন? ভালবাসা লও। ইতি—

নগেন

৮৭

কল্যাণীয়াসু—

তোমার পত্র পেলাম। তোমার সব কথার জবাব দিতে গেলে অনেক লিখতে হয়, আর তাতেও সবটা বোঝানো যাবে না। মুখে বলতে পারলে তবে বোঝার সুবিধা হয়। এখন তোমরা সকলে একত্র

আছ। এখন তো বেশ আনন্দে পড়াশুনা নিয়ে থাকতে পার। পড়াশুনা ও চিন্তা নিয়ে থাকতে পারলে তবে মনটাকে শান্ত রাখা চলে। সেটার অভাব হলেই যত দুঃখ অশান্তি এসে জোটে।

কিছু কিছু লিখতে আরম্ভ কর। যখন যেটা মনে আসে সেই বিষয়েই লিখে যাও। লিখতে গেলে মনের একাগ্রতা বাড়ে। শক্তি অন্তরে, বাইরে কিছুই নেই। শক্তির সংগে পরিচিত হতে পারলেই আনন্দের আস্বাদ পাওয়া যায়। যে দুর্বল সে আনন্দ পায় না।

কলিকাতায় এবার একটা পড়ার স্থান পেয়েছি। খুব নির্জন, আর সেখানে অনেক ভাল বই আছে যেগুলি গত ১০।১২ বছর হল খুঁজছিলাম। সেগুলি কিনতে গেলে অনেক টাকা লাগত। মানুষের ইচ্ছা পূর্ণ হয় না বটে, কিন্তু অভাব পূর্ণ হয়। একদিন এই বইয়ের অভাব খুবই বোধ করেছিলাম; আজ সেটি পূর্ণ হল। খাওয়ার পর গিয়ে পড়তে বসি, আর সন্ধ্যার পর উঠে আসি। বৌদ্ধ মঠে গিয়ে পড়ি। ওখানকার সকলেই বেশ যত্ন করে, আর খুব খাতির করে। যদি তারা কোথাও চলে যায়, তবে বই রেখে যায়। আমি এলে চাকর বই দেয়। বুদ্ধদেবের দয়া। বুদ্ধকে চিরদিনই ভালবেসেছি; তাই তিনি তাঁর সন্তানদের দিয়ে আমার প্রতি করুণা দেখাচ্ছেন। এই সময় বই পড়ে খুবই আনন্দ হচ্ছে, কারণ যে সব চিন্তা করেছি সে সব এতে পাচ্ছি। মিলে যাচ্ছে তাই আনন্দহচ্ছে। কিছুই চাইবামাত্র পাওয়া যায় না; সবই সময়সাপেক্ষ।

জীবনটা হল মরণের জন্য প্রস্তুতি। মরার জন্য প্রস্তুত থাকলে মানুষ দুঃখকে দুঃখ বলে জ্ঞান করে না। জীবনকে অতি মূল্যবান মনে করলেই সব রকম দুঃখ ভোগ করতে হয়। "জীবন মৃত্যু পায়ের

ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন।" এই ভাব এলে আর কোন অশান্তি বা দুঃখ থাকে না। চ'লে তো যেতেই হবে, তবে আর মিছে ভাবনা কেন? যাবার জন্য প্রস্তুত না থাকলে যাবার সময় দুঃখ হয়। যে প্রস্তুত হয়ে বসে আছে সে তো জানেই, ফল চিরদিন গাছে থাকে না। একদিন না একদিন গাছ থেকে খসে পড়বেই।

"জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে?
চিরস্থির কবে নীর হায়রে জীবন নদে।"

মৃত্যুর জন্য নিজেকে প্রস্তুত করছি, কোন পেছনটান না থাকে, কোন বাসনা না থাকে। ইতি—

নগেন

৮৮

স্নেহের—

তোমার পত্র পেলাম। আমি মনে করেছিলাম যে, বকুনি খেয়ে আর পত্র দেবে না, কিন্তু ঠিক উল্টো হল। তাই পত্র পেয়েই উত্তর দিতে বাধ্য হলাম। নানা কারণে শরীরটা খারাপ। তাছাড়া এক মুহূর্ত তো বিশ্রাম নেই। দুপুরবেলা হনুমান তাড়ানো আছে, বিকালে বাগান করা আছে; অবশ্য এতে আমার কষ্ট নেই। নিজের জন্য আমি কখনো কিছুই করি নি বা করি না। শরীরের ওপর আমার নিজের কোন অধিকার নেই। যার যা দরকার এই শরীর দিয়ে করিয়ে নিতে পারে। যদি অন্যের কোন কাজে না লাগে তবে শরীরটা গোপালের কাজে নিযুক্ত থাকবে, কোন অবসর বা বিশ্রাম নিবে না। বিশ্রাম একবারই করা যাবে।

তুমি পড়াশোনা যে কর তা আমি জানি। পড়ার প্রতি তোমার ভালবাসাও আছে। পরীক্ষা শেষ হলে আগ্রহ কতখানি থাকবে তা বলা যায় না। যদি পড়ার প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা রাখতে পার, তবে জীবনে কোনদিন অশান্তি ভোগ করবে না। তুমি অত্যন্ত সরল। সংসারের সহিত বিশেষ পরিচিত নও, আর পরিচিত হয়েও কোন লাভ নেই। দুনিয়া আঘাত করতে ছাড়বে না। সে আঘাত সহ্য করতে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি গভীর ভালবাসা থাকা চাই। লেখাপড়ার প্রতি ভালবাসাতেও একটা আনন্দ ও নেশা আছে। এতে কিছু পেলাম বোধ হয়, তাই একটা তৃপ্তিও পাওয়া যায়। পড়াশোনা ছেড়ো না। জীবনের এই প্রভাতে যা অর্জন করবে সমস্ত জীবন তাই তোমার সম্বল থাকবে। জ্ঞানের শেষ নেই। তাই একবার জ্ঞানস্পৃহা জাগলে সে স্পৃহা আমরণ চলতে থাকবে।

তোমরা বড় হও, মহৎ হও—এই আমার প্রার্থনা। ক্ষুদ্রতা যেন তোমাদের মধ্যে কখনও না আসে। রাণীর কথা রোজই মনে হয়। শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমাকে যখন স্মরণ করি সকালে ও সন্ধ্যায় তখন বিশেষ করে তার কথা মনে হয়। কেউ পড়াশোনা করলে আমার খুব আনন্দ হয়। যে পড়াশোনা নিয়ে থাকে সে জীবনের একটা অবলম্বন পায়। তুমি যদি পার নভেল নাটক পোড়ো না। জীবনী, ভ্রমণ, ইতিহাস, ধর্মগ্রন্থ এই সব পড়বে। নভেল নাটকে অনেক অবান্তর ভাব থাকে। তার দ্বারা প্রভাবান্বিত না হও, এই চাই। বীরত্ব জাগুক, বীর রমণী হও, চিন্তায় ও কাজে তোমাদের শক্তির প্রকাশ হোক। প্যানপেনে ম্যানমেনে ভাব যেন না আসে। মনে জেনে রেখো, মানুষ নিজের

কর্মের জন্যই সুখ দুঃখ ভোগ করে। সুতরাং এতে অন্যকে দোষী করার কিছু নেই, কাঁদবারও কিছু নেই। তোমার দুঃখ তোমারই সৃষ্টি, আবার তোমাকেই বরণ করে নিতে হবে। নীরবে সমস্ত দুঃখ মাথা পেতে গ্রহণ করবার শক্তি তোমার আছে। মেয়েরা হবে সর্বংসহা। তারা কিছুই প্রত্যাশা করবে না— ভালবাসাও না। নিজের স্বার্থ মুছে ফেলে দাও। আকাশের মত উদার হৃদয়, পাহাড়ের মত অটল মন, পৃথিবীর মত অতুল ধৈর্য, আর সবার প্রতি করুণা, স্নেহ ও সেবা—এই হচ্ছে নারীর নারীত্ব। এই নারীত্বই তোমার আদর্শ হোক, এই প্রার্থনা। ইতি—

নগেন

৮৭

সারদাধাম : ভুবনেশ্বর

স্নেহাস্পদেষু—

তোমার পত্র পেয়েছি। পত্র লিখতে মোটে ইচ্ছা করে না, তাই কি লিখব ভেবে পাই না। শুনে সুখী হলাম যে, তুমি মেজর জেনারেল শাহ্‌নোয়াজকে দেখেছ। নেতাজী বেঁচে আছেন কিনা জানি না। তবে তিনি যে কাজ করেছেন তা অমর হয়ে থাকবে। মৃত্যু তো সকলেরই একদিন আছেই, কিন্তু

"সেই ধন্য নরকুলে লোকে যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্বজন।"

তুমি প্রতিদিন গীতা পড় জেনে খুবই সুখী হলাম। তুমি আমার চোখের সামনে সব সময়েই আছ। সব সময়ই যেন তোমার

কথা শুনতে পাই। পটল ক্ষেতের কাছে যে পেয়ারা গাছ আছে, সেটাতে আবার ফুল ধরতে আরম্ভ করেছে।. পেয়ারা দেখলেই তোমাকে মনে পড়ে। একটা কথা মনে রেখো—"ভ্রান্ত সেই যেবা সুখ চায়।" সুখ চেয়ো না।

"বল মিথ্যা আপনার সুখ,······যে জন বিমুখ
বৃহৎ জগত হতে, সে কখনো শেখেনি বাঁচিতে।"

নিজের সুখ দুঃখ ভুলতে শিক্ষা কর এবং প্রতি মুহূর্তে অন্যের জন্য ভাবতে শেখ। "দেখিলে পরের মুখ দেখি আপনার মুখ"। যতটা নিজেকে মুছে ফেলবে ততটাই আনন্দ ও শান্তি পাবে। নিজের সুখ খুঁজলে আমাদের কাছ থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাবে, আর কাছে আসবার সুযোগ পাবে না। আর অধিক কিছু লিখবার নেই। তুমি আমার ভালবাসা নিও। ইতি—

নগেন

৯০

সারদাধাম

স্নেহের—

তোমার পত্র পেয়েছি। প্রতিদিন যখনই তোমার কথা স্মরণ হয় তখনই শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমাকে স্মরণ করি। তোমার দু'টি মূর্তি আমার স্মৃতিতে আঁকা আছে। একটির জন্য তোমাকে আমার শ্রেষ্ঠ জিনিষ দিয়েছি। অন্যটির কথা তোমাকে জানাই নি। সে তোমার ধ্যানমূর্তি। তোমার অন্তরে তুমি ডুবে যাও—শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমার দর্শন পাবে ও জীবন ধন্য হবে। তোমার খুব

ছেলেবেলায় তোমাকে যেমন দেখেছিলাম, তার একটি সম্বন্ধে আমার কথা ঠিক হয়েছে। তোমার ধ্যানমূর্তি দেখেছি মুন্সীগঞ্জে যখন ঠাকুর ঘরে প্রণাম করতে। তুমি ঠাকুর ও শ্রীশ্রীমার কৃপা পেয়েছ—তোমার জীবন ধন্য হবে। হয়তো ততদিন বেঁচে থাকব না, হয়তো তুমিও সংসারের আবর্তে পড়ে হাবুডুবু খাবে, তবুও মনে প্রাণে জানি, তুমি অন্তরে অন্তরে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমার দর্শন পেয়ে ধন্য হবে। তোমাকে আমি আর কি আশীর্বাদ করব। তুমিই আমায় আশীর্বাদ কর, যেন শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপা পেয়ে ধন্য হই, যেন তাঁর দর্শনে জীবন ধন্য হয়। তুমি বয়সে ছোট, কিন্তু অন্তরের দিক থেকে অনেক বড়। তুমি সরল হও, উদার হও. ঠাকুর মা'র চিন্তায় মগ্ন হয়ে থাক। তোমার বুদ্ধির সার্থকতা যেন হয় প্রকৃত জ্ঞানের বিকাশে। * *

অন্তর্জীবনের জন্য প্রার্থনা কর। জ্ঞান, ভক্তি, বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা পাবার জন্য প্রার্থনা কর ব্যাকুল হয়ে। কৃপা পাবে নিশ্চয়ই। তোমার মধ্যে যে মানুষ ঘুমিয়ে আছে তাকে জাগিয়ে তোলো। আমি জানি তোমার সে ক্ষমতা আছে। আমার তো কিছুই নেই যে তোমাকে দেব। যদি আমার ভক্তি বিশ্বাস কিছু থাকত, তোমাকে নিশ্চয়ই দিতাম। আমার ভালবাসা নিও। তোমার উপর শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ কৃপা। তোমার কি আছে তুমি জান না, আমি জানি। তাই তোমাকে সে কথা শুনিয়ে দিলাম। আমার ভালবাসা নিও। ইতি—

নগেন